ষাট-সত্তরে নদীয়া : নকশালবাড়ির নির্মাণ

শুভলক্ষ্মী পাণ্ডে

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৬ শে জানুয়ারি, ২০০০

প্রকাশক ঃ তন্দ্রিতা চন্দ্র
রিডার্স সার্ভিস
৫৯/৫এ, গড়ফা মেন রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭৫
দূরভাষ-২৪১৮-০১৫৮

অক্ষরবিন্যাস ঃ এল টি এম গ্র্যাফিক্স
বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মুদ্রক ঃ ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ
গঙ্গানগর, কলকাতা-৭০০১৩২
দূরভাষ ঃ ২৫৩৮৮৮৮০/৭০০৯

উৎসর্গ

আমার মাকে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বইটি মূলতঃ আমার গবেষণাপত্রের পরিমার্জিত রূপ। আমার এই গবেষণার কাজে প্রাথমিক রসদ যাঁদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই নকশালবাড়ি রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন অথবা এখনও আছেন। নদীয়ার বিভিন্ন শহর ও গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে থাকা এই ব্যক্তিদের কাছে আমি অশেষ ঋণী। ষাট ও সত্তর দশকের ঘটনাবলী, তার ব্যাখ্যা ও নকশালবাড়ি রাজনীতির বিভিন্ন ধারা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেছেন, তথ্য জুগিয়েছেন ও এই গবেষণায় প্রভূত আগ্রহ দেখিয়েছেন। কাজের সূত্রে বিভিন্ন গ্রামে বা শহরে গিয়ে বহু অসময়ে আমাকে এই কর্মীদের গৃহে আতিথ্য, আশ্রয় ও আহার গ্রহণ করতে হয়েছে। এই ঋণ অপরিশোধ্য।

যাঁদের নাম করতেই হয় ঃ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষাসমিতির প্রাক্তন নদীয়া জেলা-শাখা সম্পাদক তাপস চক্রবর্ত্তী, শান্তিপুরের কর্মী বুলু চ্যাটার্জী, জয়শ্রী (রুবি) ভট্টাচার্য, 'প্রতিবাদী চেতনা' পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার প্রয়াত জগদ্বন্ধু চ্যাটার্জী, তপন রায়, সাধন কুণ্ডু, মিন্টু মুখার্জী, মান্ত ভট্টাচার্য, পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী, রথীন রায়চৌধুরী, আড়ংঘাটার কুমুদ সরকার, পলাশীপাড়ার বিল্বমঙ্গল চ্যাটার্জী, মুড়াগাছার দিলীপ চুনারি, ধর্মদার সুবোধ মজুমদার, বড় আন্দুলিয়ার সমীর বিশ্বাস, রাণাঘাটের প্রদীপ চ্যাটার্জী, সুগত চ্যাটার্জী, কালিনগর গ্রামের ওয়াজুদ্দি শেখ, নবদ্বীপের রবি ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণীর অমরেন্দ্রনাথ আদিত্য চৌধুরী, অমল লাহিড়ী, চাকদহ-র কালিচরণ সিংহ রায়, অরুণ ব্যানার্জী, কৃষ্ণনগরের প্রয়াত নাদু (শোভেন) চ্যাটার্জী, রামু ব্যানার্জী, বেণীচরণ সরকার, মহিমময় চন্দ, অরুণাভ সান্যাল, দিলীপ বাগচী প্রমুখ। নদীয়া জেলার কিছু প্রাক্তন সি.পি.আই (এম) নেতা, যাঁরা অধুনা সক্রিয় রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত, যেমন চাকদহ-র সৌরেন পাল, অরুণ ভট্টাচার্য ও শান্তিপুরের ধীরেন বসাক, ও নদীয়া জেলা সি.পি.আই (এম)-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য সুভাষ বসু, অন্যতম বর্তমান সদস্য সুবোধ

গাঙ্গুলী, নদীয়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শান্তিরঞ্জন দাস, কৃষ্ণনগরের প্রাক্তন সি.পি.আই (এম) বিধায়ক, অধুনা প্রয়াত সাধন চট্টোপাধ্যায়, রাণাঘাটের প্রাক্তন সি.পি.আই (এম) বিধায়ক গৌর কুণ্ডু, নবদ্বীপের প্রাক্তন সি.পি.আই (এম) বিধায়ক অধুনা প্রয়াত দেবী বসু—এঁদের কাছেও ঋণী। প্রয়াত ভবানী প্রসাদ রায়চৌধুরী, সুনীতিকুমার ঘোষ, আজিজুল হক ও অসীম চট্টোপাধ্যায় সাক্ষাৎকার দিয়েছেন; এঁরা আমার ধন্যবদার্হ। এছাড়াও সাহায্যকারীর ভূমিকায় আছেন গবেষক ও প্রাক্তন পুলিশ পদাধিকারী ড. অমিয় কুমার সামন্ত, অধ্যাপক অঞ্জন চক্রবর্ত্তী (তাঁর পিতা অমিয় ভূষণ চক্রবর্ত্তীর ব্যক্তিগত 'দেশব্রতী'র সংগ্রহ ব্যবহার করতে দিয়েছেন), অধ্যাপক অনিমেষ চক্রবর্তী, দেবদাস আচার্য, অধ্যাপিকা ভারতী দাশ, দীপক বিশ্বাস, হরিপদ দে, প্রয়াত অধ্যাপক শুভব্রত দাশ, নবদ্বীপ বার্তার সম্পাদক গৌরাঙ্গ কুণ্ডু ও কাঞ্চন সরকার। নদীয়া জেলা প্রশাসন ও রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ প্রশাসনিক গোপন তথ্য পর্যালোচনা করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং এক্ষেত্রে তৎকালীন বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকগণ প্রভৃত সাহায্য করেছেন, যেমন রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়, তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব লীনা চক্রবর্ত্তী, তৎকালীন রাজ্য পুলিশের মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডি.আই.জি দেবেন বিশ্বাস ও তৎকালীন আই.জি., আই.বি—এম. কে. সিং। ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্সেস, উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী ও কৃষ্ণনগর কালেক্টরেট লাইব্রেরী ও কলেজ স্ট্রীটের 'লিট্‌ল ম্যাগাজিনের' ভাণ্ডারী সন্দীপ দত্তর থেকেও সহায়তা পেয়েছি। আমার শিক্ষক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ডঃ অমিত ভট্টাচার্য এই উদ্যোগের প্রধান প্রেরণা।

আমার নিকটাত্মীয়দের অশেষ প্রেরণা ও কষ্টস্বীকার ছাড়া এ কাজে হাত দেওয়া যেত না এটা বলাই বাহুল্য। ছোট্ট তাতাকে মা-বাবা ও দিদার কাছে রেখে কাজে বেরোতাম, ফিরে এসে সকলকে হাসিমুখ দেখতাম। শুভাশিস যে কতভাবে সাহায্য করেছে গবেষণার প্রতিটি ধাপে তা বলার নয়; ও না থাকলে আমি এত জট খুলতেই পারতাম না। আলাদাভাবে নামোল্লেখ করা হল না—এমন বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছেও আমি ঋণী।

প্রাক্‌কথন

নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে, হচ্ছে, হবেও। বস্তুতপক্ষে এই আন্দোলনকে চিনতে চাওয়ার আগ্রহ এখনও তীব্র। বহু সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ মনে করিয়ে দেয় সত্তর দশকের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে, যা একটি উদ্দীপিত রাজনৈতিক আন্দোলনকে সুপরিকল্পিতভাবে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। ষাটের দশকের এক প্রজন্মের কাছে যে স্বপ্ন তৈরি হয়েছিল, 'এক মুক্তির দশক আসন্নপ্রায়'—সেই 'অতিকথন' আজও তার যাবতীয় ব্যর্থতা ও স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে বিশ্লেষিত হয়ে চলেছে। একসময়ে 'নকশালবাড়ি' কথাটির সঙ্গে হয় তীব্র ভীতি বা ঘৃণা অথবা তীব্র আকর্ষণ ও আনুগত্যের আবেগ জড়িয়ে থাকত। আজ সেই তীব্র স্পর্শকাতরতার ধার কমেছে। স্থির জলে যেমন প্রতিকৃতি জেগে ওঠে, তেমনি সুস্থ চর্চা চলছে সত্তর দশকের এই 'পতনের' কার্যকারণ নির্ধারণের। ভ্রান্তি কোথায় ছিল—অপরিপক্ক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, না বৈপ্লবিক নেতৃত্বেই? বিভিন্ন গ্রামে-শহরে ঘুরে বহু মাওবাদী কর্মীর সঙ্গে কথা বলে প্রশ্ন জেগেছে, সেই উজ্জ্বল বহ্নি আজ এই হতাশার মালিন্যে ঢাকা পড়ল কিভাবে? রাজনৈতিক আবেগ বা আদর্শ তো পরিধেয় বস্ত্র নয়, যা সহজেই ছেড়ে ফেলা যায়! তাহলে কি সত্যিই 'লক্ষণের বিচ্যুতি ঘটলে আদর্শের প্রতি আমাদের আনুগত্য নিয়ে সংশয় জাগে, শত্রুমিত্রের ভেদাভেদ অস্পষ্ট হয়ে আসে, স্বরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়?'[১] একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ যে প্রেক্ষাপটে ক্রমেই শক্তিসংগ্রহ করে, তার আধারশিলা তৈরি হয় রাজনীতি, অর্থনীতি, বিভিন্ন পরিসংখ্যান এবং অবশ্যই মনস্তত্ত্ব দিয়ে। তাই ব্যক্তিমন তার আশা-প্রত্যাশা কিংবা ব্যর্থতাপ্রসূত হতাশা ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে ধরা পড়ে যায় গোত্রচ্যুত অবস্থায়, আন্দোলনের সামূহিক পতনের সঙ্গে সঙ্গে। একদা বিপ্লবী তখন জাত খুইয়ে আত্মরক্ষার্থে সেই কানাগলিতে ঢোকে যেখানে 'শুঁয়োপোকা কোনোদিনও প্রজাপতি হয়ে বেরোয় না।'[২] প্রশ্ন ওঠে, এমন কেন হয়? শ্রেণীসংগ্রামের শ্লোগান কি তবে আজ আর ততখানি আবেগ জাগায় না?

গবেষণার প্রয়োজনে ঘুরে ঘুরে রসদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বহু আন্দোলনকারীর সঙ্গে কথা বলেছি। বিস্মিত হতে হয়েছে 'তখন' আর 'এখনের' মধ্যে তফাৎ দেখে। নকশালবাড়ি যুগে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করার পূর্বশর্ত হিসাবে সামন্তসংস্কৃতি ও ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া ভাবাদর্শকে আঘাত হানার কাজ শুরু হয়েছিল। প্রায় চার দশক পরে দাঁড়িয়ে সেই ভাঙনের হোতাদের ওপর সমীক্ষা চালালে প্রশ্ন জাগে সামন্তসংস্কৃতির 'fetish' তাঁরা নিজেদের জীবন থেকে ভাঙতে পেরেছেন কি?[৩] এঁদের একাংশের জীবনযাপন লক্ষ্য করলে মনে হয় এঁরা কার্যত সামন্তসংস্কৃতিতেই বিশ্বাসী। বহুদিন নাগরিক আরামে বিলাসী এই প্রাক্তন নকশালপন্থীরা একইসঙ্গে উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ও মাওবাদী; প্রথাগত আচারে কন্যাদান করেন বা পুত্রের উপনয়ন সারেন ও সত্তর দশকের ওপর প্রবন্ধ লেখেন। বদরুদ্দীন উমর প্রকৃতই বলেছেন যে, জনগণতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, যে কোন বিপ্লব সফল করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ত-সংস্কৃতির উপর যে আঘাত হানার প্রয়োজন ছিল, এদেশে কোনো কমিউনিস্ট দলই তা করেনি।[৪] বাস্তবিকই বর্তমানে সংস্কৃতিক্ষেত্রে সামন্তবাদী প্রভাব অর্থনৈতিক সম্পর্কে সামন্তচরিত্রের চেয়েও প্রবল এবং নগরজীবনের অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে

থেকে একদল প্রাক্তন নকশালপন্থী আজ গোত্রচ্যুত। মারিয়াস দামাস লিখিত '*Approaching Naxalbari*' গ্রন্থের ভূমিকায় রাজনৈতিক বিপ্লব ও সেই সাপেক্ষে সামাজিক শ্রেণীকাঠামোর রূপান্তরীকরণ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। সেখানে লেখক ব্যারিংটন মূর লিখিত '*Social Origins of Dictatorship and Democracy*' গ্রন্থের পর্যালোচনা করতে গিয়ে ভারতে বিপ্লববাদের সম্ভাবনা নিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, ভারতের শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণী (অনুবাদ এই লেখকের), ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক আদর্শের মন্ত্রমুগ্ধ শিষ্য হিসাবে কোনদিনই এদেশের সামাজিক বৈষম্যভিত্তিক শ্রেণীবিভাজন নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ফলতঃ এই 'Segmentary Social Structure', যা এদেশের উত্তরাধিকার, তা যতক্ষণ না ভাঙা হচ্ছে, ততক্ষণ বিপ্লব তৈরী করার মত বস্তুগত ভিত গড়ে উঠবে না। অতএব..."the CPI(ML) attempted the impossible", কি সেটা? —"...the building of a nationwide revolutionary upsurge..."[৫]

ষাটের দশকের নকশালবাড়ি রাজনীতির আরও একটি চেহারা ধরা পড়ে। প্রশ্নের আকারে বক্তব্যটাকে রাখা যাক্। নকশালবাড়ি আন্দোলন কি 'পোষাকের রাজনীতি'কে ছাড়তে পেরেছিল? শুধুমাত্র 'ভোটসর্বস্ব রাজনীতি' নয়, গণসংগঠন, গণসংযোগ দেশীয় ঐতিহ্য— অনেকরকম রাজনীতির পোষাক-কে বর্জন করতে পারলেও নকশালপন্থীরা 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পোষাক'-টি কিছুতেই বর্জন করতে পারে নি। সে সময়ে অসংখ্য বিপ্লবী যুব ছাত্রের দল শ্রেণীচ্যুতির তাগিদে স্বজন-স্বভূমি ত্যাগ করে গিয়েছিল অজ্ঞাতবাসে। যদিও শহুরে জীবনের ঘেরাটোপে অভ্যস্ত বহু যুবক সততা বা অসততার সঙ্গে এই ঝুঁকিপূর্ণ অনিশ্চিত জীবন থেকে পিছিয়েও গেল, কিন্তু জনমানসে তার রোমান্টিক একটা চেহারা দাঁড়িয়ে গেল এইরকম,— "...মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ঘরের সন্তানসন্ততিদের সমাজ-বিপ্লব সংসাধনের উন্মাদনায় ভেসে যাওয়ার প্রক্রিয়ায়।" সেই সন্তানদের চেহারা কেমন ছিল? তারা "...দুদিন আগে সারারাত জেগে ফুটপাথে খবরের কাগজ বিছিয়ে বড়ে গোলাম আলি খাঁ বা বেগম আখতারের জাদুকরী কণ্ঠলাবণ্যের নির্ঝরে অবগাহন করেছে...।"[৬] এই ছিল এবং হয়ত এখনও আছে নকশালবাড়ি শহুরে বিপ্লবীদের পোষাকী চেহারা।"

কিন্তু এই যে গ্রাম থেকে সশস্ত্র গেরিলাযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের অভিযান, তাতে তো গ্রাম ও মফঃস্বলের ছাত্র-যুবকরাও অংশ নিয়েছিল। তাবাও দলে দলে ঘর ছেড়েছিল, চতুর্দিক থেকে বিপদ ঘনালে তারাও অজ্ঞাতবাসে আশ্রয় নিয়েছিল এবং 'শহীদ' হয়েছিল। কিন্তু তাদের এই অ-নাগরিক তক্‌মা পরিশীলিত, মেধাবী নকশালদের থেকে তাদের পৃথক পংক্তিতে রাখল। দেশের বুদ্ধিজীবিরা বা শিক্ষাবিদ্‌রা এদের কি হবে ভেবে ততখানি উদ্বিগ্ন হন নি, যতখানি প্রেসিডেন্সীর ঝক্‌ঝকে ছেলেদের জন্য হয়েছিলেন। তাই আজও অধিকাংশ লেখায় ও বলায় নকশালবাড়ি আন্দোলন 'শহুরে এ্যাড্‌ভেনচারিষ্ট, আবেগ-তাড়িত' যুবকের আন্দোলন[৭]। সেই উনসত্তর সালের দলিলেই এম.সি.সি. অভিযোগ করেছিল যে সি.পি.আই (এম-এল) গ্রাম ও শহর এলাকা, এ দুয়ের মধ্যে গ্রাম এলাকাকে ক্যাডার নিয়োগের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়ার গুরুত্বকে কার্যক্ষেত্রে অস্বীকার করে।[৮] গ্রামে গিয়ে নকশালপন্থী বহু কর্মীর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে একইরকম অভিমানে তাঁরা তীব্রভাবে বিদ্ধ। এই সেন্টিমেন্টের প্রকাশ খুবই দ্যোতক। নকশালবাড়ি আন্দোলন যদি মহানগরের

উজ্জ্বল ছেলেমেয়েদের ধরে টানাটানি না করত, যদি প্রেসিডেন্সী কলেজের মত কেরিয়ার তৈরির আখড়ায় আঘাত না হানত, তাহলে হয়ত এই আন্দোলন সম্পর্কেও গড়ে উঠত এক চূড়ান্ত নির্মোহ। 'পোশাকের রাজনীতি ও রাজনীতির পোশাক' প্রবন্ধে দীপেশ চক্রবর্ত্তী বলেছেন যে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে "অভিজাত মানুষ যদি চাষাভুষোর ভূমিকায় অভিনয় করে তবে অভিভূত হওয়া যায়, কিন্তু চাষাভুষো গোছের লোক যদি রাজার আসনে বসে, তবে একেবারেই সহ্য করা যায় না। ...নকশাল যুগেও দেখা গেল সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে একটি যুক্তি দেওয়া হল প্রেসিডেন্সী কলেজের ভালো ভালো ছেলেরা জীবন দিচ্ছে। সুদূর মফস্বলের খারাপ খাবাপ ছাত্রদের জীবনদান তেমন করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে নাড়া দেয়নি।"[৯] বাস্তবিকই মহানগর, জেলাসদর ও গ্রাম—সমাজ, জীবন ও মন-এর ক্ষেত্রে যে হায়ারার্কি গড়ে তোলে, তা অনস্বীকার্য।

গোটা ষাটের দশক ও পশ্চিমবঙ্গকে প্রেক্ষাপটে রেখে নকশালবাড়ি আন্দোলনে শুধু নদীয়া জেলাকেই তুলে ধরা হয়েছে এই বই-তে। নদীয়া জেলাকে আলোচনার মুখ্য বিষয় করার কারণ ব্যাপকভাবে যুব ছাত্রসম্প্রদায়ের 'নকশাল' হয়ে ওঠার প্রবণতা অন্য যে কোন জায়গার চেয়ে এখানে বেশী ছিল। তাছাড়া এই জেলায় মাওবাদী রাজনীতি আজও প্রাসঙ্গিক। ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনের মার্চের শহীদদের যেমন আজও স্মরণ করা হয়, তেমনই স্মরণ করা হয় আঠাশে জুলাই চারু মজুমদারের মৃত্যু দিবসকে বা তেসরা মে (শান্তিপুরের অজয় ভট্টাচার্য, কালাচাঁদ দালালদের হত্যার দিন)-র মত দিনগুলিকে। গোটা ষাটের দশক জুড়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট শিবিরে অন্তর্বিরোধ ও আন্তঃপার্টি সংগ্রাম ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যে ধাক্কা দেয়, সেই পরিপ্রেক্ষিতটুকু এবং এদেশের বাম শিবিরে নানা মতাদর্শগত বিতর্ক, বিদ্রোহ, নানা ঝোঁকের প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরলে তবেই সাতষট্টির মহাবিদ্রোহে পৌঁছানো যায়, এই বিশ্বাসে আলোচনা শুরু করেছি। যদিও উনিশশো পঁচাত্তর অব্দি নদীয়ার নকশালপন্থী কর্মীরা লড়াই চালিয়ে গেছেন, কিন্তু বাহাত্তর পর্ব পর্যন্ত আমার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছি কারণ চারু মজুমদারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীকেন্দ্রেরই বিলোপ ঘটে ও বিপ্লবের 'সম্মানজনক পশ্চাদপসরণের' সূচনা হয়।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের কোনো স্থানিক-বৃত্তান্ত ও তার পর্যালোচনা করার প্রধান প্রতিবন্ধক হল লিখিত তথ্য বা দলিল বা বিশ্লেষণ-এর অপ্রতুলতা। সি.পি.আই (এম-এল)-র নিজস্ব কাগজপত্র, যা ঊনসত্তরের পর থেকে বার হচ্ছিল, তা পাওয়া খুবই শক্ত। সত্তরের পর থেকে দেশব্রতীও খাপছাড়া ভাবে প্রকাশিত হয়, যদিও অধুনা তা একটি পত্রিকার তরফে পুনর্মুদ্রিত ও সংকলিত হয়েছে। তাই পুলিশ রিপোর্ট, সংবাদপত্রের ভাষ্য এমনকি মৌখিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত ভাষ্যগুলিকে যাচাই করে দেখা হয়েছে। আঞ্চলিক ইতিহাসের এই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিকে লিপিবদ্ধ করা ক্রমশঃই কঠিন হয়ে পড়ছে। নদীয়া জেলার সেই অগ্নিগর্ভ ষাট-সত্তরকে ফিরে দেখার চেষ্টা করতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে বহু অজানা প্রতিকৃতি; নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের সঙ্গে একদা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, গ্রামে গঞ্জের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে থাকা সেই নীচুতলার মানুষগুলির ভাষ্য থেকে, যার কথা সরকারি রিপোর্টে মেলেনি, পার্টি দলিলে লেখেনি, অথচ যা গড়ে তুলেছিল একটা অভ্যুত্থানের বনিয়াদ ও একই সঙ্গে তার বিনির্মিতি।

সূত্র ঃ

১ পার্থ চট্টোপাধ্যায়—চীন ও আমরা, চীনের ছাত্র আন্দোলন, সম্পাদনা ঃ সুজাত ভদ্র, অনুষ্টুপ, বইমেলা ১৯৯১, পৃ. ৯।

২ অনিল আচার্য—ষাট সত্তরের ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত, ষাট সত্তর, অনুষ্টুপ, সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃত।

৩ আজিজুল হক-এর 'নকশালবাড়ি ঃ বিক্ষোভ-বিদ্রোহ-বিপ্লব এবং রাশিয়া'—গ্রন্থে নারায়ণ সান্যাল লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য। ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রা.লি., কলকাতা '৯১।

৪ বদরুদ্দীন উমর ঃ বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা, ধ্রুপদী, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ-জানুয়ারী ১৯৮০, পৃ. ২৮-৩০।

৫ Marius Damas–Approaching Naxalbari, Radical Impression, Calcutta 1991, pp. 6-7.

৬ অশোক মিত্র ঃ 'ডুবতে রাজী আছি'—আনন্দবাজার পত্রিকা, বৈশাখ ১৪০৪, পৃ. ৯-১৪; এছাড়াও এ প্রসঙ্গে সন্তোষ রাণা 'কমরেড চারু মজুমদার প্রসঙ্গে কিছু কথা' নিবন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন—অধুনা জলার্ক, সত্তরের শহীদ লেখক শিল্পী সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯৭-মার্চ ১৯৯৭।

৭ মহাশ্বেতা দেবী ঃ 'আজকের লেখা ঃ কি ও কেন'—'ভাষা' বিশেষ সংখ্যা ১৯৯২, পৃ. ৮৬-৯২।

৮ 'সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবী লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, গণফৌজ ও লালঘাঁটি গড়ার কাজকে ত্বরান্বিত করুন'—"মাওবাদী কমিউনিস্ট কেন্দ্রে আহ্বান"—দক্ষিণদেশ, বিশেষ সংখ্যা, জুন ১৯৭১।

৯ দীপেশ চক্রবর্তী—'ওঁরা আর এঁরা'—অনুষ্টুপ প্রকাশনী, প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৮৬, পৃ. ৪৮-৪৯।

সূচীনির্দেশিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নদীয়া জেলায় বামপন্থী আন্দোলনের ঐতিহ্য

স্বাধীন ভারতে কৃষক বিদ্রোহ বলতেই অবধারিতভাবে নকশালবাড়ি আন্দোলনের নাম উঠে আসে। এই কৃষক আন্দোলন শুধু সশস্ত্র ছিল বলে নয় (ভারতে দীর্ঘদিনের কৃষক বিদ্রোহের ঐতিহ্যে জঙ্গী চেহারাটাই বার বার ফুটে উঠেছে), যে কোন আন্দোলনের সীমাবদ্ধ ও তাৎক্ষণিক দাবী দাওয়ার বেড়া ডিঙ্গিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষমতা দখলের অভ্যুত্থানের ডাক দিয়েছিল বলে। অর্থাৎ অর্থনীতিবাদের সীমা ছাড়িয়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনই ছিল এই কৃষি বিপ্লবের রূপকারদের লক্ষ্য। একদিকে নকশালবাড়ি ছিল তার আগের সব ঘটে যাওয়া বিদ্রোহ থেকে আলাদা কেননা, শুধু স্বতঃস্ফূর্ততা নয়, ভারতীয় বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক পূর্ণাঙ্গ ও সচেতন প্রয়াসের প্রথম প্রকাশ ছিল এটি (চারু মজুমদারের আটটি দলিল লেখা হয়েছিল জানুয়ারী ১৯৬৫ থেকে এপ্রিল ১৯৬৭-র মধ্যে)।

দ্বিতীয়তঃ ১৯৪৬-৪৭-এর তেভাগা ও তেলেঙ্গানার জঙ্গী কৃষক আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রথম থেকেই মার্কসবাদী পার্টির নির্দেশের দিকে না তাকিয়ে থেকে জোর দেন পার্টির বাইরের 'লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী নওজোয়ানদের প্রতি'।[১] "পুরাতন রাজনৈতিক কর্মীরা অবশ্যই এই পার্টিতে থাকবেন, কিন্তু মূলতঃ এই পার্টি গড়ে উঠবে শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের দ্বারা, যাঁরা শুধু মুখে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারাকে মানবেন না, জীবনে তার প্রয়োগ করবেন, ব্যাপক জনতার মধ্যে প্রচার ও প্রসার করবেন এবং গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁটি বানাবেন। সেই নতুন পার্টি শুধু বিপ্লবী পার্টিই হবে না, তারা হবে জনতার সশস্ত্র বাহিনী এবং জনতার রাষ্ট্রশক্তি।"[২] চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান এবং তৃতীয় বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা ও রূপকার মাও সে তুং-এর ওপর সর্বৈব আস্থা এবং বাস্তবিকই চীনের 'ফিডব্যাক' এর ওপর দাঁড়িয়ে থাকাও ছিল এই অভুত্থানের তৃতীয় জোরালো বৈশিষ্ট্য। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে মাওবাদী চিন্তাধারার প্রায়োগিক ব্যবহার নকশালবাড়ি আন্দোলনেই প্রথম ঘটেনি। ১৯৪৮-৫১ সালে তেলেঙ্গানায় রাজেশ্বর রাও-এর নেতৃত্বে মাও সে তুঙ-এর চিন্তাধারার আলোকে আর একটি সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের সূচনা হয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট কর্তৃত্বের (Comminform) নির্দেশে ঐ আন্দোলনের অকালছেদন ভারতীয় কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের একাংশের মধ্যে হতাশা ও প্রতিবাদ তৈরী করে। যে মতাদর্শগত প্রশ্ন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন তৈরী করে, সেগুলি মূলতঃ ছিল এই যে (ক) শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ আদৌ কি সম্ভব? (খ) ভারত রাষ্ট্রের প্রকৃত চরিত্র কি? তাছাড়া, (গ) কৃষি বিপ্লব —যা ভারতবর্ষে বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু, তা বর্তমান ভারতীয় সমাজব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে হওয়া সম্ভব কিনা। মাও সে তুঙ-কে সামনে রেখে যেন প্রায় এক নতুন

দর্শন হয়ে উঠে এল নকশালবাড়ি। ওপরের প্রশ্নগুলোর সাবলীল উত্তর বেরিয়ে এল চারু মজুমদারের আটটি দলিল থেকে।

এই যে নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানকে ঘিরে এত উত্তেজনা, উত্তাপ ও প্রত্যাশার সৃষ্টি হল তাতে পুরোন কমিউনিস্ট বিপ্লবী ও কর্মীরা কে কি ভাবলেন, সেটা যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও বেশী উল্লেখযোগ্য এই যে নকশালবাড়ির আগুন একরকম হু হু করে ছড়িয়ে পড়তে পারল, সেই ব্যাপারটাই। কালক্রমে তো সবাই দেখলেন যে অভ্যুত্থানে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়তে লাগল তারাই যাদের সঙ্গে 'মার্কসবাদ'-এর ক্ষীণ যোগাযোগ থাকলেও 'মাওবাদ' তাদের কাছে প্রায় অশ্রুতপূর্ব ছিল। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও জেলায় জেলায় হাতে গোনা পুরনো কমিউনিস্ট কর্মীদের বাদ দিলে এই আন্দোলনে বাস্তবিকই এসেছিল ঝাঁকে ঝাঁকে আনকোরা তরুণ, 'প্রকৃত কমিউনিস্ট' হবার ঝোঁকে। এটা ঘটনা, যে সাতষট্টি থেকে অন্তত ঊনসত্তর পর্যন্ত এই 'বিপ্লবী' যুব-ছাত্ররা গভীর প্রত্যয়ে রেড় বুক উদ্ধৃত করত, 'বহুকেন্দ্রিকতার' ঝোঁক এড়াতে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হুবহু একই ভাষায় প্রতিধ্বনি করত, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন করেছিল 'জনবিরোধী লেখাপড়া' করে মূর্খ না হবার জন্য এবং প্রকৃতই বিপ্লবের জন্যে তারা সর্বস্ব ত্যাগ করতে দ্বিধা করেনি। তখন সকলেই নতুন আবহাওয়ায় জারিত। সে আবহাওয়া ছিল এক হিংস্র, আক্রমণাত্মক আবহাওয়া। স্বদেশের ভিন্নমতবাদী সমস্ত রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্রনেতারা তখন বিবর্জিত। ভারতীয় রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্য আদর্শ যে কিছু পাওয়া যাবে না, এমন এক স্থির প্রত্যয়ে সে সময়ের তরুণেরা পৌঁছে গিয়েছিল। কেন?

'ষাট দশকের মধ্যভাগ ভারতীয় অর্থনীতিতে একটি বিভাজন রেখা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। পঞ্চাশ দশকের প্রথম ভাগ থেকে নেহরু মডেল নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার শুরু, সরকারী কোষাগার থেকে বিপুল অর্থব্যয়ে নতুন নতুন বুনিয়াদী শিল্প গঠনের মাধ্যমে শিল্প বৃদ্ধির যে উচ্চহার, '৬৬ সালে এসে তা মুখ থুবড়ে পড়ল। ভারতবাসী ইতিমধ্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে দু-দুটি যুদ্ধের '৬২-র ভারত-চীন যুদ্ধ ও '৬৫-র ভারত-পাক যুদ্ধ। এর ফলে যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র আমদানী শুরু হল তা বিদেশী মুদ্রার সঙ্কট ও বাণিজ্য ঘাটতির অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত হল। '৬৬-তে সরকারী ভাবে টাকার অবমূল্যায়ণ ঘটলো প্রায় ৫৮ শতাংশ। এর উপর '৬৫ ও '৬৬ সালে ভারতবর্ষের উপর নেমে এলো অভূতপূর্ব খরা। দেখা দিল চরম খাদ্য সংকট। পশ্চিমবঙ্গ প্রত্যক্ষ করলো রক্তক্ষয়ী খাদ্য আন্দোলন।'[৩] অতএব মধ্য-ষাটে যারা যুবক, তারা দেখল কেন্দ্রের কাছ থেকে বাড়তি একশ গ্রাম চাল, পঞ্চাশ গ্রাম চিনি আদায় করতে ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনে পঞ্চাশ জন শহীদ হল। মাথায়, মনে অপ্রশমিত রাগ, তাপ, ঘৃণা নিয়ে নতুন প্রজন্ম সাবালক হল। স্বপ্নভঙ্গ, প্রত্যাশাভঙ্গ ও বিশ্বাসভঙ্গের এই যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল আরও অনেক আগে। মূলতঃ ষাটের শুরুতেই। সে হিসাবে ষাটের দশক ছিল অগ্নিগর্ভা। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রায় চালচিত্রের মতো একটা দশকেই এত ঘটনার বাঁক যে তা নিয়ে আগ্রহ ও বিতর্কের

শেষ নেই। এই ঘটনাবহুলতার মুখ্য অংশে ছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন, সীমান্তে দু-দুটি যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক স্তরে বিবিধ সংকট আর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণীর প্রতি ব্যাপক জনসাধারণের অনাস্থাজনিত ক্রোধ।

তিন দশকের বেশী সময় আগে সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণা ছিল অপরিসীম। কংগ্রেস সরকারের বহুবিজ্ঞাপিত ও প্রচারিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আর মৌল ভূমি সংস্কারের ফাঁকফোঁকর এত বেশি ছিল যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেশীয় বৃহৎ পুঁজিপতি ও গ্রামীণ ভূস্বামী ও ফাটকা ব্যবসায়ীদের করতলগত হয়। মানুষ ক্রমেই বুঝতে পারে যে এই স্বাধীনতা হচ্ছে ধনীদের বেপরোয়া লুণ্ঠনের স্বাধীনতা। কৃষিক্ষেত্রে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করলেও 'চাষীর হাতে জমি' এই নীতি গ্রহণ করতে নেহরু রাজী হননি। উপরন্তু নানা উপায়ে কৃষিপণ্যের দাম শিল্পপণ্যের দামের তুলনায় চেপে রাখা হল। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পি.এল. ৪৮০ প্রকল্পের মাধ্যমে সস্তায় শস্যপণ্য আমদানী করেও দামের এই বৈষম্য বজায় রাখা হল। এর ফলে একদিকে মাঝারী ও ক্ষুদ্র চাষীরা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ল, অন্যদিকে বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দেশীয় শিল্পপতিরা একচেটিয়া মুনাফা লুটতে লাগল। ষাটের দশকে এসে ভারতীয় অর্থনীতি নিমজ্জিত হল গভীর সংকটে। পনের বছরের পরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে নেমে গেল জীবনযাত্রার মান, কমে গেল মাথাপিছু খাদ্যশস্যের যোগান।

ষাট-এর দশকে খাদ্যাভাবে মানুষের জীবননির্বাহ করাই ছিল এক কঠিন কাজ। এখন থেকে ৩০-৩৫ বছর আগে একজন সাধারণ মজুরের দৈনিক আয় ছিল মাত্র ২১/২-৩ টাকা। একজন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের মাসিক বেতন ছিল ১৫০/২০০ টাকা। ১৯৬৭ সালে চালের কেজি ছিল ৫.০০ টাকা।[৪] দৈনিক মজুরীর প্রায় দ্বিগুণ দাম চালের হওয়ায় মানুষকে অর্ধাহারে-অনাহারে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের ক্ষেতমজুরদের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। পশ্চিমবঙ্গে এমন কোন এলাকা ছিল না যেখানে ভুখা মিছিল হয়নি। বস্তুতপক্ষে প্রতি বছরই আকালের মরশুমে শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিনে-জেলার গ্রামাঞ্চল থেকে কৃষকদের জুটিয়ে এনে সদরে মিছিল করে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের কাছে দাবি দাওয়া পেশ করাই ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির প্রথামাফিক দায়িত্ব। নির্বাচন-সর্বস্ব বামপন্থী দলগুলি মানুষের এই ক্ষোভ ও প্রচণ্ড কষ্টকর জীবনকে পুঁজি করে ভবিষ্যতে নির্বাচনী সাফল্যলাভের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। এই কারণে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, বিক্ষোভে মানুষকে পরিচালিত করা হলেও সেই আন্দোলনকে শোষণের মূল কেন্দ্রটিকে চিহ্নিত করার কাজে বা ভাঙ্গার লক্ষ্যে আদৌ নিয়োজিত করেনি এই দলগুলি। নতুন ধরনের রাজনৈতিক দলের চাহিদা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে ছাত্রযুব সমাজে এবং নিপীড়িত কৃষকদের মধ্যে দেখা দেয়।

সারণী—১.১
Cost of Living Index
(Base : November, 1950-100)

	Expenditure Levels in Rupees									
	1-100		101-200		201-350		351-700		700 & Ab(	
Year	Food	All combined	Food	All combined	Food	All combined	Food	All combined	Food	All combined
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Krishnagar Town										
1956	74.8	84.6	75.6	86.0	76.9	89.1	77.4	89.4	81.1	93.9
1957	80.5	89.2	81.1	90.0	82.1	92.4	82.2	92.5	85.7	96.2
1958	83.4	92.4	94.0	92.8	84.7	95.2	84.3	94.6	86.7	98.6
1959	86.5	94.6	87.0	95.0	87.8	97 1	87.3	96.4	90.3	100.5
1960	85.9	94.3	86.4	94.7	87.2	96.9	86.3	96.2	92.0	101.7

Table : 4.3 Source : State Statistical Bureau, Govt. of West Bengal.

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও গণআন্দোলনের অনুকুল ছিল। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ভূমিকার বিরুদ্ধে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় যে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে ওঠে তাকে জয়যুক্ত করার জন্য আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সক্রিয় ছিল। তৃতীয় বিশ্বে বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল গ্রাম—এই তত্ত্বকে আরও একধাপ প্রসারিত করে লিনপিয়াও ষাট দশকেই এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে পশ্চিম ইউরোপ-আমেরিকা প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলি পৃথিবীর শহরস্বরূপ এবং তৃতীয় বিশ্ব এ পৃথিবীর গ্রামাঞ্চল এবং গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার সেই সুপরিচিত তত্ত্বকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় গণমুক্তি সংগ্রামগুলিকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানাতে হবে। অন্যদিকে মস্কো নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহাবস্থানের ত্রয়ী নীতি—যা ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করেছিলেন—তা আঁকড়ে থাকে। এই তিনিটি নীতিতে বলা হয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদ মরণোন্মুখ। কোটের বোতামের সেলাই পুরনো হলে বোতাম যেমন আপনিই আলগা হয়ে পড়ে যায়—সাম্রাজ্যবাদও তেমনি ধ্বংস হয়ে যাবে আপনিই। এই ধ্বংসকার্যের জন্য বিপ্লবী সংগ্রামের তত্ত্ব মস্কোর নেতৃত্ব বাতিল করে দেয়। নিয়ে আসে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের তত্ত্ব। অন্যান্য দেশের এক বৃহৎ অংশের কমিউনিস্টদের কাছে ব্যাপারটি প্রায় 'সোনার পাথরবাটির' মতো অভাবনীয় শোনায়। দেশে দেশে এই ক্রুশ্চেভীয় তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক শুরু হল এবং বিরোধী

ধারণা দানা বাঁধতে লাগল। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান নেতৃত্ব ১৯৫৬ সাল থেকেই ক্রুশ্চেভের ত্রয়ী নীতির অনুসারী ছিলেন। ১৯৫৫ সালের পালঘাটে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে বুর্জোয়াদের সাথে সহযোগিতার লাইন নেওয়া হয়। ভারতের শাসকদলকে 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতিশীল জাতীয় বুর্জোয়া' আখ্যা দিয়ে যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হয়। (কালক্রমে এই নীতি 'কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল খোঁজা বা উকুন বাছার' তত্ত্ব হিসাবে একটা প্রচলিত ঠাট্টায় গিয়ে দাঁড়ায়)। এর পরপর দুটি আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনেই বস্তুতপক্ষে ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট আন্দোলনের আসন্ন সংকটের চেহারাটি স্পষ্ট নির্ধারিত হয়ে যায়। ১৯৫৭ সালের নভেম্বরের ১৪ থেকে ১৬ মস্কোয় অনুষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্মেলন ও ১৯৬০ সালের নভেম্বর বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৮১ পার্টির সম্মেলন। প্রথমটি পরিচিত ছিল ১২ পার্টির সম্মেলন হিসাবে। দুটি সম্মেলনই সমকালীন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘোষণা তথা দলিলের জন্য বিখ্যাত। দ্বিতীয় সম্মেলন থেকেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (CPC), সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (CPSU) সঙ্গে তাত্ত্বিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার বিরোধ। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মূল বক্তব্য ছিল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদ লেনিনবাদের মতাদর্শ থেকে সরে যাচ্ছে। ১৯৬৩-র মধ্যেই একদিকে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্রম-অবনতি শুরু হয় এবং অন্যদিকে ভারতেও কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে সাবেকী মতাদর্শীদের সঙ্গে তথাকথিত 'চীনপন্থী'-দের মধ্যে অবিশ্বাস, বিদ্রূপ ও বিরোধিতার সম্পর্ক বাড়তে থাকে। এইভাবে ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুটি দলিল সম্পর্কে চীন ও সোভিয়েত পার্টির পরস্পর বিরোধী ভাষ্য ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতেও নতুন উদ্যমে গোষ্ঠী বিন্যাসের প্রক্রিয়াতে ইন্ধন যোগায়। শুরু হল 'চীনপন্থী' ও 'রুশপন্থী' দুটি গ্রুপে কমিউনিস্ট-দের বিভক্তিকরণ।

ষাটের দশকের সূচনায় এইভাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ায়। বৃহত্তর প্রেক্ষাপট থেকে আমরা এবার সরে আসব কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুসৃত কৃষক বিদ্রোহের ঐতিহ্য নিয়ে বহমান একটি জেলার ইতিহাসে। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি থেকে কিভাবে নদীয়া জেলার কমিউনিস্ট কর্মীরা কালক্রমে জঙ্গী বামপন্থী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েন, তা বোঝার জন্য দরকার এই জেলার বামপন্থী নেতৃত্বের চিরাচরিত চেহারাটা জানা।

নদীয়া জেলায় কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন দীর্ঘদিনের। ১৯২০ সালে নদীয়া জেলার চুয়াডাঙা মহকুমার কাপাসডাঙা গ্রামে প্রথম জেলা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এক ইটালিয়ান পাদ্রী—ফাদার বারেতার নেতৃত্বে। ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলনের অধিবেশন ডাকা হয় হেমন্তকুমার সরকার, শামসুদ্দীন আহমেদ, কুতুবউদ্দীন আহমেদ প্রমুখের উদ্যোগে, সেখানে 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল'-এর প্রতিষ্ঠা হয় (পরে পরিবর্তিত নাম

হয়—দি পেজ্যান্টস অ্যাণ্ড ওয়ার্কাস পার্টি অফ্ বেঙ্গল)। বলা দরকার যে ১৯২০ সাল থেকেই নদীয়ার বিভিন্ন জায়গায়—কুষ্টিয়া মহকুমার পোড়াদহ, ভেড়ামারা, খোক্‌সা, কাপাসডাঙ্গায়, চাকদহ্ থানার কোনো কোনো অঞ্চলে উঠবন্দী প্রথা বিলোপ-এর দাবীতে বঙ্গীয় প্রজা কমিটি-র নেতৃত্বে আঞ্চলিক আন্দোলন হয়। ১৯২৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে নদীয়ার কুষ্টিয়া মহকুমা, চুয়াডাঙ্গা মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় 'সাইমন কমিশন ফিরে যাও'—আওয়াজ তোলে কৃষকরা। ১৯৩০ সালে স্বাক্ষরিত গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে পূর্বের কৃষক-বিরোধী প্রজাস্বত্ব আইনের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা হয়নি। এর প্রতিবাদে ১৯৩১ সালে নদীয়ার তেহট্ট থানার চাঁদেরহাট অঞ্চলে যে কৃষক আন্দোলন হয় তাতে ১৫০ জন মহিলা অংশ নেন, সতীশ সর্দার নামে এক কৃষক নেতা পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান। ১৯৩৬ সালে নদীয়া জেলা থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার কলকাতা সম্মেলনে অন্যতম সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন হেমন্ত সরকার। এই সময়ে কুষ্টিয়ার খোক্‌সা-জানীপুর অঞ্চলে নিত্যানন্দ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি কলকাতা থেকে শিক্ষকতা করতে আসেন। পরবর্তীকালে ইনি কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে লাগেন। জেলার বিভিন্ন স্থানে—যেমন, নবদ্বীপ থানার মাজদিয়া, সজিনপুর, তিওড়খালি, বামনপুকুর এবং কোতয়ালী থানার ব্রহ্মনগর, উসিদপুর, নিজামপুর, কাশীবাস, গঙ্গাবাস—প্রভৃতি গ্রামের কৃষকরা গঙ্গার চর এলাকায় নিজেদের দখল রাখা, হাটে-বাজারে বে-আইনী তোলা না দেওয়া, আবাদী জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা প্রভৃতি ইস্যুতে আন্দোলন চালায়, কোথাও তাদের জয়ও হয়। নবদ্বীপে কৃষ্ণনগরের রাজার প্রতিষ্ঠিত বাজারে ও কৃষ্ণনগরের চেৎলাঙ্গিয়া বাজারে চাষীদের পণ্য নিয়ে আসাকে বাধা দেওয়ায় বিচ্ছিন্নভাবে এক কৃষক আন্দোলন চলে। এ সময়ে কৃষক ও মৎসজীবি আন্দোলনের মূল শ্লোগান হয় 'বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হোক', 'বিনামূল্যে কৃষকদের হাতে জমি চাই', 'লাঙল যার জমি তার'' ও 'জাল যার জল তার'—ইত্যাদি। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিলকপুর গ্রামে নদীয়া জেলা কৃষক সম্মেলন সংগঠিত হয়। এই সম্মেলনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতা আবদুল মোমিন সভাপতিত্ব করতে আসেন, কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে তাঁকে তিলকপুরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কৃষকরা ছয়জোড়া বলদের গাড়ি আনেন। একথা বলার তাৎপর্য এই যে, সে সময় কৃষক সম্মেলনকে ঘিরে এর হোতাদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণ ছিল। এই সময় নদীয়া জেলা কৃষক সমিতির নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ছিল ২৩ জন—যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুশীল চ্যাটার্জী, কুষ্টিয়ার শ্রমিক-কৃষক নেতা পূর্ণ পাল, হাঁসডাঙার সদরুদ্দীন বিশ্বাস, মেহেরপুর-এর মাধবেন্দু মোহন্ত, নবদ্বীপের অমিয় রায়, মুরারী গোস্বামী, কৃষ্ণনগরের অমৃতেন্দু মুখার্জী প্রমুখ। ১৯৩৮-৩৯-এ দর্শনার চিনি কল ও মদের কারখানার মালিক কেরু এ্যাণ্ড কেরু-কোম্পানীর শ্রমিকদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হয়। পাশাপাশি যখন এই কোম্পানী আখচাষের ফার্ম করার জন্য স্থানীয় জমিদার-জোতদারদের কাছ থেকে আবাদী জমির মালিকানা স্বত্ব কিনে নেয়, এমনকি অনেক চাষীর দখলি স্বত্ববিশিষ্ট জমিও দখল

করে নেয়, এর বিরুদ্ধে হাঁসখালী থানার বিভিন্ন গ্রামে, কৃষ্ণগঞ্জ থানার বিভিন্ন এলাকায়, চুয়াডাঙা থানার নীলমণিগঞ্জে কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৩৯ সালে কুষ্টিয়া মহকুমার হরিনারায়ণপুর গ্রামে সারা ভারত কৃষকসভার নদীয়া জেলা শাখার দ্বিতীয় সম্মেলন হয়। সম্মেলনে মুজফ্‌ফর আহমেদ, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ আসেন। জেলা কমিটির সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয় ২৭। ১৯৪৩-এ কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে সৈয়দ নৌশের আলির সভাপতিত্বে তৃতীয় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে নদীয়া জেলার বহুস্থানে কৃষকরা সংগঠিত আকারে বেশকিছু আন্দোলনের জন্ম দেয়—যেমন কুষ্টিয়া মহকুমার পোড়াদহ, খোকসা-জানীপুর গ্রামে, তেহট্ট থানার বহু গ্রামে, পলাশীপাড়া ও সাহেবনগর দরিবাপুর এলাকায় আধাভাগের বদলে তেভাগার দাবীতে, জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধের দাবীতে ও খেতমজুরের মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে আন্দোলন হয়। কৃষক-আন্দোলনের আঞ্চলিক নেতা হিসাবে উঠে আসছিলেন খোক্‌সা-জানীপুর এলাকার সুরেশ রায়, মাধবেন্দু মোহন্ত, নসীরাম দাস, নলিনী মণ্ডল, সমরেন্দ্রনাথ সান্যাল, চণ্ডী কর, ইন্দু ভৌমিক, শান্তিপুর থানার বিমল পাল, নবদ্বীপের কানাই কুণ্ডু ও আরো অনেকে। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, চল্লিশের দশকের শুরুতে নদীয়ার কিছু অঞ্চলে বিশেষতঃ চাকদহ ও কোতয়ালী থানা এলাকার ধুবুলিয়ায় ও রানাঘাট থানার এখনকার কুপার্স ক্যাম্প এলাকায় বৃটিশ শাসকদের সামরিক প্রয়োজনে ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে জমি দখল শুরু হয়। কল্যাণীর বহু ছোট বড় গ্রাম থেকে হাজার-এর ওপর গ্রামবাসীকে আবাদী জমি ও বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করে মার্কিন সৈন্যদের থাকার প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে রুজভেল্টনগরী স্থাপন করা হয়। এ সবের প্রতিবাদেও বিচ্ছিন্নভাবে কৃষক আন্দোলন হয়, কারণ কৃষকসভাগুলি ও অন্যান্য সমাবেশের ওপর তখন দমননীতি শুরু হয়েছিল কার্যত বে-আইনী ঘোষণা করে। তেভাগা আন্দোলনও এ জেলায় তেমন প্রসার লাভ করেনি।[৬]

এই সময়েই এল দেশভাগের জ্বলন্ত সমস্যা। নদীয়া এমনিতেই চিহ্নিত ছিল খাদ্যে ঘাটতি জেলা হিসাবে। দেশভাগের পরবর্তী পরিস্থিতিতে জনস্রোতের তুমুল ধাক্কা সামলাতে হয় এই জেলাকে। অর্থনীতির অবাস্তব পরিকল্পনায় তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দিল এখানে। সে সময় বর্ধমান জেলা থেকে নিয়ে আসা হত ধান, গুড়; বদলে পাঠান হত কলাই, কাঁঠাল ইত্যাদি। দেশভাগের ফলে দেখা গেল সমস্ত পাটকল রইল এপারে, পাটের জমি ওপারে। এ ঘাটতি মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে এ অঞ্চলের ধান ফলানোর জমিতে প্রায় জোর করেই পাট ফলানো শুরু হল বিদেশী মুদ্রার লোভে। এই জবরদস্তির অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় উদ্বাস্তুর পাশাপাশি এল আকাল। প্রায় প্রত্যেক বছরই অঘোষিত দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকত। বামপন্থীদের উদ্যোগে এই সময় নদীয়া জেলায় 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি' গড়ে ওঠে। সীমান্ত অঞ্চলের গ্রামগুলোতে প্রচণ্ড চাল সংকট দেখা দিল—চাপরা, কালিনগর, মাজদিয়া, বানপুর, গেদে—এইসব এলাকায়। একথা মানতেই হবে যে গোটা ষাটের দশক জুড়ে—প্রকৃতপক্ষে তার আগে থেকেই মূলতঃ বামপন্থী ছাত্রশক্তি এই খাদ্যসংকটকে

সাময়িকভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছে বিভিন্ন জঙ্গী কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে কৃষ্ণনগর শহর এলাকায় রাতে ব্যারিকেড তৈরী করে চালের লরী আটকানো হত। চাল পাওয়া গেলে তা সেখানেই বিক্রী করে দেওয়া হত। তীব্র খাদ্যসংকট আর উদ্বাস্তু সমস্যা—দুই-এ মিলে নদীয়ায় বামপন্থী আন্দোলনে এল নতুন জোয়ার এবং জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রকৃত অর্থে ফুল ফোটার সময়।

উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ

নদীয়া জেলায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা যত জটিল আকার ধারণ করেছিল তেমন আর কোথাও করেনি। ১৯৪৭-৫৫ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে অভ্যন্তরীণ জেলাগুলি থেকে সীমান্তবর্তী জেলা নদীয়া ও চব্বিশ পরগণাতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন অনেক বেশী ঘটেছিল। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে চব্বিশ পরগণা জেলায় উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল ২৭.৫ শতাংশ, নদীয়া জেলায় ২৫.১ শতাংশ, কলকাতায় ২৫ শতাংশ। অর্থাৎ এই তিনটি জেলাতে একত্রে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৮ শতাংশ এবং অপর ১৩টি জেলায় ছিল ৩২ শতাংশ।[৭]

"১৯৪৭-এর আগস্ট মাস থেকে ১৯৪৯ অবধি এদেশে চলে আসা নথিভুক্ত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। তাদের মধ্যে বেশীরভাগই ক্যাম্পবাসী। নদীয়া জেলায় উদ্বাস্তুদের রাখার জন্য ধুবুলিয়া, চামটা আর রাণাঘাটে মূল শিবিরগুলি খোলা হয়েছিল। ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ থেকে এদেশে সমস্ত রেকর্ড ভেঙে উদ্বাস্তু আগমনের ঢল নামল।"[৮] খুলনা, রাজশাহী, ঢাকা, বরিশালে ব্যাপক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার ফল ছিল এটা। ১৯৭১ সালের নদীয়া জেলার জনসংখ্যা পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে ১৯৫১ থেকে ১৯৬১—এই দশ বছরে কত বাড়তি মানুষের চাপ সহ্য করতে হয়েছিল এই জেলাকে।

সারণী—১.২

Decadal Variation in Population sice 1951

District	Year	Persons	Decade Variation	Percentage Decade Variation	Male	Female
1	2	3	4	5	6	7
Nadia	1951	1,144,156	+303,768	+36.15	590,573	553,583
	1961	1,713,683	+569,527	+49.78	879,710	833,973
	1971	2,230,270	+516,587	+30.14	1,144,977	1,085,293

District Census Handbook (Part X-C)
Census 1971, Series 22, W.B., Page-7

তীব্র খাদ্যাভাবের সঙ্গে যুক্ত হল এই অগুণন মানুষের পুনর্বাসনের প্রশ্ন। পাশাপাশি ছিল পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্য; এই জাতীয়-বিপর্যয়কে কেবল বাংলার বিপর্যয় বলে চালানোর সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ব্যাপারটা দাঁড়ালো অনেকটাই কার্যক্ষেত্রে নদীয়া জেলার বিপর্যয়। নদীয়া জেলার আগেকার তিনটি মহকুমা মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং কুষ্টিয়ায় ভালো খাদ্যশস্য উৎপন্ন হত। এই তিনটি কৃষিসমৃদ্ধ মহকুমাই দেশভাগের ফলে পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যায়। তখনকার বাকি দুটি মহকুমা রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগর ছিল ঘাটতি এলাকা ও মূলতঃ শহরকেন্দ্রিক দুটি মহকুমা। কৃষ্ণনগর মহকুমার উত্তরাঞ্চলে কিছুটা শস্য উৎপাদন হত। কিন্তু পূর্বতন নদীয়ার তিনটি মহকুমার বাস্তুহারারা আশ্রয় নিল এই পারে, মূলতঃ রাণাঘাট মহকুমাতে। "কৃষ্ণনগরের কাছে ধুবুলিয়া এবং রাণাঘাটের কাছে কুপার্স ক্যাম্প দুটি বিশাল রিফিউজি ক্যাম্প গজিয়ে উঠল। এদের ভবিষ্যৎ যে কি, তার কোন পরিকল্পনাই ছিল না। সামান্য একটু 'ডোল' নামে সরকারী ভিক্ষার ওপর এদের অনিশ্চিত জীবনযাপন চলতে লাগল। বড় বড় ও লম্বা লম্বা মিলিটারি ব্যারাক বা ছাউনিকে ক্যাম্প বানানো হয়েছিল। একেকটি লম্বা ছাউনির মেঝেতে দশ বাই দশ ফুট করে খড়ির দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে একেকটি পরিবারকে বসবাসের জন্য দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ একটা লম্বা ছাউনির তলায় অনেক পরিবারকে থাকতে হত ঐ দশ বাই দশ অর্থাৎ একশ ফুট খড়ির গণ্ডির মধ্যে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা মনে পড়ে।"[৯] মনে রাখতে হবে এই উদ্বাস্তুরা সবাই গৃহস্থ পরিবারের সন্তান ছিলেন—কেউ উদ্বাস্তু হয়ে জন্মাননি। অথচ যে অমানুষিক পরিবেশে তাদের থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল, তাতে না ছিল গৃহস্থ পরিবারের আব্রু, না ছিল নিরাপত্তা। জীবনযাপনের পুরোটাই তখন খোলা বই এর মত অবারিত, অনাবৃত।

বাস্তুহারাদের বাঁচিয়ে রাখা, পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের দাবিতে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হল। সমস্যা যত জটিল ও ঘনীভূত হয়েছে আন্দোলন তত তীব্ররূপ নিয়েছে। এই আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে কমিউনিস্ট পার্টি দৃষ্টি দেয়। আন্দোলনরত মানুষও অবলম্বনের খোঁজে প্রধান পছন্দের তালিকায় কমিউনিস্ট পার্টিকে রাখে। একটা কথা এই প্রসঙ্গে উঠে আসে। নদীয়া জেলায় কংগ্রেসী প্রভাব চিরকালই শক্তিশালী। উদ্বাস্তু আন্দোলনের খেই ধরে আর. সি. পি. আই প্রথম এই কংগ্রেসী দুর্গে আঘাত হানে; আর.এস.পি-ও সঙ্গে ছিল। পঞ্চাশের দশকে আর.সি.পি.আই-এর 'উদ্বাস্তু পঞ্চায়েত' নামে একটি শাখা রাণাঘাটে 'কুপার্স' ট্রানজিট ক্যাম্পে কাজ শুরু করে। রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে সে সময় প্রায় এক লক্ষ উদ্বাস্তু বাস করত। এছাড়া রাণাঘাটে 'রূপশ্রী' নামে আর একটি উদ্বাস্তু শিবির খোলা হয়েছিল, মূলতঃ দেশবিভাগের শিকার হিসাবে অনাথ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা রমনী বা পিতৃমাতৃহীন শিশুদের নিয়ে। কুপার্সে থাকত এক-একটি পরিবার। সেখানে ক্যাম্প বলতে ছিল এক একটা গোডাউন এর ছাউনি বা 'শেড'-এর তলায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি পরিবারের ঠেসাঠেসি করে জীবনযাপন। একটি পরিবার মানে মা-বাবার সঙ্গে বয়ঃপ্রাপ্ত কিংবা পুত্রবধূসহ

সন্তানেরা। বোঝাই যায়, স্বাভাবিক জীবনযাপনের কোনো অবকাশই ছিল না সেখানে।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন যখন শুরু হয়, তখন প্রথমে জেলারই আশপাশের কিছু এলাকা পুনর্বাসনের জন্যে চিহ্নিত হয়, যেমন চাকদহের খোসবাসমহল্লা বা গয়েশপুর কিংবা রাণাঘাটের রথতলা কলোনী। আর সি.পি.আই সেসময় পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কয়েকটি পূর্বশর্ত্ত রাখে, যেমন, যেখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে সেখানে যেন একটি পরিবারকে সম্ভ্রম বজায় রেখে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত ও বিবাহিত সন্তানদের আলাদা পরিবার হিসাবে গণ্য করে মা-বাবার থেকে পৃথক বরাদ্দ দিতে হবে। তাছাড়া পরিকল্পিত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ জীবিকার বিভিন্নতা অনুযায়ী যেন পুনর্বাসন হয়। সে সময় এক একটি উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসনের খাতিরে দু কাঠা মত জমি, সঙ্গে ২২০০ টাকা নগদ ও ৭৫০ টাকা ক্ষুদ্র শিল্প ঋণ হিসাবে দেওয়া হত। এখন ধরা যাক একটি মৎসজীবী পরিবারকে রাণাঘাট শহরের মধ্যে জমি ও টাকা দেওয়া হল, তাহলে এই পুনর্বাসন তার পক্ষে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় কারণ তার অভ্যস্ত জীবিকা নির্বাহের পূর্বশর্ত্ত অবশ্যই নদীর কাছাকাছি কোন এলাকা হওয়া উচিত।

বাংলার বাইরে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের যে পরিকল্পনা হয়েছিল আর.সি.পি.আই সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে—অবশ্য শর্তসাপেক্ষে। শর্ত ছিল এই যে, আন্দামান বা দণ্ডকারণ্যে বাঙালী উদ্বাস্তুদের পাঠাতে হলে পরিবার হিসাবে নয়, দল হিসাবে পাঠাতে হবে। যাতে তারা একটা নতুন জায়গায় নিজেদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও সত্ত্বা অক্ষুন্ন রেখে বসতি স্থাপন করতে পারে।

ঠিক এই সমর্থন জ্ঞাপনই উদ্বাস্তু রাজনীতিতে আর.সি.পি.আই-এর পালের হাওয়া কেড়ে নেয়। পঞ্চাশের দশকে রাণাঘাটে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল দু-একজন ব্যক্তিনির্ভর—যেমন গৌরকুণ্ডু, সাহারাম দাস, হরবন সিং (লালঝাণ্ডা ইউনিয়ন), শিবশঙ্কর দত্ত—প্রমুখদের নিয়ে। এই সময় কিছু যুবক—মূলতঃ এই দাবীগুলির প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেই সি.পি.আই-তে যোগ দিলেন, কারণ কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম থেকে উদ্বাস্তু প্রশ্নে বাংলার বাইরে বাঙালীকে পাঠানোর তীব্র বিরোধিতা করেছিল। এই যুবকদের মধ্যে থেকে পরবর্তীকালে রাজ্যস্তরে নামকরা কিছু কমিউনিস্ট নেতা উঠে আসে যেমন দীনেশ মজুমদার, সুভাষ বসু প্রমুখ—যাঁরা নিজেরা উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান ছিলেন। সুভাষ বসু (প্রাক্তন সি.পি.আই.এম বিধায়ক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা) রূপশ্রী পল্লীর কমিউনিস্ট সংগঠক ও রাণাঘাট লোকাল কমিটির সদস্য হিসাবে নদীয়ার একজন নামকরা সি.পি.এম নেতা হিসাবে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে রাণাঘাটে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বই ধীরে ধীরে কায়েম হয় (মধ্য-পঞ্চাশ অবধিও রাণাঘাটে আর.সি.পি.আই. এর একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সোসালিস্ট পার্টি, অসীম মজুমদার, তিনকড়ি ভট্টাচার্য প্রমুখদের নিয়ে। তারপরেই রাণাঘাট রাজনৈতিক প্রাধান্যের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসী শিবিরে ভাগ হয়ে যায়)।[১০]

ধুবুলিয়ায় সাতচল্লিশের দেশভাগের পরপরই রিলিফ ক্যাম্প তৈরী হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে

মার্কিনী সৈন্যদের ব্যবহার-এর জন্য নির্মিত চাঁদমারি, বিমান রাখার হ্যাঙ্গার বা সৈন্যদের বসবাসের কোয়াটার্স, এগুলিতে ওপার বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের রাখার ব্যবস্থা করা হল। নোয়াখালি দাঙ্গার পরপরই যারা চলে আসে, তারা 'ওল্ড ক্যাম্পে', যা সৈন্যদের কোয়াটার্স ছিল—বাস করতে শুরু করে। বরিশাল দাঙ্গার পরে যারা চলে আসতে বাধ্য হয়, তারা ওঠে 'নিউ ক্যাম্প'-এ। বিস্তীর্ণ রানওয়ের ওপর টিনের একচালা শেড-এর তলায় দরমার বেড়া দেওয়া ঘর নিয়ে তৈরী হয় এই 'নিউ ক্যাম্প'—যেখানে সংখ্যায় প্রায় সত্তর হাজার উদ্বাস্তু থাকত। এমন একটা সময় ছিল, যখন ধুবুলিয়ায় 'ওল্ড' ও 'নিউ' ক্যাম্প মিলিয়ে এক লক্ষ উদ্বাস্তুর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

বলাবাহুল্য, সেটা সভ্য ভাবে বসবাসের কোন ব্যবস্থা নয়। জনস্বাস্থ্যের দিকে কোনো নজর দেওয়া হয়নি—প্রচুর মড়ক হত, দৈনিক এত লোকের মৃত্যু হত যে, চিতার আগুন নিবত না।[১১] ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবিরের মানুষদের এজন্য ক্ষোভ-বিক্ষোভের শেষ থাকত না। 'ডোল'-এর পরিমাণ ছিল সপ্তাহে মাথাপিছু দু সের চাল (পরিবার অর্থে পাঁচজন সদস্য ধরা হত, ফলে যে পরিবারে সাত-আট জন সদস্য, তাদের ওই একই বরাদ্দে ভাগের পরিমাণ কমত) বছরে তিনবার পরিধেয় বস্ত্র, শীতে তুলোর কম্বল। উদ্বাস্তু ছেলেদের পড়াশুনার জন্য যে অর্থ সাহায্য দেওয়া হত, তা জমা পড়ত ক্যাম্প-এর প্রশাসক-এর কাছে, কারণ তিনিই ছিলেন ক্যাম্পের স্কুল সম্পাদক। এখানেও প্রশাসক-এর সদিচ্ছার উপর বুক গ্রান্ট পাওয়া বা ট্যুইশন ফি জমা হওয়া নির্ভরশীল ছিল। ক্যাম্পের বাসিন্দাদের প্রতি যুদ্ধাপরাধী সুলভ ব্যবহার প্রায়ই ক্ষিপ্ত করে তুলত এদের। প্রতিদিন দুবেলা রোল-কল করে মাথা গোনার ব্যবস্থা ছিল। গুণতিতে কম পড়লে 'ডোল' বন্ধ। চৌষট্টিতে সরকারী একটি আদেশনামায় বলা হয় যে ক্যাম্পে যে শিশুরা জন্ম নিচ্ছে, তারা 'উদ্বাস্তু' পরিচয়ের যোগ্য নয়। সুতরাং ভারত সরকার তাদের 'ডোল'-এর ব্যবস্থা করবে না। এই অমানবিক আদেশের বিরুদ্ধে ক্যাম্প-এর মানুষরা ধুবুলিয়ার দশটি সরকারী অফিস ঘেরাও করে। সরকার ঘেরাওকারী উদ্বাস্তুদের 'ডোল' কেটে দেয়।

এর মধ্যেই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত কমিউনিস্টদের দল মিলিত হয়ে উদ্বাস্তুদের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য ইউ.সি.আর.সি তৈরী করেন মূলতঃ সঠিক পুনর্বাসনের দাবীতে। ধুবুলিয়া উদ্বাস্তুদের নেতা হিসাবে ইউ.সি.আর.সি-এর প্রথম আঞ্চলিক সম্পাদক হন কানাইলাল আচার্য। প্রথম নদীয়া জেলা সম্পাদক হন অমৃতেন্দু মুখার্জী। উনষাট সালে কেন্দ্রীয় সরকার দণ্ডকারণ্য উদ্বাস্তু প্রকল্প ঘোষণা করলে ইউ.সি.আর.সি এই ঘোষণার প্রতিবাদ করে। সেইসময় রোজই ধুবুলিয়া থেকে হাজার-এর ওপর উদ্বাস্তু জেলাশাসকের দপ্তরে গিয়ে অবস্থান করত। এর শাস্তিস্বরূপ পরিবার শুদ্ধ 'ডোল' বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই সার্কুলারও জারি করা হয় যে পুলিশের খাতায় নাম উঠলেই 'ডোল' বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে। মূলতঃ 'ইউ.সি.আর.সি'র কার্যকলাপ ধুবুলিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির ভিত তৈরী করে।

ইউ.সি.আর.সি-র বাইরে ধুবুলিয়া শিবিরে 'পুর্ব ভারত উদ্বাস্তু পরিষদ' নামে আরও একটি উদ্বাস্তু সংগঠন গড়ে উঠেছিল। মূলতঃ নমঃশূদ্র পরিবারগুলিকে কেন্দ্র করে যোগেন্দ্র মণ্ডল নামে এক উদ্বাস্তু নেতা এই সংগঠন গড়েন। সত্যশরণ মজুমদার নামে আরও একজন নেতা ইউ.সি.আর.সি—নিরপেক্ষভাবে উদ্বাস্তু রাজনীতি করতেন।[১২]

এইভাবে কমিউনিস্ট পার্টি উদ্বাস্তুদের মধ্যে দ্রুত সংগঠন বৃদ্ধি করে যেতে লাগল। কোথাও জবরদখল কলোনী, কোথাও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নিয়ে সংগ্রাম—এইসব ইস্যুতে। বলা বাহুল্য যে, খুব গভীরভাবেই কমিউনিস্ট পার্টি তখন উদ্বাস্তুদের সমস্যাটা বুঝতে পেরেছিল এবং তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ধীরে ধীরে শহরাঞ্চলে কংগ্রেস-বিরোধী একটা হাওয়া ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র তখন পরপর বিক্ষোভ, বিদ্রোহ চলছে। ট্রাম ভাড়া বিরোধী আন্দোলন (তেতাল্লিশ সালে) কলকাতার বাইরেও তীব্র উত্তাপ ছড়ায়। প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন চলে। নদীয়া জেলার শহরগুলি এ উত্তাপ বাঁচিয়ে চলেনি। সবার ওপরে তো খাদ্য সংকট ছিলই মানুষকে তাতিয়ে রাখার জন্যে। তখন রীতিমতো লাইনের যুগ। চাল এবং কয়লার অবস্থা মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। কয়লার সমস্যা আর চালের সমস্যাটা এমনই মজার হয়ে উঠেছিল যে নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন ধান্দাই থাকত কোথায় চাল উঠেছে, কোথায় কয়লা এসেছে। কৃষ্ণনগরেও 'ন্যায্যমূল্যে' চাল পাওয়া যেত মাঝে মাঝে। "ন্যায্যমূল্যের চাল কখন কোন দোকানে যে পাওয়া যাবে তা আগে থেকে জানার সাধ্য ছিল না বহু মানুষেরই। হয়ত রাতে গুজব ছড়িয়ে পড়ল কাল সকালে ঘূর্ণিতে অমুক দোকানে ন্যায্যমূল্যের চাল পাওয়া যাবে। অমনি প্রস্তুতি শুরু হল। ভোর রাতে উঠেই লাইন লাগাতে হবে। লাইনে দাঁড়ালে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সীমিত পরিমাণ চাল পাওয়া যাবে। লাইনে দণ্ডায়মান ব্যক্তিপিছু হয়ত এক সের বা দু সের। ...ভোর হতে না হতেই ছুটতাম। রাস্তায় এমন ছুটন্ত মানুষ বা কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণী পেয়েও যেতাম। তাও হয়তো একশ জনের পিছনে লাইন পেতাম। দোকান খুলবে বেলা আটটায়। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হতো ততক্ষণ তো বটেই তার পরেও অনেকক্ষণ...।"[১৩] খাদ্যসংকটের এক বিশ্বস্ত চেহারা ফুটিয়ে তোলে এই লেখা। ১৯৫৯ সাল—খাদ্যসংকটের বিস্ফোরণের সময়। "বাজারে চালের দাম লাফাতে লাফাতে প্রতি মণ ২২.৭৫ টাকায় উঠেছে। পুলিশ ছোটো ছোটো চালের কারবারীদের দোকানে হানা দিতে লাগল কিন্তু তাদের মজুত করা অতিরিক্ত চাল বড় বড় মজুতদার ও মিল মালিকদের অন্ধকার গোডাউনে চলে গেল। ...মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণ কমিটি ২০ আগস্ট তারিখ থেকে লাগাতার আন্দোলনের ডাক দিল। দেখতে দেখতে চালের দাম প্রতি মণ ২৯ টাকায় উঠল। ১৭ আগস্ট পুলিশ কলকাতা, শহরতলী, জেলা ও মহকুমা শহরের আন্দোলনের আহ্বায়ক বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতাদের সকাল থেকে ধরপাকড় শুরু করল। 'পুলিশ দিয়ে গণআন্দোলন রোখা যায় না যাবে না' ধ্বনিতে মুখর হল কলকাতাসহ সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ। কৃষ্ণনগর শহরও।"[১৪] সে সময় সুরেশ রায় নদীয়াতে জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক। '৫৯-এর খাদ্য আন্দোলনকে কলকাতায় চালান করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি

কার্যতঃ ভুখা মিছিলকে শহীদ মিছিলে পরিণত করে ফেলেছিল। জেলায় উনষাটের এই খাদ্য আন্দোলন কিন্তু গণআন্দোলনের চেহারা নিতে পারল না। কারণ, বিক্ষুব্ধ মানুষের সমস্ত উদ্যোগ সংহত হতে পারেনি কেবল আন্দোলনকে স্থানান্তরিত করার জন্য। কোনো স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ছাড়া অভ্যুত্থান ঘটে না। ছেষট্টিতে নদীয়ায় যে খাদ্য আন্দোলন জেগে উঠল, তাতে ক্ষুধিত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল অন্যতম উপাদান। এই পটভূমিকায় ভারতীয় কমিউনিস্টদের সমস্ত বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা নিয়ে ষাট-এর দশকে প্রবেশ করল নদীয়া জেলা।

সূত্র নির্দেশ

১ *চারু মজুমদার রচনাসংগ্রহ* ঃ রেড টাইডিংস, দ্বিতীয় প্রকাশন, জানুয়ারী, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৯।

২ 'ভারতবর্ষের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' ঃ *দেশব্রতী*, ১৬ই মে, ১৯৬৮, *চারু মজুমদার রচনাসংগ্রহ*, ঐ, পৃষ্ঠা-৯।

৩ *সুমন রায়* ঃ *'ভারতীয় অর্থনীতির বিবর্তন ও সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম'*, *অনীক* সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৫৫।

৪ চাকদহের অরুণ ভট্টাচার্যের লিখিত বিবৃতি থেকে উদ্ধৃত।

৫ এই প্রসঙ্গে আজিজুল হকের একটি বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। 'লাঙল যার জমি তার' বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার এই শ্লোগানের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে তাঁকে প্রথম সচেতন করেন তাঁর জমিদার পিতা। ভাগচাষীকে বাস্তবিকই লাঙলটিও যোগায় জোতদারই। পরবর্তীতে সাতগাছিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সভার অধিবেশনে তৎকালীন কৃষক সভার নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখকে আজিজুল হক এই শ্লোগানের যাথার্থ নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর পান—'লেনিন বলেছেন।' Land to the tillers—অর্থাৎ 'চাষ করে যে, জমি তার; লেনিনের এই উক্তির ভাষাগত বিকৃতি ঘটিয়ে এরকম বহু শ্লোগানকে রাজনৈতিক কৌশল ও অভিসন্ধিমূলক কাজে লাগানো হয়— লেখককে দেওয়া এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে আজিজুল হক এই মত দিয়েছেন।

৬ অবিভক্ত নদীয়া জেলায় কৃষক আন্দোলনের এই তথ্যগুলি পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ-এর পত্রিকা *পশ্চিমবঙ্গ-নদীয়া জেলা সংখ্যায় (১৪০৪) অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়* রচিত *'কৃষক আন্দোলনে নদীয়া জেলা'* প্রবন্ধ থেকে, পৃষ্ঠা—৬৩-৬৯, এবং কৃষ্ণনগরের প্রাক্তন সি.পি.আই(এম) বিধায়ক *সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার* থেকে।

নদীয়ায় শহরাঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির বেড়ে ওঠা প্রসঙ্গে জানা যায় যে, ১৯৩২

সাল থেকেই তরুণ কমিউনিস্ট কর্মীদের একটি গোষ্ঠী তৈরী হচ্ছিল। এই সময় নদীয়ায় বেশ কয়েকটি লাইব্রেরী গড়ে ওঠে যেখানে মার্কসবাদের চর্চা হত। কৃষ্ণনগরের সাধনা লাইব্রেরী ছিল এমনই একটি মার্কসবাদ চর্চা কেন্দ্র। সেখানে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অনেক বই আসত। প্রত্যেক রবিবার লালঝাণ্ডা তুলে কমিউনিস্ট পার্টির সভা হত সেখানে। মুজফ্‌ফর আহমেদ এমনকি কাজী নজরুল ইসলামও এসেছেন এই মিটিং-এ। অবশ্য মিটিং-এ লোক জড়ো হত খুবই কম-বড় জোর সাত-আট জন।

এ প্রসঙ্গে *গণশক্তি* পত্রিকা, ১৫ই আগস্ট, ১৯৯৭-এ প্রকাশিত *অমৃতেন্দু মুখার্জীর* স্মৃতিচারণা—*'কংগ্রেস আন্দোলন করুক, বন্দীদের অনশন চলবে'*, পৃষ্ঠা-১৮ দ্রষ্টব্য।

৭ *বাপী দে* ঃ নদীয়া জেলায় উদ্বাস্তু সমস্যা ঃ (১৯৪৭-৫৫), ইতিহাস অনুসন্ধান-৭, কে.পি.বাগচী এণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৯৩।

৮ *দেবদাস আচার্য ঃ 'সকালের আলোছায়া'*—স্মৃতিকথা, *গল্পসরণী-হেমন্ত, শীত, বসন্ত,* প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা—কার্তিক-চৈত্র, ১৪০৩, পৃষ্ঠা-৪০।
লেখক একজন প্রতিষ্ঠিত কবি। নিজে উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান হওয়ায় সংকটের দিনগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী শুধু নন, বেঁচে থাকার লড়াই-এর অংশীদারও।

৯ *তদেব,* পৃষ্ঠা-২৫।

১০ রাণাঘাটের উদ্বাস্তু রাজনীতি প্রসঙ্গে প্রাক্তন সি.পি.আই (এম) বিধায়ক *সুভাষ বসু* ও আর.সি.পি.আই-কর্মী *সুশান্ত চ্যাটার্জীর দেওয়া সাক্ষাৎকার* ভিত্তি থেকে রচিত।

১১ *ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার* ১১ই জুন তারিখে কৃষ্ণনগর থেকে পাঠানো এক সংবাদে জানা যায় যে ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবিরে সেই সময় পর্যন্ত গড়ে প্রতি মাসে ১২টিরও অধিক সংখ্যক শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়া 'আদি ধুবুলিয়া' উদ্বাস্তু আশ্রয় শিবিরে ৭ই জুলাই পর্যন্ত ৮টি ওয়ার্ডের যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে প্রকাশ, এই সময়ের মধ্যে নানা রোগে (যেমন, কলেরা, আমাশা, বসন্ত, উদরাময়, জ্বর, ডিপথেরিয়া ইত্যাদি) ভুগে ৬৮৫ জন উদ্বাস্তুর মৃত্যু হয়েছে এবং ২,৭৭৩ জন উদ্বাস্তু বিভিন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। এই তথ্যগুলি ১৯৫০-এর ১২ জুলাই-এর *আনন্দবাজারে* পাওয়া যায়।
সূত্র ঃ *বাপী দে—'নদীয়া জেলায় উদ্বাস্তু সমস্যা'*, ঐ, পৃষ্ঠা-৯৪।

১২ ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবিরের একদা বাসিন্দা, চৌষট্টি সাল থেকে সি.পি.আই (এম) সদস্য, বর্তমানে নদীয়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ *শান্তিরঞ্জন দাস*-এর বিবৃতি থেকে লিখিত।

১৩ *দেবদাস আচার্য ঃ 'সকালের আলোছায়া'*, ঐ, পৃষ্ঠা-৪১।

১৪ *তদেব,* পৃষ্ঠা-৫৮।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কমিউনিস্ট শিবিরে গোষ্ঠীবিন্যাস ও নদীয়া জেলা

বৃহন্নলা পর্ব

১৯৬১ থেকে ১৯৬৩-র মধ্যে সি.পি.এস.ইউ এবং সি.পি.সি-র মধ্যে যে তাত্ত্বিক বিতর্ক তুমুল হয়ে উঠেছিল, তার পরিণতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে সুদূর প্রসারী হয়েছিল। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব জর্জরিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ উর্বর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত বিতর্ক পার্টি-ভাঙনের বীজ ছড়িয়ে দিল। এই বীজে জলসিঞ্চনের কাজটি করল ১৯৬২ সালের অক্টোবরের শুরুতে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সংঘটিত ভারত-চীন সীমান্ত-সংঘর্ষ। ১৯৫৬ সালে "হিন্দী-চীনি-ভাই-ভাই" ধ্বনির উদ্গাতা এবং "চৌ-নেহরু" স্বাক্ষরিত 'পঞ্চশীল নীতি'র প্রবক্তা দুই মিত্রদেশ—ভারত ও চীন—পরস্পর সীমান্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হল। চীন অভিযোগ করল ভারত সীমানা লঙ্ঘন করে প্রথম চীনা ঘাঁটিতে আক্রমণ করে। ভারত অভিযোগ করল চীন প্ররোচনামূলকভাবে ভারতীয় সীমান্ত ঘাঁটির উপর প্রথম আক্রমণ করে। পারস্পরিক অভিযোগের উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু-র নেতৃত্বে পরিচালিত ভারত সরকার ১২ই অক্টোবর ১৯৬২ সীমান্ত 'মুক্ত' করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে প্রকাশ্য আদেশ দিল। বিতর্কিত ম্যাকম্যাহন লাইন বরাবর উভয় রাষ্ট্রের সীমানার পূর্ব-পশ্চিমাঞ্চলে আরম্ভ হল ২০ অক্টোবর থেকে সার্বিক যুদ্ধ। ২৭শে অক্টোবর, ১৯৬২ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'রেনমিন রিবাও'-এর সম্পাদকীয় বিভাগ কর্তৃক 'নেহরু দর্শন প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা' শীর্ষক নিবন্ধে লেখা হল যে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের শাসকগোষ্ঠী নেহরুর নেতৃত্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির মূল সূত্রগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে এবং তাকে রক্ষা করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। 'নেহরু দর্শন' নামে যে মতবাদ খাড়া করা হয়েছে তা হচ্ছে মূলতঃ ভারতের পুঁজিপতি আর জমিদারদের "সত্যিকারের 'আবিষ্কার'।" চীনের দৃষ্টিতে ভারতের সরকার তথা নেহরু ভারতকে 'এশিয়ার কেন্দ্র' হিসাবে তৈরী করার এক সাম্রাজ্যবাদী ধারণার প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং তারই পরোক্ষ ফল ভারতের এই আগ্রাসন।[১] ভারত সম্পর্কে চীনের এই নীতি পরিবর্তন ভারতের কমিউনিস্টদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ালো ও বিভ্রান্তির সূত্র ধরে এলো নেতৃত্বের চরিত্র সম্পর্কে অবিশ্বাস এবং ফলতঃ গোষ্ঠীবিন্যাস। যুদ্ধের অজুহাতে 'ভারত রক্ষা আইন' চালু ও প্রয়োগ করা শুরু হল। গড়া হল "জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল"। উগ্র জাতীয়তাবাদের জোয়ারে দেশ তখন আপ্লুত। অন্যদিকে অনেক কমিউনিস্টদের পক্ষে সেদিন বিশ্বাস করা কঠিন হয়েছিল "এশিয়ার বুকে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্গাতা" চীনের কমিউনিস্ট সরকার ভারতের মত একটি জোট-

নিরপেক্ষ দেশের উপর হামলা করতে পারে কিভাবে। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পটভূমিকায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বামপন্থার দিকে ঝোঁকের প্রাবল্য ছিল। মীরাটে ডাকা ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের সদস্যরা একমত হয়ে চীনের পক্ষে দাঁড়ান। এই সময়েই পার্টির অন্যতম রাজ্যনেতা বিশ্বনাথ মুখার্জী নদীয়া জেলার আড়ংঘাটায় এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতায় বলেন যে ভারত সরকারের দাবী অযৌক্তিক। কংগ্রেসীরা এই জনসভা আক্রমণ করলে উনি পার্টি ক্যাডারদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহস জোগান। "সেদিক থেকে বলতে গেলে রাজ্যস্তরের নেতাদের মধ্যে উনিই প্রথম, যিনি সরাসরি, দেরিতে হলেও, মার খাওয়া কমরেডদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, যদিও তিনি চীনপন্থী বলে চিহ্নিত নন।"[২]

এই বিভ্রান্তি আরও বাড়ল পার্টির সর্বভারতীয় চেয়ারম্যান এস.এ. ডাঙ্গে যখন প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন 'চীন সাম্রাজ্যবাদ জনিত' আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে ভারত আক্রমণ করেছেন এবং এই চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয় কমিউনিস্টদের দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য পালনের আহ্বান জানালেন। কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় কাউন্সিল সভায় ই.এম.এস নাম্বুদিরিপাদ "আলাপ আলোচনার মাধ্যমে" এই সীমান্ত বিরোধ মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলাতে তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হয় এই যুক্তিতে যে, "জনগণ আমাদের কথা শুনবে না।"[৩] পার্টির এক অংশকে "চীনাপন্থী" বলে চিহ্নিত করা হল। নভেম্বর থেকে এই "চীনাপন্থী"-দের গ্রেপ্তার করা শুরু হল এবং পার্টি তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করল না। এই চীনাপন্থীরা জাতীয় পরিষদে সংখ্যালঘু ছিলেন (মাত্র ত্রিশ জন)। নেতৃস্থানীয় পার্টির সদস্যদের বেশীরভাগ অংশকে ভারতরক্ষা আইনে বিনাবিচারে জেলে আটকে রাখা হল, এমনকি জেলা ও আঞ্চলিক স্তরের নেতা-কর্মীদেরও মামলায় অভিযুক্ত করে বিচারাধীন বন্দীরূপে জামিন না দিয়ে আটক রাখা হল। ৭-ই নভেম্বর সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা বি.টি রণদিভে-কে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে কারাবন্দী করা হয়। পরদিন অর্থাৎ ৮-ই নভেম্বর শান্তিপুরের প্রাক্তন বিধায়ক, আর.সি.পি.আই নেতা কানাই পালকে বিচারাধীন বন্দীরূপে গ্রেপ্তার করা হল। ১০ই নভেম্বর রাণাঘাটের হরিনারায়ণ অধিকারী (পার্টির নদীয়া জেলা পরিষদ ও কার্যকরী কমিটির সদস্য, কমিউনিস্ট হওয়ার অপরাধে যাকে এই সময়ে কোমরে দড়ি পরিয়ে শহরের রাস্তায় ঘোরানো হয়েছিল), রাণাঘাটের লোকাল কমিটির সদস্য সুভাষ বসু, রাণাঘাট রূপশ্রী পল্লী শাখা কমিটির সদস্য অহি চ্যাটার্জীকে বিচারাধীন বন্দী হিসাবে আটক করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, যে বাষট্টির সংঘর্ষের সঠিক চরিত্র বিশ্লেষণ করতে রাণাঘাটের রূপশ্রী ক্যাম্পের মেঘনা ব্লকে সুভাষ বসুর সভাপতিত্বে একটা মিটিং হয়। প্রকাশ্য সম্মেলনে ভারতকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করায় সুভাষ বসু গ্রেপ্তার হয়ে যান। চাকদহতে এই পর্বে গ্রেপ্তার হন সরোজ দত্ত, অনিল মিত্র, শিবানী কিংকর চৌবে (চাকদহ আঞ্চলিক কমিটিতে উনিশ জন পার্টি সদস্য ছিলেন) এই এলাকার সৌরেন পাল ও কিরণ শংকর রায় আণ্ডারগ্রাউণ্ডে গেলেন। জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অনুগামী পার্টির নদীয়া জেলা পরিষদের সম্পাদক সুশীল

চ্যাটার্জীকে ভুল করে আটক করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ছয় জন সদস্য, জাতীয় পরিষদের কুড়ি জন সদস্য গ্রেপ্তার হন। দেশ জুড়ে প্রায় নয় শতাধিক কমিউনিস্ট কর্মীকে জেলে পোরা হল। পরিস্থিতি দাঁড়াল এই যে, পার্টির এক অংশ কারাবন্দী, এক অংশের আত্মগোপন, এবং ঐ একই পার্টির এক বড় অংশ "জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে" অর্থ সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ মূলতঃ কেন্দ্রীভূত হল কারাভ্যন্তরে। "দমদম কারাগারে প্রায় ১৩ মাস আটক ছিলাম সেবারে। এই ১৩টি মাস পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন কমিউনিস্ট আন্দোলনের রথী-মহারথী নেতাদের সঙ্গে একত্রে থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তা একদিকে যেমন কুৎসিত ও জঘন্য, অন্যদিকে তীব্র জটিলতা ও অন্ধকারের মধ্যেও আশার আলোয় উদ্ভাসিত।"...

"তখনও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়নি। ...দেখলাম বিশেষ কয়েকজন আটক কমরেডদের গায়ে 'ডাঙ্গেপন্থী' স্ট্যাম্প লাগানো হল। নির্দেশ এলো—ওঁদের সাথে মেলামেশা, কথা বলা পড়াশুনা, খাওয়া দাওয়া কিছুই চলবে না। অথচ ওঁরা প্রায় সবাই তখন পার্টির রাজ্য পরিষদের সদস্য।"

"অথচ এদিকে আমাদের যাদের গায়ে 'চীনাপন্থী' স্ট্যাম্প লাগানো হয়েছিল, তাদের মধ্যেও রাজনৈতিক প্রশ্ন ও সমস্যাবলী নিয়ে তিন মাসের মধ্যে কোনো আলোচনা হল না। শুধু খাওয়া দাওয়া খেলা আর গালগল্প চলল।"[৪]

দমদম কারাগারে পার্টির রাজ্য পরিষদের মোট ৪২ জন সদস্য ও ১৪ জন কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। '৬৩-র ফেব্রুয়ারীতে জেলে ৪২ জন রাজ্য পরিষদের সভা ডাকা হয়। দীর্ঘ ১৩ মাসের মধ্যে এটাই প্রথম ও শেষ সভা। এই সভার তিনটি মত হয় ঃ

(ক) প্রমোদ দাশগুপ্তদের মত ঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বাস্তবত দুভাগ হয়ে গেছে,

(খ) অন্যদের মত ঃ পার্টি ভাঙার কাজটা জেলখানায় বসে হয় না এবং

(গ) গোপাল আচার্যের একক মত ঃ পার্টি দুভাগ হবার কথা ভাবাই যায় না।

সিদ্ধান্ত হল ঃ বাইরে থেকে কমরেডদের একটি দলিল এসেছে,[৫] তার ওপর আলোচনা চলবে ও পরে আবার সভা করে জেলের কমরেডদের মতামত বাইরে পাঠানো হবে। পরে আর কোনো সভা হয়নি এবং যা মতামত পাঠানো হয় তা সবার মতামত নয়, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙারদের নেতৃত্বে ২১ জন রাজ্য পরিষদের সদস্যদের মতামত। কার্যকরী কমিটির ১৪ জন বন্দী সদস্যের মধ্যেও 'কলম্বো প্রস্তাব' নিয়ে বিভাজন দেখা গেল। হরেকৃষ্ণ কোঙার, মুজফ্‌ফর আহমেদ, রতনলাল ব্রাহ্মণ প্রমুখ সাতজন প্রমোদ দাশগুপ্তের পক্ষে এবং নিরঞ্জন সেন, সরোজ মুখার্জী, মনোরঞ্জন রায়, মহম্মদ ইসমাইল, অমৃতেন্দু মুখার্জী প্রমুখ, জ্যোতি বসু—যিনি তখনও 'মধ্যপন্থী' বলে চিহ্নিত ছিলেন তাঁর পক্ষে। এটা ঘটনা যে, বাষট্টির ভারত-চীন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত যে ঝাঁকুনি খেয়েছিল তাতে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল ব্যক্তির প্রশ্ন, চক্রের প্রশ্ন নীতিকে

উপলক্ষ্য করে। দমদম জেলে রাজনৈতিক মত-পার্থক্যের এই তিক্ততা বালখিল্য সুলভ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। এমনকি প্রমোদ দাশগুপ্ত ও জ্যোতি বসুর পারস্পরিক সম্পর্ক "গান্ধী-জিন্নার ঐক্যের" সঙ্গে তুলনীয় হয়।[৬]

নীচুতলার কর্মীদের একাংশ আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন পার্টির মধ্যে সঠিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে, অন্যদিকে নেতৃস্থানীয় আরেক দল সেই সময় যেভাবে চিহ্নিত হতে চেয়েছিলেন তা হল "চীনের পক্ষে, ভাঙনের পক্ষে"।

এই সময়েই কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সদস্যরা, যাঁরা চাইছিলেন একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে ব্যাপক কমরেডদের ঐক্যবদ্ধ করতে, তাঁরা অধ্যাপক মোহিত মৈত্রকে সামনে রেখে গড়ে তোলেন 'বন্দীমুক্তি ও গণআন্দোলন প্রস্তুতি কমিটি'। তাঁরই সম্পাদনায় হাওড়ার তারাপদ মিত্রর "হাওড়া-হিতৈষী" পত্রিকার নাম 'দেশহিতৈষী"-তে রূপান্তরিত করে 'নিরপেক্ষ পরিষদ' নামে ১৭২ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত হয়। এই নতুন ঠিকানাই কার্যতঃ বিকল্প পার্টি অফিস হয়ে ওঠে। এখানেই সুশীতল রায়চৌধুরী গড়ে তোলেন তাঁর ইনস্টিটিউট অফ মার্কসিজম-লেনিনিজম। তখনও পর্যন্ত মধ্যপন্থার বিরুদ্ধে এই সক্রিয় কাজকর্ম, জেলে থাকা নামীদামী নেতাদের অনুপস্থিতিতেই—যাঁরা চালাচ্ছিলেন, তাঁরা ছিলেন সাধারণ স্তরের কমিউনিস্ট কর্মী। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল অনেকটা এইরকম যে, মতাদর্শগত বিতর্কটা নেতারা শিকেয় তুলে রাখতে চাইলেও সাধারণ কর্মীরা সেটাকে ধরেই সামনে এগোতে চাইছিলেন।

একথা জানা আছে যে দমদম জেলে যাঁরা মনে করতেন যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে চীন যোল আনা সঠিক পথে চলছে এবং সোভিয়েত শোধনবাদী নেতৃত্ব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক হয়ে গেছে তারাই মূলতঃ ১৯৬৪-র মাঝামাঝি অন্ধ্র প্রদেশের তেনালিতে জাতীয় পরিষদ-এর ৩২ জন সদস্যকে নিয়ে পৃথক কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করেন। সেই তেনালি কনভেনশনে মার্কস থেকে স্ট্যালিনের ফটো রাখা হয়—কিন্তু মাও সে তুং বাদ যান। আরও জিজ্ঞাসা তৈরী হয় যখন ৩২ জন জাতীয় পরিষদের সদস্য ১৯৬৪ সালের ১৪ই এপ্রিল একটি প্রকাশ্য বিবৃতিতে—"অস্বীকার করুন কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের তাঁদের (ডাঙ্গেপন্থীদের) সংস্কারবাদী রাজনৈতিক লাইনকে..." ঘোষণা করার পরও তেনালী কনভেনশনের কাজ শুরু হয় ভারতের প্রধান বুর্জোয়া দলের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে দিয়ে।[৭] সবচেয়ে বড়ো কথা আলোচ্য সূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই কনভেনশনে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতকে বাদ দেওয়া হয়। এইরকম বহু স্ববিরোধিতা নিয়ে এবং গোষ্ঠীকোন্দলের ঘোলা জলকে পরিশ্রুত না করেই ১৯৬৪ সালের ২৪শে অক্টোবর থেকে ৩১শে অক্টোবর সপ্তম পার্টি কংগ্রেস আহূত হয়। কিন্তু এই কংগ্রেসের প্রাক্কালে মুজফ্‌ফর আহমেদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখ 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের ভারতরক্ষা আইনে আবার বিনা বিচারে জেলে পোরা হল। বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য পশ্চিমবাংলায় 'মধ্যপন্থীদের'

সহ মধ্যপন্থীদের আবার বাদ দেওয়া হল। যাই হোক ১৯৬৪ সালের ৩১শে অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগরাজ হলে এই বহুল প্রচারিত কলকাতা সপ্তম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ৬ই নভেম্বর শুক্রবারের *'দেশহিতৈষী'* পত্রিকায় লেখা হল—"শুধু সত্যকার দৃষ্টিভঙ্গী হলেই হয় না, সেই দৃষ্টির ভিত্তিতে কর্মসূচী রচনা করলেও সমাধা হয় না, তার জন্য চাই সত্যকার বিপ্লবী পার্টি, পার্টির কাঠামো অর্থাৎ পার্টি সংগঠন। তাই বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা এম. বাসবপুন্নায়া সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেছেন যে, পুরাতন সাংগঠনিক রিপোর্টের ছিদ্রপথে সংশোধনবাদ ঢুকে পড়তে পেরেছিল, এবার সেই ছিদ্রপথ বন্ধ করা হবে, পার্টি সংগঠনের ধারাগুলি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে এমনভাবে সংস্থাপিত হবে, যাতে ভবিষ্যতে আর সংশোধনবাদ মাথা চাড়া দিতে না পারে।"[৮]

এই সত্যকার বিপ্লবী পার্টির চরিত্র সম্পর্কে কোনো সংশয়ের অবকাশ যাতে না থাকে, তার জন্য একটু পরেই বলা হচ্ছে—"দ্বিতীয়তঃ এই কংগ্রেস সম্পর্কে সংশোধনবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলরা নানারূপ কথা রটাচ্ছে যে, কমিউনিস্টরা সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি করছে, ১৯৪৮ সালের দিনগুলিতে ফিরে যাচ্ছে। কমঃ বাসবপুন্নায়া সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেছেন যে এই ধরনের প্রচার হচ্ছে আজগুবি। স্বাধীনতার পরবর্তী ঘটনা হল কংগ্রেস সকল ক্ষমতা আত্মসাৎ করে বসে আছে, বিরোধীদলগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে এবং শক্তিশালী বিপ্লবী গণতান্ত্রিক বিরোধী দল গঠনের অধিকার ভারতের জনগণকে দিতে অস্বীকার করছে। ভারতীয় পরিস্থিতি যখন এই স্তরে তখন মাত্র শতকরা দশভাগ নির্বাচকের সমর্থন নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র, এই স্তরে আমাদের লক্ষ্য হল, প্রধান বিরোধীদল হিসাবে আমাদের প্রতি জনগণের সমর্থন আদায় করা।"[৯] অর্থাৎ, নিজেদের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃত প্রতিনিধি ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন গোষ্ঠী প্রথম থেকেই সশস্ত্র সংগ্রামের রাস্তা এড়িয়ে চলাই শ্রেয় মনে করেছেন। এই নতুন গোষ্ঠীর নেতৃত্ব যে কাদের হাতে গিয়ে পড়ল তা স্পষ্ট হয় *"পত্রিকা পরিক্রমা"'য় 'সিদ্ধার্থ'*-এর লেখা কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে— "...কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, কিছু কিছু বামপন্থী কমিউনিস্ট নেতা তেলেঙ্গানা আমলে প্রচলিত কৃষক-গেরিলা কার্যকলাপ সম্পর্কিত মাওপন্থী তত্ত্বে ফিরে যেতে চান, সম্প্রতি উড়িষ্যায় সেরূপ হচ্ছে, ব্যাপকভাবে যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিকল্পনা কার্যকরী করার উদ্দেশ্য চলে থাকে, তাহলে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে রাজ্য সরকার ন্যায্য কাজই করেছেন।"[১০] নতুন পার্টি গঠনের প্রেক্ষিত ও রূপকারদের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে যেটুকু বা সংশয় ছিল, তাও অচিরেই কেটে গেল ১৯৬৬ সালের পর। ১৯৬৭ সালের আসন্ন সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রয়োজন হয়ে পড়ল নতুন পার্টিটির সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায়ের। নতুন গোষ্ঠীবিন্যাসের আনুষ্ঠানিক নাম হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। এইভাবে কোনরকম মতাদর্শগত দলিল ছাড়াই একটি নতুন পার্টির জন্ম হল, যাতে কেবল তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য আদায় করার জন্য সব রঙের কমিউনিস্ট কর্মীদেরই জমায়েত করা হল।

তেনালী কনভেনশন থেকেই একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির উপরতলার দ্বন্দ্ব সাধারণ কমিউনিস্টদের যুযুধান দুটি শিবিরে চিহ্নিত করে দিলেও মাঝখানে তৃতীয় একটি প্রচ্ছন্ন শিবির তৈরী হচ্ছিল। এই তৃতীয় শিবিরে ছিলেন সেই সমস্ত কর্মী এবং জেলান্তরের নেতা ও কর্মীরা, যাঁরা উপরিউক্ত দুই দল সম্পর্কেই সন্দিহান ছিলেন। তাঁরা নিজেরা যা বোঝেন তারই ভিত্তিতে সংগঠনগুলোকে পুনর্গঠিত করে বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। সরাসরি পার্টির নেতৃত্বের বিরোধিতা ও বিষোদ্গারের ভয়ে এই কর্মীরা অনেক জায়গাতেই সমমতাবলম্বীদের খুঁজে বার করে ছোট ছোট দল বা গ্রুপ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তাঁদের কোন নিজস্ব কেন্দ্র না থাকাতে এই দলগুলোই তাঁদের নীতি নির্ধারক হয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় এই দল বিভিন্ন নামে—কিন্তু উদ্দেশ্যগত ঐক্য নিয়ে গড়ে ওঠে। নদীয়াতে চৌষট্টি-উত্তর পর্বে এই রকম 'সূর্য সেন' গোষ্ঠীর কিছু প্রভাব—সামান্য ও বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছিল। (দ্রষ্টব্য ঃ এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ প্রদীপ বসুর 'নকশালবাড়ির পূর্বক্ষণ' বইতে আছে, পৃ. ৫১-৫২)।

যুক্ত পার্টি ভাঙনের সময় সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন ছাত্র-যুবকরা এবং গ্রামাঞ্চলে আন্দোলনরত কৃষক ও তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রামী কর্মীরা স্বাভাবিকভাবেই সি.পি.আই (এম)-এর সঙ্গে মানসিক সাযুজ্য খুঁজে পায়। এই কারণে নতুনভাবে সংগঠিত সি.পি.আই (এম)-এর গণভিত্তি, সি.পি.আই থেকে—নদীয়া জেলার ক্ষেত্রে বেশী হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ কর্মীরা নতুন পার্টির দিকে পূর্বপ্রত্যাশামত ঝুঁকলেও জেলা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কিন্তু এই অঙ্কটা ঠিক মেলেনি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শুরুর প্রথম যুগ থেকে নেতৃত্বের স্তরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পছন্দ অপছন্দ, ঝগড়া-কোন্দল, রেষারেষি, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব সবই তেষট্টি-চৌষট্টির পার্টি বিভাজনের সময় প্রকাশ্যে আসে। সর্বভারতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও যেমন সত্যি, তেমনি আঞ্চলিক স্তরেও কমিউনিস্ট নেতাদের ব্যক্তিজীবন, পার্টিতে তাঁদের অবস্থানগত মর্যাদা (hierarchical status) ইত্যাদি অনেক কিছু বেশী গুরুত্ব পেয়েছিল ভাঙনের প্রকৃত উৎস, তার তাৎপর্য—ইত্যাদির চেয়ে। নদীয়ার ক্ষেত্রে যেমন, চৌষট্টির আগেই ব্যক্তিবিশেষ চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন, 'মধ্যপন্থী' বা 'সংগ্রামী' রূপে। কিন্তু চেনা ছককে নাকচ করে দিয়ে তাঁরা শিবির বদলালেন, বা বদলালেন না, অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই এবং তার কারণ হিসাবে চিহ্নিত হল স্রেফ ঈর্ষা বা ব্যক্তিত্বের সংঘাত। এই সংঘাত নদীয়ায় সবচেয়ে বেশী প্রতিফলিত হয়েছিল 'মধ্যপন্থী' নেতা অমৃতেন্দু মুখার্জী ও 'সংগ্রামী' নেতা সুশীল চ্যাটার্জীর পারস্পরিক অবস্থানের মধ্যে দিয়ে। পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা ও কর্মতৎপরতা এবং গণ আন্দোলনের প্রশ্নে সাধারণ কর্মী ও সভ্যদের কাছে সুশীল চ্যাটার্জী ছিলেন অনেক বেশী সংগ্রামী। ১৯৪৮ সালে পার্টি যখন বেআইনী ঘোষিত হয় তখন তিনি দার্জিলিং পাহাড়ে আত্মগোপন করেন এবং সেখানে পার্টি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিখ্যাত পাহাড়ী নেতা রতনলাল ব্রাহ্মণকে পার্টিতে যুক্ত করার কাজে তাঁর অবদান ছিল। ১৯৬৪ সালে নদীয়া জেলা পার্টি যখন বিভক্ত হয় তখন আশা করা গিয়েছিল যে

তিনি বামপন্থী 'সংগ্রামী' অংশে থাকবেন।[১১] পার্টিভাগ আদর্শগত ভাবে যতটা না হয়েছে তার থেকে বেশী হয়েছে গ্রুপনেতারা কে কোথায় আছেন তার বিচারে। কৃষ্ণনগরের প্রাক্তন কমিউনিস্ট বিধায়ক শ্রী সাধন চট্টোপাধ্যায় এই দুর্বলতাকে স্বীকার করে নিয়ে কবুল করেছেন যে, বামপন্থী আন্দোলনকে ব্যক্তি-ইমেজ-ঘটিত সংঘাত যথেষ্ট দুর্বল করেছিল। তাঁর মতে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বহু সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত সংগ্রামীরা কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যোগদান করেন। আন্দামানে দ্বীপান্তরিত অবস্থায় সন্ত্রাসবাদীদের একটি অংশ 'কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন' গঠন করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা অনুশীলন করেছিলেন। এই কনসোলিডেশনের অনেকেই বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ গ্রহণ করেন। শুধু সভ্যপদ গ্রহণ নয়, অনেকেই নেতৃত্বের পদেও আসীন হন। নদীয়ায় কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত এরকম ব্যক্তি ও নেতার সংখ্যা একাধিক।[১২] পরবর্তীকালে যে তাঁরা ব্যক্তি-নির্দিষ্ট-ক্রিয়াকলাপ-ভিত্তিক সংগঠনের কর্তৃত্ববাদী রাজনীতির অভ্যাস থেকে মুক্ত কমিউনিজমের গণতান্ত্রিক আবহাওয়াকে পুরোপুরি স্বীকার করতে পেরেছিলেন, তা কিন্তু প্রমাণিত হয়নি। অন্যদিকে, নদীয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে শহুরে ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা, কৃষক-সভার মেঠো, সহজ সরল নেতাকে, রীতিমতো অঙ্ক কষে নির্বাচনে হারাবার চেষ্টা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাতষট্টির নির্বাচনে, সি.পি.আই (এম) প্রার্থী কৃষক সভা নেতা কানাই কুণ্ডুর বিপক্ষে দেবী বসুর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, যা পরবর্তী আলোচনায় বিশদে এসেছে।

নদীয়া জেলায় পার্টি ভাঙ্গনের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। এই সময়ে নবদ্বীপের সুরেশ রায় জেলা সম্পাদক ছিলেন। চৌষট্টিতেই জেলান্তরের কৃষ্ণনগরে পার্টি সম্মেলনে জ্যোতি বসু আসেন। এই সম্মেলনে সুরেশ রায়, সুশীল চ্যাটার্জী ও অমৃতেন্দু মুখার্জীর মতাদর্শগত অবস্থান নিয়ে যথেষ্ট আলোড়ন হয়। চৌষট্টির পরপর জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব অমৃতেন্দু মুখার্জীর হাতে চলে আসে। পার্টি ভাঙ্গনের পর নদীয়ায় সি.পি.আই-তে যাঁরা রয়ে গেলেন, তাঁরা হলেন সুশীল চ্যাটার্জী. সুধীর শিকদার, পূর্ণেন্দু সরকার (আড়ংঘাটা), নিতাইপদ সরকার (রাণাঘাট), শক্তি বিশ্বাস (চাকদহ), বিজয় বসু, দেবীপদ ভট্টাচার্য, রঞ্জন চ্যাটার্জী (কৃষ্ণনগর), শঙ্করীচরণ চট্টোপাধ্যায়, ভৈরবশরণ চট্টোপাধ্যায়, মণি রায় (নবদ্বীপ) প্রমুখ, (কালক্রমে শংকরী চট্টোপাধ্যায় প্রায় এককভাবে নবদ্বীপে সি.পি.আই-কে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু সি.পি.আই-তে তাঁর থেকে যাওয়াও পার্টি আদর্শের চেয়েও ব্যক্তিগত কারণেই মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল)। এই বিভাজনের পরবর্তীকালে নদীয়া জেলায় সি.পি.আই-এর কাজের বৃত্ত ক্রমেই সংকীর্ণতর হতে থাকে। বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের 'লেজুড়বৃত্তি' করাই এর পরিচিতি হয়ে দাঁড়ায়।

নদীয়া জেলার বিভিন্ন জায়গায়—বিশেষতঃ কৃষ্ণনগরের স্থানীয় রাজনীতিগত একটা বিশেষত্ব অবাক করে দেওয়ার মত। পার্টি-আনুগত্য নির্বিশেষে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসী ও কমিউনিস্টদের মধ্যে রাজনীতির বাইরের সম্পর্ক যথেষ্ট হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল। চিরকাল কৃষ্ণনগর

শহরের নাগরিকদের রাজনৈতিক মর্জি-র পরিমাপ করা শক্ত, যেমন বিধানসভার ভোটে যে-ই জিতুক, শহর মিউনিসিপ্যালিটি চিরকাল রাইটার্স বিল্ডিংস বিরোধীদের নিয়ে গঠিত হত, সে বিধান রায়ের আমল বা হালের আমলেই হোক। সে সময় মিউনিসিপ্যালিটির ইউনিয়নে নেতৃত্ব দিতেন পরবর্তীকালের নকশালবাড়ী আন্দোলনের জেলাস্তরের নেতা 'নাদুদা' (শোভেন চ্যাটার্জী)—তৎকালীন সি.পি.আই.এম কর্মী (যিনি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি থেকেই ছিলেন)।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে নদীয়ায় অন্ততঃ ছেষট্টির আগে অব্দি সাংগঠনিক স্তরের হিসাবে কমিউনিস্টরা খুব একটা প্রভাবশালী জায়গায় ছিল না। আগেই বলা হয়েছে নদীয়ায় কংগ্রেসীরা এক সময় একচেটিয়া দাপট দেখিয়েছে (বিশেষতঃ তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন জীবিত ছিলেন), এবং বামপন্থীদের মধ্যে আর.সি.পি.আই-ই কিছুটা কাজকর্ম করার চিহ্ন রাখত।[১৩] বাষট্টির চীন-ভারত যুদ্ধ সব জায়গার মতো নদীয়াতেও ব্যাপক দেশপ্রেমের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল। নবদ্বীপ প্রগতি পরিষদের[১৪] সদস্য এবং একদা ছাত্র-ফেডারেশন কর্মী মাধবেন্দ্র ভট্টাচার্যকেও সে সময় দেশপ্রেমের চাপ সহ্য করতে ছাত্র-সংসদের সাহায্য তহবিলে এক টাকার কুপন কিনতে হয়েছিল। নবদ্বীপ কলেজ চিরকালই ছাত্র পরিষদের প্রভাবাধীন, মধ্যষাটের উত্তাল দু-একটা বছর বাদ দিয়ে। ১৯৬৩ সালের নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র-ছাত্রী-সংসদ নির্বাচনে এই রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ইঙ্গিত মেলে। ছাত্র-সংসদে ছাত্র-ফেডারেশনের স্থান নিশ্চিহ্ন করে ছাত্র-পরিষদ মোট ১৬টি আসনের মধ্যে ১৬টিই লাভ করে। সংবাদে লেখা হয় "সর্বজনধিকৃত কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের রায়।"[১৫] তবে ঠিক এর পাশাপাশিই উল্লেখ করার দাবি রাখে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদের রাজনৈতিক অবস্থান। সে সময় কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য ছিলেন করিমপুরের ছেলে, বর্তমানে সি.পি.আই (এম) এর রাজ্যসম্পাদক অনিল বিশ্বাস। বাষট্টির চীন-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে অন্ততঃ নদীয়া জেলার কতকাংশ কমিউনিস্ট কর্মী যে ভারত সরকারের বক্তব্যকেই স্বীকার করে নিয়েছিল তার দৃষ্টান্ত রাখা আছে ১৯৬৩ সালের *কৃষ্ণনগর কলেজ পত্রিকায়* যেখানে অনিল বিশ্বাস ও স্বপন দত্ত যৌথভাবে চীন-ভারত যুদ্ধের ওপর একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখার উদ্যোগ নেন (পরিশিষ্ট-১দ্রষ্টব্য)। এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে '৬২ সালে অনিল বিশ্বাস গ্রেপ্তারও হন এবং জেল থেকেই প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা দেন। অপ্রাসঙ্গিক হয়ত হবে না এটা উল্লেখে যে, ১৯৬৩ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ ছাত্র-সংসদই সর্বপ্রথম প্রস্তাব নেয়—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাসে লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' পড়ানোর। একই সঙ্গে দাবি ওঠে, প্রশাসনিক বিষয় থেকে 'ধর্ম'র পরিচয় বাদ দেবার ও গান্ধীর অর্থনৈতিক নীতিকে সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত করার। এটা বলার উদ্দেশ্য একটাই যে, কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্ররা সময়ের সঙ্গে চলার চেষ্টা করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে মধ্য-ষাটের পর থেকে তাঁদের এই রাজনৈতিক সক্রিয়তার ভাঁটা পড়ে। যে সময় নদীয়ার ব্যাপক যুব-ছাত্ররা দলে দলে নকশালপন্থী আন্দোলনে অংশ নিচ্ছিল, কৃষ্ণনগরে তার সবচেয়ে

বেপরোয়া বহিঃপ্রকাশ হয়েছে—সেই সময় কৃষ্ণনগর কলেজ প্রায় দর্শকের মতো রুদ্ধশ্বাস নৈঃশব্দে ইতিহাসের এই উত্থানপতন দেখেছে কিন্তু সাড়া দেয়নি। মফঃস্বলের মেধাবী ছাত্রদের কেরিয়ার মনস্কতাই এই ঔদাসীন্যের জন্য দায়ী—এটাই অনেকের ব্যাখ্যা।

ফিরে যাওয়া যাক নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে ভাঙনের সময় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীরা কে কোথায় দাঁড়িয়েছিলেন, তার হিসাবে। নবদ্বীপেও পার্টি ভাঙনের শিকার হয়েছে বহু পুরোনো কমিউনিস্টদের আত্মসম্মান। অমিয় রায় যাঁরা হাত ধরে নবদ্বীপের বহু লোক বামপন্থী রাজনীতির শিক্ষা নেন, তাঁকে বাষট্টির পর পর 'ডাঙ্গেপন্থী' হিসাবে চিহ্নিত করার পরিকল্পিত চেষ্টা চলে, বিশেষতঃ সুশীল চ্যাটার্জী ওঁর সঙ্গে দেখা করার পর। এটা ঠিকই যে প্রথমদিকে বাষট্টির যুদ্ধের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর সংশয় ছিল। পরে ব্যক্তিগতস্তরে আলোচনা ও অনুরোধ করায়—রবি (রাঘবেন্দ্র) ভট্টাচার্যের দ্বারা মূলতঃ—অমিয় রায় সি.পি.এম শিবির-এ আসেন। তবে অমিয় রায়ের মতো পুরনো কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করতেন যে এই ইস্যুতে (চীন-ভারত সংঘর্ষ) পার্টি ভাঙলে প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনকেই দুর্বল করা হয়। চৌষট্টির ভাঙনে নবদ্বীপে যাঁরা সি.পি.এমে এলেন তাঁরা ছিলেন মূলতঃ দেবী বসু, বিশ্বনাথ মিত্র, সুবল সাহা, সুধীর নাথ, অনিল দাশ প্রমুখ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বাষট্টির বিধানসভা নির্বাচনে দেবী বসু কমিউনিস্ট প্রার্থী হিসাবে নবদ্বীপ কেন্দ্র থেকে জেতেন কংগ্রেস প্রার্থী ও প্রাক্তন বিধায়ক নিরঞ্জন মোদককে হারিয়ে। আরও উল্লেখ্য, যে, নদীয়া জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর নয়। পঞ্চাশের দশকে নবদ্বীপে সি.পি.আই-এর সদস্য সংখ্যা ছিল বত্রিশ। দেবী বসু চল্লিশের শেষাশেষি থেকেই শ্রমিক ইউনিয়ন ফ্রন্টে কাজ করতেন। বাস্তবিকই ছাত্র-ফ্রন্টের চেয়ে তাঁত, বিড়ি, রিক্সা, বেকারী, কাঁসা পিতল শিল্প ও রেল হকার্সদের নিয়ে কাজ করার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হত। উনষাটের খাদ্য আন্দোলনে কৃষ্ণনগরের মিছিলে কৃষ্ণনগর থেকে শ'খানেক, রাণাঘাট থেকে উদ্বাস্তুদের হাজার দুয়েক ও নবদ্বীপ থেকে বার' হাজার শ্রমিক অংশ নেয়।[১৩] ছাত্র-ফ্রন্ট থেকে নবদ্বীপে উল্লেখযোগ্য কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যে ছিলেন অনিল সিংহরায়, গোপীনাথ অধিকারী, অপূর্ব পোদ্দার, অচিন্ত্য পোদ্দার প্রমুখ। পঞ্চাশের দশকে নদীয়ার গণনাট্য আন্দোলনে নবদ্বীপ আই.পি.টি-এ খুবই সক্রিয় ছিল। নবদ্বীপের প্রগতি পরিষদ, কৃষ্ণনগরে দিলীপ বাগচী ও শান্তিপুর গণনাট্য সংঘের অজয় ভট্টাচার্য, কানাই বঙ্গ—এই ত্রিধারা নদীয়া জেলায় পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে উজ্জীবিত রেখেছিল।

নবদ্বীপের ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে যদিও তখন প্রায় একমাত্র কাজ ছিল মজুরীবৃদ্ধির আন্দোলনে শ্রমিকদের সামিল করানো ও মিটিং-মিছিল করা। তবে শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বনাথ মিত্র নিজে বিড়ি শ্রমিক ছিলেন, রিক্সাচালক হিমাংশু বসু, মাঝিদের ইউনিয়নের লছমন সিং—এঁরাও ট্রেড ইউনিয়নে নেতৃত্বে ছিলেন। মিউনিসিপ্যাল এলাকায় কংগ্রেসের প্রভাব বেশী ছিল, কিন্তু শহরের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে যেমন দক্ষিণের ফুলবাগান, তেঘড়িপাড়া ও গ্রামাঞ্চলে, যেমন চরস্বরূপগঞ্জ,

বামনপুকুর প্রভৃতি এলাকায় কমিউনিস্ট প্রভাব বেশী ছিল। এখানে সবচেয়ে জঙ্গী শ্রমিক ইউনিয়ন ছিল তাঁত শ্রমিকদের—মূলতঃ বর্ধমানের পূর্বস্থলী, গঙ্গার এপারে মুকুন্দপুর, গৌরনগর এলাকায়। ষাটের দশকের শুরুতে নবদ্বীপে কমিউনিস্ট পার্টি সদস্য সংখ্যা ছিল ছাপান্ন জন। ১৯৬২-তে এখানে তাঁতশিল্পে মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে ঊনত্রিশ দিন ব্যাপী টানা এক ধর্মঘট চলে। তাঁত মালিকরা অধিকাংশই ছিল কংগ্রেসী। প্রায় দশ হাজার তাঁত শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়, পঞ্চাশ হাজার তাঁত বন্ধ থাকে, অর্ধ লক্ষের ওপর লোক বেকার হয়। সংবাদে বলা হয় 'তাঁতশিল্পের বিপর্যয়ে নবদ্বীপের আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন আজ বিপন্ন।'[১৭] শেষপর্যন্ত শ্রমিকরা জয়লাভ করে।

নবদ্বীপের আশপাশের গ্রামাঞ্চলে '৫৫ থেকেই তেভাগার দাবীতে কৃষক আন্দোলন চলেছিল—ব্রহ্মনগর, ঊষিতপুর, মুকুন্দপুর, মহেশগঞ্জ, তেওরখালি এইসব গ্রামে 'কৃষক সমিতি'-র নেতৃত্বে যে সব কমিউনিস্ট কর্মী কৃষকদের নিয়ে কাজ করছিলেন তাদের মধ্যে সবার আগে আসে কানাই কুণ্ডুর নাম, আর ছিলেন মুরারী গোস্বামী। এই কানাই কুণ্ডু ছিলেন অত্যন্ত সৎ, সহজ, সরল মেঠো নেতা। নাগরিক কেতা ও চমকের অভাব তাঁকে নবদ্বীপ শহরের একমেবাদ্বিতীয়ম্ দেবী বসুর সমকক্ষ হতে দেয়নি।

যে প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে ফেরা যাক। চৌষট্টির পার্টি ভাঙনের আগে থেকেই নবদ্বীপে আন্তঃপার্টি মতাদর্শগত বিতর্ক, চাঞ্চল্য ও পারস্পরিক অবস্থান নিয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে যায়। কমিউনিস্ট ছাত্র নেতাদের মধ্যে বিশেষ করে এসেছিল তখন চাঞ্চল্য কেননা দেবী বসু প্রথমে চীন নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। পরবর্তীতে তিনি বাম কমিউনিস্ট শিবিরে গেলেও প্রগতি পরিষদকে কেন্দ্র করে যে তরুণ বামপন্থীরা মাওবাদী রাজনীতির সমর্থক হয়ে উঠছিলেন, তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব আর অবিশ্বাস তৈরী হল। ১৯৬৪-৬৫-তে নদীয়াতে প্রায় একমাত্র তাত্ত্বিক মার্কসবাদ চর্চার কেন্দ্র হিসাবে প্রগতি পরিষদে 'আন্তঃপার্টি সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রাম কমিটি'র ব্যানারে না হলেও, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই রাজনৈতিক আলোচনা চলত। পার্টি ভাঙনে তত্ত্বগত বিরোধের ফাঁকি এঁরা ধরে ফেলেছিলেন। রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রথম থেকেই এই কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রবি (রাঘবেন্দ্র) ভট্টাচার্য চাকরীসূত্রে যাদবপুরে থাকতেন। সেই সূত্রেই কলকাতায় নিউ সিনেমার পাশে Marxist–Leninist Study Centre-এ অসিত সেন-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

নবদ্বীপের প্রগতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন চণ্ডী মুখোটী, ডঃ কৃষ্ণদাস মুখোটি, রায় গুরুদাস, অমল ভট্টাচার্য প্রমুখ। কিছু মার্কসীয় দর্শন সাহিত্য নিয়ে একটা ছোট লাইব্রেরী দিয়ে শুরু হয়। পঞ্চাশের দশকের প্রথমে আর এক দল পার্টি সমর্থক কালী মোদকের বাড়ীতে অনুরূপ আর একটি পাঠাগার তৈরী করে। কিন্তু কিছুদিন পরে এরা প্রগতি পরিষদের সঙ্গে মিশে যায়। প্রগতি পরিষদ গণমুখী পরিষদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করতেন। একজন তাঁত শ্রমিক নিত্যানন্দ পাল এই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে যুক্ত ছিলেন। বাকিরা মূলতঃ উচ্চবর্ণের ছিলেন।

এখানে একথা বলে রাখা ভাল যে মধ্য-শেষ ষাটের দশকে যখন নকশালবাড়ী রাজনীতির প্রভাব ছড়ায়, তখন প্রগতি পরিষদে ভাঙন হয় মূলতঃ ওই কারণেই। যাঁরা এই রাজনীতির বিরোধী ছিলেন তাঁরা সংখ্যালঘু হওয়াতে পরিষদ ছেড়ে বেরিয়ে যান যেমন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, অমল ভট্টাচার্য, রায় গুরুদাস প্রমুখ।

চৌষট্টি পরবর্তীতে নবদ্বীপের বামপন্থী রাজনীতির আবহাওয়া কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে 'প্রগতি পরিষদের' উদ্ধত মনোভাবকে ঘিরে। শোনা যায়, চৌষট্টি পার্টি বিভাজনের আগে, জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, অমৃতেন্দু মুখার্জী নবদ্বীপে জি.বি. মিটিং করতে এলে, স্টেশনে তাঁদের আপ্যায়ন করার বদলে, প্রমোদ সেনগুপ্তকে—যিনি এই একই ট্রেনে আসেন মিটিং-এ বিরোধী বক্তব্য রাখতে—তাঁকেই সবাই স্বাগত জানায়। এই ছিল চৌষট্টি-পঁয়ষট্টিতে নবদ্বীপের আবহাওয়া।

রাণাঘাটের গৌরকুণ্ডু যিনি ১৯৪৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন, তিনি চৌষট্টির পর সি.পি.এম-এ আসেন। সঙ্গে থাকেন হরিনারায়ণ অধিকারী, হীরেন দে, অচিন্ত্য মজুমদার, সুভাষ বসু, কালিদাস অধিকারী প্রমুখ।

চাকদহের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পার্টির প্রতি প্রথাগত আনুগত্যের কারণে চাকদহ আঞ্চলিক পরিষদের অধিকাংশ সদস্য সি.পি.আই-তে থেকে যান। বর্তমান চাকদহ থানা ও কল্যাণী থানার পুরো এলাকা নিয়েই ছিল চাকদহ আঞ্চলিক পরিষদ। চাকদহ, কল্যাণী ও শিমুরালি এলাকার প্রায় সব সদস্যই সি.পি.আই-তে থাকলেও গয়েশপুর-এর অধিকাংশ সদস্য সি.পি.আই (এম)-এ যোগ দেন। তবে সেই সময়ের ওই এলাকার এক পোড়-খাওয়া কর্মীর কথায়—"কিন্তু অনেকস্থানে পার্টিতে কোন সদস্য না থাকলেও, পার্টির কোনরূপ সংগঠন গড়ে না উঠলেও সি.পি.আই (এম)-এর সাধারণ আবেদন, কংগ্রেস-সরকার-বিরোধী আপসহীনতা সেই এলাকার সংগ্রামী মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে।"[১৮] যুক্ত পার্টির অধিকাংশ নেতা সি.পি.আই-এর সঙ্গে যুক্ত থাকায় পরবর্তীকালের গণআন্দোলনের জোয়ারে চলে আসে নতুন কর্মীরাই। তারাই সি.পি.আই (এম)-র সদস্যপদ লাভ করেন। চাকদহ আঞ্চলিক কমিটি তৈরী হয়। ১৯৬৪ সালের পর চাকদহে যে শাখা কমিটি গঠিত হয় নতুন দলের তাতে মাত্র একজন পুরানো সদস্য রামরঞ্জন দাস ছিলেন। বাকি সকলেই নতুন সদস্য। ১৯৬৫ সালের পর অন্য এক পুরানো সদস্য সৌরেন পাল সি.পি.আই (এম)-এ যোগ দেন। ১৯৬২ সালের পর তিনি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকাকালীন আসামে চলে যান। মাঝে মাঝে লুকিয়ে চাকদহে আসতেন। রামরঞ্জন দাস-ও যাদবপুর এলাকায় কর্মরত থেকে মাঝে মাঝে চাকদহে এসে পার্টির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতেন। তখন সি.পি.আই (এম)-এর কাজ প্রকাশ্যে ছিল না। পার্টির পত্রিকা বিক্রী এবং বিভিন্ন স্থানে গোপনে পোস্টার দেওয়া ও গ্রুপ মিটিং করার মধ্যেই কাজ প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৬৫ সাল নাগাদ অরুণ ভট্টাচার্য এসে পার্টির কাজে যুক্ত হন। তিনি দমদমে একটি কারখানায় কর্মরত থাকাকালীন পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চাকদহে এসে ইনি পুরোপুরি পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এছাড়াও

কালী বসু, সুনীল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখও উদ্যোগ নিয়ে ধীরে ধীরে চাকদহতে পার্টি গড়ে তুলবার কাজ করতে থাকেন। বস্তুতঃ ১৯৬৬ সালে চাকদহের পার্টির কাজ খোলাখুলি জনসাধারণের মধ্যে আসে এবং প্রকাশ্য জনসভা শুরু হয়। ছাত্র-যুবদের সংঘবদ্ধ করা, গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের নিয়ে কৃষক সমিতি গড়ে তোলা এবং বিড়ি শ্রমিকদের ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা হয়। গ্রামাঞ্চলে রাজার মাঠ, শ্রীনগর, শিলিন্দা, ধনিচা, কামালপুর, গোরাচাঁদতলা, বিষ্ণুপুর, গঙ্গাপ্রসাদপুর, পোড়াডাঙ্গা প্রভৃতি এলাকায় কৃষকদের সঙ্গে পার্টির সম্পর্ক তৈরী হয়।

শিমুরালী-মদনপুর এলাকায় কোন পুরানো পার্টিসদস্য সি.পি.আই (এম)-এ যোগ না দেওয়ায় ঐ এলাকায় সম্পূর্ণভাবে নতুন কর্মীদের নিয়ে সংগঠন তৈরী হয়। কল্যাণী শিল্পাঞ্চলে সংগঠন গড়ার দায়িত্ব নিয়ে সুভাষ বসু রাণাঘাট রূপশ্রীপল্লী থেকে কল্যাণী চলে আসেন। চাকদহ-কল্যাণী এলাকার বিভিন্ন স্থানে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন কালাচাঁদ চক্রবর্তী। ইনি পরাধীন ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও আন্দামানে দ্বীপান্তরে যান। চাকদহ-কল্যাণী এলাকায় নতুন করে সি.পি.আই(এম)-এর ভিত তৈরী করার কাজে কালাচাঁদ চক্রবর্তীর সঙ্গে ছিলেন গোপাল কর্মকার। অক্লান্ত পরিশ্রমী, নিরহঙ্কার, এবং অতি সাধারণ জীবনে অভ্যস্ত কালাচাঁদ চক্রবর্তী ছিলেন সকলের আদর্শস্থানীয়।

শান্তিপুর বরাবরই নদীয়া জেলার বামপন্থী আন্দোলনের প্রথম সারিতে অবস্থান করেছে, এবং শান্তিপুর শহরের ষাটের দশকের কমিউনিস্ট আন্দোলনের দর্পণে একটি মুখ বাকিদের চেয়ে একটু বেশী উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়ে। ব্যক্তিত্ব নির্ভর—আরও সোজা ভাষায় ক্যারিশমা নির্ভর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহ্যের একটা ছোট্ট সংস্করণ দেখা গিয়েছিল শান্তিপুরে। গোটা ষাটের দশক ও সত্তরের প্রথমার্ধ জুড়ে যে ব্যক্তি শান্তিপুর কমিউনিস্ট পার্টির (যে গ্রুপেরই হোক) একই সঙ্গে সম্পদ ও আপদ রূপে গণ্য হতেন, তিনি হলেন অজয় ভট্টাচার্য। অজয় ভট্টাচার্য ও কালাচাঁদ দালাল—এই দুই কমিউনিস্ট বিপ্লবী প্রায় দ্বৈতসত্তা হিসাবে গণ্য হতেন। এঁদের বিশেষত প্রথম জনকে প্রায় নায়কের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শান্তিপুরের বহু বিচক্ষণ দরজায় ঘুরে মনে হয়েছে এই নায়কত্ব আরোপই অজয় ভট্টাচার্যের রাজনৈতিক জীবনের কালস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যদিও আজও বহু লোক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই দুই ব্যক্তির অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

তবে সবাই নয়। শান্তিপুরে পুরোনো কমিউনিস্ট নেতা, অজয় ভট্টাচার্যের একদা 'কমরেড', প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারজীবী ধীরেন বসাক ১৯৬৩ সালে শান্তিপুরে এসেই 'অজয় ভট্টাচার্য' নামক এক প্রায়-প্রতিষ্ঠানের মুখোমুখি হয়ে পড়েন। স্বাধীনভাবে রাজনীতি করার তাগিদে তিনি শান্তিপুরে এসে ওকালতি করা শুরু করেন ও রাণাঘাট বার-এ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য হন।

ধীরেন বসাক এর মতে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি কখনই দীর্ঘ প্রসারী বিপ্লবী কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে আসেনি। দেখা গেছে যে পার্টি নেতৃত্ব প্রায় সবসময়েই সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন, বাক্‌সর্বস্ব ও বুদ্ধিজীবী-গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। যেভাবে এই পার্টি কোনদিনই সত্যিকারের

শ্রমজীবী মানুষের পার্টি হয়ে ওঠেনি—চিরকালই মধ্যবিত্ত উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থেকেছে, সেভাবেই শান্তিপুরেও কমিউনিস্ট আন্দোলন ব্যক্তির ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠতে চেয়েছে। এখানে এসে তিনি দেখেছেন শহর কমিটিতে অজয় ভট্টাচার্য 'লাইন' কাজ করছিল। শান্তিপুরে ষাটের শুরুতে লোকাল কমিটিতে সতেরো জন সদস্য ছিলেন। বিমল পাল যিনি সি.পি.আই-এর পুরোনো কর্মী ও শহর সম্পাদক ছিলেন—কার্যক্ষেত্রে প্রায় ছিলেন কোণঠাসা। নেতৃত্ব দিতেন অজয় ভট্টাচার্য যিনি পঞ্চাশের দশক থেকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ শান্তিপুর শাখার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। " '৬৩-তে শান্তিপুরে এসে দেখলাম অজয় ভট্টাচার্য ছাড়া এখানে পার্টির ওঠাবসা হয় না"—সুতরাং সরাসরি বিরোধিতার রাস্তায় না গিয়ে ধীরেন বসাক প্র্যাকটিস ছেড়ে পার্টির কৃষকফ্রন্টে সবসময়ের কর্মী হিসাবে জড়িয়ে পড়েন। কৃষক ফ্রন্টের বিমল পালকে সঙ্গে নিয়ে নতুন করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি কাজ আরম্ভ করেন। ঘোড়ালিয়া, বোয়ালিয়া, কন্দখোলা, বাগদিয়া, মোল্লাবেড়ে, বড় জিয়াকুড়, ছোট জিয়াকুড়, হরিপুর, বাগআঁচড়া, নৃসিংহপুর, মেথির ডাঙ্গা, শ্রীরামপুর, আলুইপাড়া, ভোলাডাঙ্গা, গয়েশপুর, টেংরিডাঙ্গা, চর-পানপাড়া, চর-কালেকটরি—এই দীর্ঘ বৃত্ত জুড়ে গ্রামগুলিতে কৃষকদের মধ্যে কাজ শুরু হল। অতএব শান্তিপুরে অলিখিতভাবে পার্টি নেতৃত্ব কব্জা করার জন্য সমান্তরাল দুই লাইন শুরু হল। শহরে অজয় ভট্টাচার্যের জনপ্রিয়তাকে মোকাবিলা করার জন্য গ্রামে ধীরেন বসাকের ভিত তৈরী করার প্রচেষ্টা।

শান্তিপুরে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির পুরোন কর্মীরা ছিলেন ডাঃ সুরেশ ধর (বহু পুরনো কমিউনিস্ট যাঁর প্রভাবে অনেকেই কমিউনিস্ট মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হন), নন্দলাল দালাল, বিমল পাল, বিষ্টু বঙ্গ, শম্ভু মণ্ডল, অশোক ভট্টাচার্য (অজয় ভট্টাচার্যের দাদা), ধীরেন দাশ, দেবু চ্যাটার্জী, অবনী ভট্টাচার্য, আশু দাস, মোহন চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে কংগ্রেসে যোগ দেন) মাস্তু ভট্টাচার্য এবং আরেকজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা আর.সি.পি.আই-এর কানাই পাল। কানাই পাল শান্তিপুরে বামপন্থী আন্দোলনে আর এক উল্লেখযোগ্য নাম। উদ্বাস্তু আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য নাম এই নেতা বাষট্টির নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে শান্তিপুর থেকে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি শান্তিপুর এলাকার নানা সমস্যার কথা, বিশেষ করে তন্তুজীবিদের সমস্যা তথা চর এলাকায় গঙ্গার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে বন্যা নিরোধ ও কৃষিযোগ্য জমি সদ্ব্যবহার করার সম্ভাব্য এক সুষ্ঠু পরিকল্পনা বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেন। ১৯৬২-র চীন-ভারত সীমানা সংঘর্ষের সময় ভারত সরকারকে 'আক্রমণকারী' গ্রাহ্য করায় ভারতরক্ষা আইনের প্রথম কোপ পড়ে কানাই পালের ওপর—তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে '৬৯-এ ব্যক্তি সংঘাতের রাজনীতির সূত্র ধরেই—তিনি বাম যুক্তফ্রন্টের সমর্থন হারান ও নির্দল প্রার্থী হিসাবে ভোটে দাঁড়িয়ে হেরে যান। শেষদিকে নকশালপন্থী কর্মীদের প্রতি অসূয়া না পোষণ করার দোষেও তাঁকে দোষী করা হয়।

আগেই বলা হয়েছে, পঞ্চাশের দশক থেকে অজয় ভট্টাচার্য ছিলেন শান্তিপুর-রাণাঘাট গণনাট্য সংঘের একনিষ্ঠ কর্মী। "তাঁর সুপরিচালনায় নাটক, গান, আবৃত্তিতে উক্ত শাখা

তখন খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিল। ...নদীয়া বর্ধমানের গ্রাম-গ্রামান্তরে তখন শান্তিপুর গণনাট্যের ডাক। প্রথম অবস্থায় সংগঠনে বেশি সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও যুবছাত্র থাকলেও শেষত একেবারে তাঁত শ্রমিক ও সহজ সরল মানুষদের অক্লান্ত পরিশ্রম করে গণশিল্পী তৈরী করতেন অজয় ভট্টাচার্য।"[১৯] কালাচাঁদ দালাল দেখতেন গণসংগীতের দিকটা, অজয় ভট্টাচার্য নাটকের দিকটা। তাঁর পরিচালনায় 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার', 'ছেঁড়া তার', 'আজকাল', 'মৌ-চোর'—এইসব নাটক অভিনীত হয়েছে। কানাই বঙ্গ পুরো নিজের চেষ্টায় গানের স্কোয়াড তৈরী করেছিলেন। মান্তু ভট্টাচার্য নাটকের সংগঠনের দিকটা দেখতেন। এই যে সাফল্য, এবং তার সূত্র ধরে পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা-এর ফলে কোথাও নিশ্চয় একটা নিশ্চিত ধারণা তৈরী হয়ে গিয়েছিল যে বাষট্টিতে আলজিরিয়াতে অনুষ্ঠিতব্য যুব উৎসবে অজয় ভট্টাচার্যকে পার্টির তরফে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো হবে। কিন্তু শহর কমিটি তাঁর নাম সুপারিশই করেনি। এটা ঘটনা যে, এই পদক্ষেপকে ঈর্ষা ও দলাদলি প্রসূত বলে মনে করা হয়েছিল এবং কালক্রমে অজয় ভট্টাচার্য যে পাল্টা কেন্দ্র হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে থাকেন—তা হয়ত খানিকটা হতাশাপ্রসূত। অথবা অজয় ভট্টাচার্য-র অতীত তাঁর পরবর্তী জীবনকে চিরকালই কমবেশী প্রভাবিত করে গেছে অন্যান্য বহু কমিউনিস্ট নেতার মতোই।

শান্তিপুরে 'বোম্বার্ড মিলিটারী' নামে একটি ক্লাব তৈরী হয় ১৯৩৯ সালে। স্থানীয় কিছু যুবক এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন মূলত স্বাস্থ্যচর্চার জন্য। কিছুদিন পর এই ক্লাব চরিত্র পাল্টে তৈরী হল শহরের হিন্দু ও মুসলমান ঘরের বেপরোয়া যুবকদের জমায়েতে। ১৯৪৪ সালে শান্তিপুর শহরে এক সিনেমা হলের সামনে একটা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুরু হয়। সেই হাঙ্গামায় 'বোম্বার্ড মিলিটারী' জড়িয়ে পড়ে ও হিন্দু-ঘেঁষা পক্ষ নেওয়ায় মুসলমান ছেলেরা ওই ক্লাব ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে 'ফাইটিং ক্লাব' নাম দিয়ে একটা পাল্টা সংগঠন তৈরী করে। ১৯৪৬-৪৭ সালে যখন সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে, তখন এই ক্লাবের যুবকরা প্রধানত হিন্দুরক্ষার দায়িত্ব তুলে নেয়। এদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি সহ হিরোইজম-ই প্রধান ছিল। ১৯৪৭-এ অজয় ভট্টাচার্য এই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হন। তখনও অব্দি 'বোম্বার্ড মিলিটারি' দলের রাজনীতির সঙ্গে কোন লেনদেন ছিল না। ১৯৪৯-এ শান্তিপুরের আর.সি.পি.আই নেতা কানাই পাল ও মক্সদ আলি এই ক্লাবের কাছ থেকে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করেন বলে পুলিশ দাবী করে।[২০] যাইহোক ১৯৫০-এর নভেম্বরের ৮ তারিখে একটা প্রাইভেট গাড়িতে কলকাতা যাওয়ার পথে অজয় ভট্টাচার্য ও আরও তিন ব্যক্তি (ওই একই ক্লাবের) ৬টি রিভলভার, ১টি স্টেনগান ও কিছু কার্তুজ সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। দীর্ঘ কারাবাস হয়। এরপর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কলকাতার অমর রাহার কাছে অজয় ভট্টাচার্য প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি শিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে মার্কস-এঙ্গেলস-এ মূল রচনা নিয়েও তিনি পড়াশুনো করেছেন বলে জানা যায়।[২১]

এই যে যুবকদের নিয়ে কাজ করা এবং তাঁকে ঘিরে অচিরেই একটা গোষ্ঠী তৈরী হয়ে যাওয়া, এই সংগঠনের কৃতিত্ব অবশ্যই অজয় ভট্টাচার্যের প্রাপ্য। "পার্টির হোল টাইমার

হিসাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। হাঁটুর ওপরে ধুতি তুলে সাইকেলে সারা শান্তিপুর ঘুরতেন। সাধারণ মানুষের খুঁটিনাটি এবং জটিল সমস্যার সমাধান করে দিতেন—মীমাংসা করে দিতেন।" "Though 'Bombard Military' was not in existence, a group of young toughs of the town gathered round Ajay Bhattacharya often on the pretext of social service, relief works etc. He became a rallying force."[২২] এক কথায় অজয় ভট্টাচার্যকে অস্বীকার করার উপায় ছিল না কারোর। যদিও পুলিশের রিপোর্টে অজয় ভট্টাচার্যের 'বোম্বার্ড মিলিটারির' জীবন পরবর্তীকালের গণনাট্যের জীবনের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব পেয়েছে।

"Out of 43 of his close associates, only 2 were graduates, and 15 passed school final and read upto different standards in the college and the rest were non-school final. While 5 were school teachers, 1 municipal employee and two Govt. employees–the rest were practically unemployed. Some had small and seasonal business and a few used to help their guardians in their family possessions as weavers. As many as 17 of them were arrested by the police on one occasion or the other on different criminal charges and 5 were convicted to imprisonment of different duration. This was the club which ushered in Maoism in Santipur town."[২৩] কেবল বেপরোয়া মস্তানিই অজয় ভট্টাচার্য ও তাঁর সহযোগীদের অনুপ্রাণিত করেছিল বিপ্লবীজীবন বেছে নিতে, এই দৃষ্টিভঙ্গী একদেশদর্শী। তাঁর একদা কনিষ্ঠ সহযোদ্ধা বুলু চ্যাটার্জীর কথায় (যাঁর দাদা মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ১৯৭২ সালের ৩রা মে অজয় ভট্টাচার্য, কালাচাঁদ দালাল ও শম্ভু হাজরার সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ে প্রাণ হারান) —অজয় ভট্টাচার্য, কালাচাঁদ দালাল প্রমুখ মানুষের খুব কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন। এত পরিচিতি ছিল এঁদের যে পরবর্তীকালে আত্মগোপনের যুগে ধরা পড়ে যাওয়া প্রায় সুনিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও যে পড়েননি সেটাও জনপ্রিয়তার কারণেই। বুলু চ্যাটার্জীর এই মন্তব্যের সমর্থন মিলবে পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহে এবং গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে।

১৯৬৫-তে অজয় ভট্টাচার্য, কালাচাঁদ দালাল শান্তিপুরের অধিকাংশ কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে সি.পি.আই(এম)-এ যোগ দেন। '৬৫-তেই পুরসভা নির্বাচনে দাঁড়ান। সাহাপাড়া থেকে সর্বাধিক ভোটে জেতেন কালাচাঁদ দালাল। অজয় ভট্টাচার্য জেতেন সর্বানন্দীপাড়া থেকে। পরবর্তীকালের শান্তিপুরে ঐ এলাকা দুটি নকশালপন্থীদের এক শক্ত ঘাঁটি হিসাবে চিহ্নিত হয়। [এই প্রসঙ্গে অবধারিত একটি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, যে বিষয় স্বতন্ত্র গবেষণার দাবি রাখে। আগেই বলা হয়েছে, নদীয়ায় অসংগঠিত শ্রমএলাকায় বামপন্থী প্রভাব ও ঐতিহ্য থাকলেও নকশালবাড়ি রাজনীতির উত্তাল যুগেও বিশেষ হাওয়া ওঠানো যায়নি। শান্তিপুরের তাঁতশিল্প প্রসঙ্গে একথা বিশেষ খাটে। প্রচুর সমস্যা-জর্জরিত এই তাঁতশিল্পে (শান্তিপুর, ফুলিয়া ও উপকণ্ঠের গ্রামগুলিতে) বর্তমানে প্রায় এক-দেড় লক্ষ তাঁত চলে। হস্তচালিত

তাঁতকে (handloom) ক্রমশঃ যন্ত্রচালিত তাঁতে (powerloom) পরিণত করার চেষ্টা চলছে, যেটা হলে বহু লোকের রুজি বন্ধ হবে। শান্তিপুরের এক-একজন তাঁত ব্যবসায়ী কোটি টাকার মালিক, কিন্তু তারা কোনভাবেই প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত নয়। উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের 'কারখানাদার' বলে, তারাই অর্ডার দিয়ে তাঁত-শ্রমিকদের দিয়ে তাঁত বোনায়। তাঁত শ্রমিকদের শত্রু এই কারখানাদাররা।

অন্যান্য কারখানায় একজন শ্রমিক নির্দিষ্ট ঘণ্টা শ্রমদানের বিনিময়ে মজুরী পায়। কিন্তু তাঁত শিল্পে একজন শ্রমিক মজুরী পায় ঘন্টার হিসাবে নয়, কাপড়ের 'ভোল' বা ডিজাইন বা নকশার ওপরে। এখানে বোঝাই যাচ্ছে অনেকরকম বৈষম্য আছে। যে কাপড় 'মাটা' বা 'ভোল'-হীন, তার মজুরী কম। আবার 'মাটা' কাপড়েও থাকে 'ঢেউ' বা ডোরাকাটা, যাকে তাঁতের ভাষায় 'ঝরণা' বলে, তারও মজুরী নক্‌শা বা ঘনত্বের অনুপাতে। অর্থাৎ একজন তাঁত-শ্রমিক কাপড় দেখিয়ে তবে মজুরী পাবে। এই ক্ষেত্রে, বোঝাই যায়, বেগার শ্রম প্রচুর আছে। ধরা যাক, একটা কাপড় বোনার প্রস্তুতি হিসাবে একজন তাঁত শ্রমিক 'তানা' জুড়তে যতখানি সময় নিচ্ছে তার কিন্তু কোন মজুরী নেই। শান্তিপুরের তাঁত শিল্পের সমস্যা নিয়ে সি.পি.আই (এম) বা আর.সি.পি.আই বহু রাজনৈতিক দলই নেমেছে। কিন্তু স্থানীয় মালিক শ্রেণী অর্থাৎ 'কারখানাদার'-দের শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন কোন সংগ্রাম গড়ে তোলা হয়নি বা যায়নি। কারণ শোষণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তেমনি করে শ্রেণীদ্বন্দ্বকে প্রকট করে তোলা যায়নি। এরও মূল কারণ হচ্ছে তাঁতশিল্পে পুরোপুরি 'শ্রমিক' চরিত্রটি অনুপস্থিত। আজ যে তাঁত শ্রমিক, কাল ঘটনাচক্রে সে তাঁতমালিক হতে পারে। একজন ছোটখাটো 'কারখানাদার', ধরা যাক সে একশ পঞ্চাশটি তাঁতের মালিক, সে একই সঙ্গে নিজেও তাঁত বোনে অর্থাৎ সে একাধারে শ্রমিক ও মালিক, এবং ভবিষ্যতে তাকে কোনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশীদার করা যেতে পারে। কারণ, এই গোত্রের 'কারখানাদার'রা কখনোই প্রত্যক্ষভাবে 'বাজার'-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। বাজার আসলে 'মহাজন' বা ব্যবসাদার-রা কব্জা করে রেখেছে। মনে রাখতে হবে তাঁতের বাজার যেহেতু সারা বছর তেজী নয় সেহেতু যে লোকটি একশ পঞ্চাশটি তাঁতের মালিক, সে মন্দার সময় পঞ্চাশটি তাঁত চালাবে (অর্থাৎ একশ জন তাঁত শ্রমিক বেকার হল), আবার বাজার তেজী হলে সেই আবার একশ টাকার শাড়ীতে কুড়ি টাকা লাভ করবে। কাজেই এই একশ পঞ্চাশটি তাঁত মালিক, প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হলেও, শ্রমিকদের কাছে শ্রেণীশত্রু। যে কারখানাদার দশটি তাঁতের মালিক সে আবার মন্দার সময় শ্রমিকে পরিণত হবে।

এই অদ্ভুত জোয়ার-ভাঁটার শিল্পক্ষেত্রে একটি ত্রি-স্তরীয় সম্পর্ক কাজ করে। একজন লোক বাজার বুঝে 'কারখানাদার' অথবা শ্রমিকে পরিণত হয়। এক হিসাবে শান্তিপুরে নিঃসম্বল তাঁত-শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম। প্রায় প্রতি পরিবারেই হয় স্বামী-স্ত্রী একটি তাঁত বসিয়ে বোনে বা আত্মীয়ের বাড়ি বুনতে যায়। বাড়ির প্রতিটি সদস্যই এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু মজুরীর ঘরে খাটনির অনুপাতে শূন্যই জমা পড়ে। লাভের অঙ্ক যায় মহাজনের পকেটে।

একজন তাঁত-শ্রমিক দিনে ষোল ঘণ্টা শ্রম দিয়ে সর্বাধিক মজুরী পায় মাসে বারশ' টাকা। কেউ বা পায় এক হাজার। কেউ 'মোটা' কাপড় বুনে সর্বনিম্ন একশ টাকা। মূল কথা হচ্ছে এই যে তাঁত শ্রমিকদের দিয়ে একটা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন তৈরী করা মুশকিল, কারণ সম্বৎসরে এদের খাদ্যাভাব হয় না। অবশ্য গ্রাম এলাকার ছবি ঠিক একরকম নয়।

শান্তিপুর এলাকায় তাঁত-ব্যবসায়ীদের সমিতি আছে, কিন্তু তাঁত শ্রমিক বা কারখানাদারদের কোন ইউনিয়ন নেই। এখানে বহুবার সরকার-বিরোধী আন্দোলন হয়েছে সুতা-সংকট বা অন্য কোন ইস্যুতে, কিন্তু মুল শিল্প পরিকাঠামো বদলের জন্য কোন আন্দোলন হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এই এলাকায় বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি তাঁত শিল্পের সার্বিক পরিকাঠামোয় শোষণের মূল কেন্দ্রে শ্রেণীদ্বন্দ্ব বাড়ানো বা শ্রেণীশত্রু নির্ধারণ করার তেমন কোনো চেষ্টাই চালায়নি।

ফলে সি.পি.আই (এম) বা পরের দিকে সি.পি.আই (এম-এল) পর্বেও নদীয়ায় শ্রমিক আন্দোলন বলতে বিড়ি বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে রিক্‌সা শ্রমিক আন্দোলন বুঝিয়েছে। তাঁত-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নবদ্বীপে মজুরীবৃদ্ধির দাবীতে আন্দোলন হয়েছিল তা উল্লেখ করা হয়েছে। গণসংগঠন বর্জন করার পর্বেও কলকাতা বা উত্তর চব্বিশ পরগণায় শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় নকশালপন্থীরা রাজনৈতিকভাবে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু নদীয়ায় শ্রমিক ফ্রন্টে সি.পি.আই (এম-এল) কর্মীরা হয় প্রত্যাখ্যাত (যেমন কল্যাণী শিল্পাঞ্চলে), নয় অমনোযোগী থেকেছে। বড়জোর তাঁত শ্রমিকদের মধ্যে থেকে নকশালকর্মী বা কিছু নেতৃত্ব উঠে এসেছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলেনি]।[২৪]

নদীয়া জেলার উত্তরভাগে পলাশীপাড়া-তেহট্ট এলাকায় চোখ ফেরানো যাক। ১৯৫৬ সালে পলাশীপাড়ায় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় যে দুজনকে নিয়ে তাঁরা হলেন বিল্বমঙ্গল চ্যাটার্জী ('ব্যাঙ' নামে সমধিক পরিচিত) এবং মন্মথনাথ (মনু) চ্যাটার্জী। পরে শিবচন্দ্র বিশ্বাসকে সদস্য করে এখানে পার্টি cell তৈরী হয়। তেহট্ট এলাকায় অবিভক্ত নদীয়ার যুগ থেকে মাধবেন্দু মোহন্ত কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। চৌষট্টির পার্টি বিভাজনের সময় তেহট্ট কমিটির সমস্ত কর্মী ও নেতাই নতুন দলে যোগ দেন।

এইভাবে ষাটের দশকের মধ্যভাগে কমিউনিস্ট শিবিরে দলবলের পালা সম্পূর্ণ হল। নতুন পার্টি গঠনের আগে এবং অব্যবহিত পরেই পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র ফ্রন্টের পার্টি সদস্য বা নবাগত প্রার্থী সদস্য—সবার মনেই জেগেছিল এক দুরন্ত আবেগ ও উদ্দীপনা। দীর্ঘদিন ধরে নতুন পার্টি গড়ার উদ্যোগী নেতৃবৃন্দ প্রচার করেছেন "দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি" বিপ্লব-বিমুখীন, কোনরকম গণসংগ্রাম করতে অনিচ্ছুক, শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চায়, ওরা সোভিয়েত সংশোধনবাদের অনুগামী ইত্যাদি। তাছাড়া প্রচারে ছিল নতুন পার্টি গড়ে বিপ্লবের কার্যক্রম শুরু করতে হবে, নতুন পার্টি হবে বিপ্লবী পার্টি, এই বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে শুরু হবে বিভিন্ন ফ্রন্টে মিলিট্যান্ট গণসংগ্রাম, শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্র করা হবে, এগিয়ে যাওয়া হবে বুর্জোয়া নির্বাচনের মোহমুক্তি ঘটিয়ে প্রকৃত বিপ্লবের রাস্তায়।

তরুণ ছাত্র পার্টি কমরেডরা এই প্রচারে তখন দারুণভাবে প্রভাবিত। তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন নতুন পার্টি গড়ে একটা কিছু বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে।

সেই সময়টাই ছিল আগ্নেয়গর্ভা। ১৯৬৫ সাল থেকেই ছাত্রদের একাংশের কাছে চীনা-বিপ্লব ও রাজনৈতিক তত্ত্বের উপর বইপত্র, চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর বিভিন্ন লেখা, লিন পিয়াও-এর লেখা প্রায় সবই এসে পৌঁছেছিল। ছেষট্টিতে কলকাতার একদল ছাত্র নেপালে গিয়ে সেখানকার চীনা দূতাবাসে গিয়ে অনুরোধ জানায় যেন চৈনিক পত্র-পত্রিকার সরবরাহে বিঘ্ন না ঘটে।[২৫] সশস্ত্র বিপ্লবের সমসাময়িক পশ্চিমী ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কেও ঔৎসুক্য কম ছিল না। বলিভিয়ার বিদ্রোহী বিপ্লবী নায়ক চে গুয়েভারা ও রেগি দেব্রের লেখার কলকাতার ছাত্রমহলে অসম্ভব চাহিদা ছিল। এর পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত বেশ কিছু পত্রিকা গোষ্ঠী মাও সে তুং-এর চিন্তা ও কর্মধারার সঙ্গে সবার পরিচয় করাচ্ছিল। অমূল্য সেন ও কানাই চ্যাটার্জী সম্পাদিত *'চিন্তা'* পত্রিকা পঁয়ষট্টি থেকে মাওবাদী আন্দোলন ও ভারতের মাটিতে তার প্রায়োগিক সম্ভাব্যতা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করাচ্ছিল। এই 'চিন্তা' পত্রিকার কর্ণধাররাই পরবর্তীকালে *'দক্ষিণদেশ'* নামে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর জন্ম দেন যারা দক্ষিণবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় মাওবাদী রাজনীতির সপক্ষে প্রচার চালাতেন। আরও পরে 'এম সি সি' বা মাওয়িস্ট কমিউনিস্ট সেন্টার' নামে একটি পার্টির জন্ম দেন এই দক্ষিণদেশ গোষ্ঠী। যাই হোক, 'চিন্তা' পত্রিকার পাশাপাশি আরও যে সব পত্রিকা চীনা বিপ্লবের বিভিন্ন দিক ও সমসাময়িক ভারতীয় রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা বা লেখালেখি চালাচ্ছিল সেগুলি হল *কালপুরুষ, নন্দন, ঘটনাপ্রবাহ, পূবের হাওয়া, ভিত্তি, ক্রান্তিকাল* ইত্যাদি। তেষট্টি সালে মান্থলি রিভিউতে প্রকাশিত '৬২-র ভারত-চীন যুদ্ধ নিয়ে একটি লেখা (যা ভারত সরকার নিষিদ্ধ করেন) গোপনে পুনর্মুদ্রিত করে পার্টি সমর্থকদের মধ্যে প্রচারিত করা হয়। এইভাবে ছাত্রফ্রন্টে ব্যাপকভাবে চীনা বিপ্লবের সপক্ষে প্রচার চলে। মাও পরিচালিত কৃষিবিপ্লবই সংসদীয় রাজনীতির বিপক্ষে সঠিক প্রত্যুত্তর, এমন একটা বিশ্বাস তৈরী হয়।

নতুন গড়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে সেসময় রাণাঘাটের হরিনারায়ণ অধিকারী 'সঞ্জয় সেন' ছদ্মনামে ছাত্রফ্রন্টের কাজকর্ম চালাচ্ছেন—সঙ্গে বিমান বসু। বি.পি.এস.এফ-এর সম্পাদক দীনেশ মজুমদার তখন ভারত রক্ষা আইনে আটক। অন্য দুই যুগ্ম-সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী ও শ্যামল চক্রবর্তী প্রকাশ্যে কাজ চালাচ্ছেন। বি.পি.এস.এফ-এর এই পদাধিকারিদের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ব্যাপক ছাত্রমহলের 'মিলিট্যান্ট' গণসংগ্রামের প্রত্যাশা। বাম ছাত্র ফেডারেশন (অর্থাৎ যে গোষ্ঠী সি.পি.আই.এম এর শিবিরে) গোষ্ঠীর *'ছাত্রছাত্রী'* পত্রিকার বিপক্ষে নতুন পত্রিকা বেরোল *'ছাত্রফৌজ'*। এই পত্রিকা গোষ্ঠী মিলিট্যান্ট ছাত্রসংগ্রামের পক্ষে ছিলেন। অগ্রগামী অংশ হিসাবে যাঁরা পরিচিত ছিলেন তাঁরা হলেন শৈবাল মিত্র, দিলীপ পাইন, বিমল করগুপ্ত, নির্মল ব্রহ্মচারী, বিপ্লব হালিম, আজিজুল হক প্রমুখ। ছাত্রফ্রন্টে চিন্তার এই সংঘাত ক্রমশই পশ্চিমবাংলার বামপন্থী শিবিরে আবার

বিতর্কের ঝড় তুলল, যা ছিল দ্বিতীয়বারের কমিউনিস্ট আন্দোলন ভাঙনের সহায়ক শক্তি।

বাষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি পর্যন্ত পর্ব পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা পিছিয়ে যাওয়ার, আত্মরক্ষার সময়। "...'৬২ সালে চীন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বামপন্থার, কমিউনিস্ট আন্দোলনের এবং বামপন্থী যুব ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে হামলার চেষ্টা, ...তাতে সেটব্যাক নিশ্চয়ই হয়েছিল কিন্তু বামপন্থী আন্দোলন এবং বামপন্থী যুব ছাত্র আন্দোলন তাকে ধীরে ধীরে মোকাবিলাও করেছিল। '৬৫ পর্যন্ত পর্যায়টাকে যদি ব্যাপক অর্থে বলি যে সেট-ব্যাকটা কাটিয়ে ওঠার পর্যায়, তাহলে '৬৬ হচ্ছে তার উল্লম্ফনের পর্যায়।"[২৬]

উলম্ফন পর্ব

১৯৬৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তানের সঙ্গে চীন ছিল বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ এবং চীন পাকিস্তানের মিত্ররূপে চিহ্নিত। ফলে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় 'চীনাপন্থী-কমিউনিস্ট' নাম দিয়ে ভারতের কমিউনিস্টদের ওপর আবার নির্যাতনমূলক আইন দমননীতি নেমে আসে। অনেক নেতা বন্দী, অনেকেই আণ্ডারগ্রাউণ্ডে—ফলত জন্মানোর শুরুতেই নতুন কমিউনিস্ট শিবিরে সমন্বয়মূলক কাজকর্মের অভাব ঘটে, যেটা সে সময় খুবই দরকার ছিল।

এদিকে যুদ্ধের ফলে মানুষের বেঁচে থাকা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ষাটের দশকের শুরুই হয়েছিল '৫৯-এর খাদ্য আন্দোলনের দগ্‌দগে ঘা নিয়ে। বছর বছর খাদ্য আন্দোলনের সেই শুরু। খবরের কাগজে একই সংবাদে পুনরাবৃত্তি ঃ "বাজার ঊর্ধ্বমুখী, রেশন অপর্যাপ্ত ঃ ডিলারদের টালবাহানা ঃ নূতন কার্ড বন্ধ।"[২৭] পরপর কয়েকটা বছরের এরকম কিছু খবর এখানে তুলে দেওয়া হল *'নবদ্বীপ বার্ত্তা'* থেকে, যেগুলিতে নদীয়ার সে সময়ের চেহারাটা ধরা পড়বে।

(ক) *২৯শে সেপ্টেম্বর* '৬৩ঃ পৃষ্ঠা-১ ঃ—"দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে নবদ্বীপবাসীর চরম দুর্দিন। চাল কেজি ১.১০ টাকা, রেশনের দোকানে দুঃসহ কিউ, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হাহাকার।" "নদীয়ায় চাল চল্লিশ টাকা মণ।"

(খ) একই দিনের আরেকটি খবর ঃ পৃষ্ঠা-১ ঃ—"দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে নবদ্বীপে পূর্ণ হরতাল পালন—খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর সমগ্র নবদ্বীপ শহর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। এদিন কৃষ্ণনগরেও শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। নবদ্বীপের পার্শ্ববর্তী স্বরূপগঞ্জ, শ্রীরামপুর, সমুদ্রগড়, পূর্বস্থলী, জাহাননগর, পারুলিয়া, বিশ্বরম্ভা প্রভৃতি সুদূর পল্লীঅঞ্চলের দোকানপাটও বন্ধ ছিল এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘট পালন করে।"

(গ) ওই দিনেরই আরেকটি কৌতূহলজনক খবর ঃ পৃষ্ঠা-৪ ঃ—"দেয়ারাপাড়ার ডিলার শ্রী যতীন রায়ের দোকানে রামধনি ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তি নাকি তিন ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে দোকানের রেশন নিঃশেষ হওয়ায় মাল না পেয়ে রাগে তাঁর কার্ডখানি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন। প্রকাশ জনৈক ব্যক্তি নাকি একদিন বিকাল চারটে থেকে আটটা পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে চাল ফুরিয়ে যাওয়ায় মাল না পেয়ে অত্যন্ত ক্ষোভে দুঃখে একদিন উপোষ দিয়েছিল।"

(ঘ) *২৯ আগস্ট ১৯৬৫* ঃ পৃষ্ঠা-৪ ঃ—*"নদীয়ার খাদ্যের ভয়াবহ অবস্থা"*—'বর্তমান সরকারের গদীতে থাকিবার কোন অধিকার নাই'—নদীয়া বার এ্যাসোসিয়েশনের সময়োপযোগী প্রস্তাব। কৃষ্ণনগরে বার এ্যাসোসিয়েশনের উক্ত প্রস্তাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ রাজনৈতিক অত্যাচার ও অবিচারেও বার এ্যাসেসিয়েশন চিরকালই নীরব থাকেন। কিন্তু বর্তমানে খাদ্যদ্রব্যের অভাবে যে নিদারুণ হাহাকার পড়িয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণনগর বার এ্যাসোসিয়েশনও আতংকগ্রস্ত হয়ে উঠেছেন। "জেলায় চাউল সংগ্রহ এক দুঃসাধ্য ব্যাপার, এবং যে অল্প পরিমাণ চাউল পাওয়া যায় তাহাও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ঊর্ধ্বে।" *'In a welfare state a Govt. which cannot arrange for sufficient food for the people, have no right to continue and should vacate.'*

এই ভেতরের কারণটাই মধ্য ষাটের উল্লম্ফনের জন্য দায়ী। আগেই বলা হয়েছে নদীয়ার সর্বত্র বিশেষ করে পূর্ব-সীমান্তে বরাবরই প্রচণ্ড চাল সংকট চলত—চাপরা, কালিনগর, মাজদিয়া, বানপুর, গেদে প্রভৃতি এলাকায়। বি.পি.এস.এফের ছাত্র-নেতারা কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন জায়গায় রাতে, পাছে লরি করে চাল পাচার করা হয়, তার জন্যে রাস্তায় বেঞ্চ পেতে ব্যারিকেড তৈরী করে শুয়ে থাকতেন। লরী ধরতে পারলে বাজেয়াপ্ত করে চাল বিলি করে দেওয়া হত। শান্তিপুরেও ছেষট্টির খাদ্য-আন্দোলনের সময় অজয় ভট্টাচার্যরা চালের লরি আটকে কুটীর পাড়া অঞ্চলে তা ন্যায্যমুল্যে বিক্রী করেন। আর.সি.পি.আই নেতা কানাই পাল—রাজনৈতিক মতপার্থক্য অস্বীকার করে ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়ান। ২৫০০ টাকা সংগৃহীত হয় এবং তা চাল বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়াও হয়। চালের মালিক টাকা না নিয়ে কালাচাঁদ দালাল ও অজয় ভট্টাচার্যের নামে ডাকাতি কেস দায়ের করে।

চাকদহের প্রাক্তন সি.পি.এম নেতা সৌরেন পালও জানান—চৌষট্টির পরপর তাঁরা প্রধানত ছাত্র ফ্রন্টকে সংঘবদ্ধ করার কাজে উঠে পড়ে লাগেন। মূলতঃ ছাত্রস্তরে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই চাকদহে বাম কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে ওঠে। পঁয়ষট্টি থেকেই ছাত্রদের স্কুলে স্কুলে গিয়ে গেট মিটিং, পথসভা করে সচেতন করার প্রয়াস চলেছে। সচেতন করার জন্য বাইরে থেকে বিশেষ চেষ্টা করতে হত না। প্রবল খাদ্যসংকটের পাশাপাশি কেরোসিনের দাবী ওঠে। খোলা বাজারে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। মজুতদারি-র বিরুদ্ধে তীব্র জনমত তৈরী হচ্ছে, এখানেও গুদাম আটক করে মজুত মাল রেশনের দামে বিক্রী করানো হত।

চাকদহে এরকমই পুলিশকে একবার বাধ্য করানো হয়েছিল এক মজুতদারকে কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তায় হাঁটাতে।[২৮] এসব কাজ যে পার্টির ক্যাডাররাই করাতো, তা কিন্তু নয়। কারণ তখনও চাকদহে কমিউনিস্ট পার্টির এত শক্তি হয়নি যে, লালপতাকা নিয়ে একটা মিছিল তৈরী করা যায়। গণসহানুভূতি ও সমর্থনই মূল সম্পদ ছিল। যদিও এর আগে থেকেই চাকদহ অঞ্চলে বিড়ি শ্রমিক ও আর.আই.সি-র কর্মী ইউনিয়নের কাজ ভালই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এই পটভূমিকায় ১৯৬৬ সালে নদীয়া জেলায় খাদ্য আন্দোলনের আগুন জ্বলে উঠল। ছাত্রসমাজ স্বাভাবিক ভাবেই ছিল এই আন্দোলনের বর্শামুখ। ছেষট্টির ১৬ই ফেব্রুয়ারী বসিরহাটের স্বরূপনগরে কেরোসিন তেলের লাইনে পুলিশের গুলিতে ছাত্র নুরুল ইসলাম নিহত হল। বারুদে স্ফুলিঙ্গ পড়ল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন গড়া কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্ট সময়োচিত নেতৃত্বে এগিয়ে আসে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী কলকাতাব কয়েকটি ছাত্রসংগঠনের মিলিত সংস্থা 'ছাত্রসংগ্রাম কমিটি' শহরে 'শহীদ দিবস' পালন করেন। ইতিমধ্যে বসিরহাট, বারাকপুর, কাকদ্বীপ, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, ক্যানিং, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বেলপুকুর, নাকাশীপাড়া, রাণাঘাট, কল্যাণী, বারাসাত ও অন্যান্য আরও জায়গায় ছাত্র ও জনতার মধ্যে বিক্ষোভ ছড়াচ্ছিল, হরতাল হচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, —সর্বস্তরের ছাত্রসমাজ, বি.পি.এস.এফ (বাম)-এর ব্যানারে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে এগিয়ে এল। পার্টির গোপন কেন্দ্রের সহযোগিতায় ছাত্রফ্রন্টের গোপন নেতৃত্ব এবং প্রকাশ্য নেতৃত্ব মিলে জঙ্গী খাদ্য আন্দোলন সংগঠিত করার রণকৌশল ঠিক করে। মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গে তখন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা, মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন যিনি আকালের সময় ভুখা মানুষকে কাঁচকলা খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আন্দোলন আর ছাত্রসমাজ কেন্দ্রীক থাকে না—খাদ্যআন্দোলন পরিণত হয় এক সংগ্রামী গণ-আন্দোলনে। এ প্রসঙ্গে নদীয়ার তৎকালীন সি.পি.আই (এম) জঙ্গী নেতা নাদু (শোভেন) চ্যাটার্জীর মতে ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনে বাম কমিউনিস্ট পার্টির একটা ভূমিকা অবশ্যই ছিল। দেশে জরুরী অবস্থা, মূল্যবৃদ্ধি, অধিকাংশ নেতা জেলে বন্দী—এই হতাশাজনক অবস্থায় পার্টি নেতৃত্ব ছাত্রদের মধ্যে দিয়ে আন্দোলনকে চাঙ্গা করানোর, নতুন উদ্যোগ নেওয়ার, নতুন রক্ত দেওয়ার দরকার বোধ করলেন। কৃষ্ণনগর শহরের চরিত্রে একটা জঙ্গীয়ানা তখন ছিলই—এটাকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করলেন পার্টি নেতৃত্ব। কৃষ্ণনগর টাউন হলে সি.পি.আই (এম) থেকে এই সময় একটি ছাত্র কনভেনশন ডাকা হয়। গৌর কুণ্ডু, রাণাঘাটের সি.পি.আই (এম) নেতা প্রথমে আপত্তি তুলেছিলেন, কিন্তু কমরেডদের চাপে মত পাল্টান। মদন সাহা যিনি শান্তিপুরের ছাত্র ও জেলা বি.পি.এস.এফ-এর সম্পাদক ছিলেন, কৃষ্ণনগরের ছাত্র নেতা শুভ্র সান্যাল, পঙ্কজ জোয়ার্দ্দার, মহিমময় চন্দ, শুভ্রাংশু ঘোষ প্রমুখ এতে অংশ নেন। হরিনারায়ণ অধিকারী ফেরার অবস্থাতেই সাহায্য দেন। এই কনভেনশনেই বন্দীমুক্তি, দ্রব্যমূল্য হ্রাস, জরুরী অবস্থার অবসান—এইসব দাবী সামনে রেখে ছাত্রদের এগিয়ে আসার ডাক দেওয়া হয়। এরপরই বেরোয় সেই বিখ্যাত

মার্চের মিছিল।

৪ঠা মার্চ, '৬৬, কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্ররা স্থানীয় সি.এম.এস স্কুলের ছেলেদের নিয়ে মিছিলে বেরোয়। অন্যদিকে কৃষ্ণনগরের পলিটেকনিক (বিপ্রদাস পাল চৌধুরী ইনস্টিটিউট অব্ টেকনোলজি)-এর ছাত্রদের নেতৃত্বে আরেকটি মিছিলে স্থানীয় এভি হাইস্কুল ও কৃষ্ণনগর হাইস্কুলের ছেলেরা বেরোয়। মিছিল দুটি যখন কৃষ্ণনগরের পোস্ট অফিসের মোড়ে দুটি রাস্তা দিয়ে মিলিত হবার মুখে, তখনই ঐ এলাকায় দাঁড়ানো একটি পুলিশের গাড়িতে ঢিল পড়ে। খুব তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ধৈর্য্য হারায়। গুলি চালায়। আনন্দ হাইত নামে একটি ছাত্রের মৃত্যু হয়। "মিছিলের অগ্রবর্তী ছাত্ররা গায়ের জামা খুলে, খোলা বুক চাপরাতে চাপরাতে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেল। চিৎকার করে ছাত্ররা বললো "কত গুলি আছে তোমাদের, গুলি করে আমাদের সবাইকে মার।" সংগ্রামী ছাত্র জনতার এই অকুতোভয় সাহসে পুলিশবাহিনী স্তব্ধ, তাদের উদ্ধত রাইফেল অবনত।"[২৯] হরিনারায়ণ অধিকারীর বর্ণনায় সেদিনের কৃষ্ণনগর।

এই ঘটনার পর জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস, স্কুলবোর্ড ও তৎসংলগ্ন ডাকঘর, নতুন কালেক্টরেট বিল্ডিং, জেলা সোশ্যাল এডুকেশন অফিস, জেলার কৃষিদপ্তর, ল্যাণ্ড কাস্টমস্ অফিস, ল্যাণ্ড রিকুইজিশন অফিস প্রভৃতিতে অগ্নি-সংযোগ করে। সরকারী সূত্রের খবর অনুযায়ী আনুমানিক আড়াই লক্ষ টাকার সরকারী সম্পত্তি নষ্ট হয়।[৩০]

গুলি চালনার ঘটনা কৃষ্ণনগরে জনতা বনাম পুলিশ দ্বন্দ্বের এরকম একটা চেহারা দেয়। সেই রাতেই বি.পি.এস.এফ-এর সব কর্মীদের (শহরে) বাড়ীতে পুলিশ হানা দেয়। গোপন একটা বৈঠকে রাতে, শহরের আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট দু-একজন নেতা যেমন নাদু চ্যাটার্জী, সুভাষ বসু ও মণি বাগ এই সিদ্ধান্ত নেন যে, পরদিন, অর্থাৎ ৫ই মার্চ আনন্দ হাইতের মৃতদেহ দাবী করে মিছিল বেরোবে এবং পরিকল্পনা নেন যে, পুলিশের ও প্রশাসনের সম্ভাব্য বিরোধিতাকে কিভাবে মোকাবিলা করা হবে। ঘটনা যে দিকে মোড় নেয় তাতে ৫ই মার্চ সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিকেল ৫টা অব্দি শহরে প্রশাসনের কোন অস্তিত্বই থাকে না। কৃষ্ণনগরের ছাত্ররা ব্যাঙ্গাত্মক শ্লোগান তোলে—"পুলিশের লাঠি, ঝাঁটার কাঠি।"

আনন্দ হাইতের মৃতদেহ দাবী করে কমিউনিস্ট পার্টির লোকজন এবং সাধারণ মানুষ সেদিন সদর হাসপাতালের মোড়ে জমায়েত হয়। সেই বিস্ফারিত উত্তেজনার মুখে পুলিশ পুনরায় ইন্ধন জোগালে আবার গুলি চলে, নিহত হয় হরি বিশ্বাস, জনতার রোষে একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয় (যতীন দত্ত)। সেই ৫ই মার্চের সন্ধ্যায় পুলিশবাহিনী ব্যারাকে ঢোকে, শহরের দখল চলে যায় মিলিটারীর হাতে। কারফিউ জারী হয়। ৬ই মার্চ কৃষ্ণনগরের আশপাশের এলাকাগুলোতে যেমন কালীনগর, শক্তিনগরে শুরু হয় গণ্ডগোল। শক্তিনগর এলাকায় এই সময় প্রায় শূন্য থেকে শুরুর অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়ে তুলেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে ছিলেন গোপাল মজুমদার, বেণীচরণ সরকার,

মাধাই বিশ্বাস প্রমুখ। এফ.সি.আই-এর গোডাউন লুট হয়। অর্জুন ঘোষ গুলিতে মারা যায়। শেষ দিকে লুটপাট চলে। রামু (প্রাবৃট) ব্যানার্জীর কথায় 'লুটের দিকে একটা অংশ সবসময়েই চলে যায়। আসলে mob fury তখন এমন পর্যায়ে যে পুলিশ দিয়েও কিছু করা যাচ্ছিল না। একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, শহরে মিলিটারী নেমেছে, তারা রাইফেল উঁচাত, কিন্তু মারত না। অনেক ক্ষেত্রে রেশনের দোকানদারদের বাধ্য করত মাল বার করে দিতে।'

'৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের পর পরই জেলা কমিটির বহু নেতা গ্রেপ্তার হলেন বা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে গেলেন। কৃষ্ণনগরে একা বদ্যিনাথ মুনসী তখন স্বর্ণময়ীপুকুরের ধারে পার্টি অফিস পাহারা দিচ্ছেন। আন্দোলনের মেজাজ যাতে ঝিমিয়ে না পড়ে তারই চেষ্টা চলছিল।

কৃষ্ণনগরের ঘটনার সূত্র ধরে শান্তিপুর, নবদ্বীপে, চাকদহে-ও তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। শান্তিপুর কলেজের বি.পি.এস.এফ-এর একদল ছাত্র মিউনিসিপ্যালিটি আক্রমণ করে, কাগজপত্র যা পায়, তা পুড়িয়ে দেয়। পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। প্রায় জনা আড়াইশ ছেলে ধরা পড়ে ক্রিমিনাল কেসে। পার্টির নেতারা যাঁরা জেলের বাইরে—তাঁরাও আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। ধীরেন বসাক এইসময় রাণাঘাট কোর্টে নথীভুক্ত হওয়ার সুবাদে লিগ্যাল এইড কমিটি বা আইনী সাহায্যের জন্য একটি কমিটি গড়লেন পুরোটাই নিজের দায়িত্বে ও উদ্যমে। জামিনে প্রায় ১৭৫ জন কর্মীকে বার করে নিয়ে এলেন। এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা কালক্রমে তাঁকে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের অনেকখানি জমি তৈরী করে দেয়, শান্তিপুর শহরে যেটা তিনি এতদিন করে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর মতে জেলা কমিউনিস্ট নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান রাণাঘাটের গৌর কুণ্ডুর তীব্র আপত্তি ছিল এই পদক্ষেপে। কারণ, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ছাড়াই যে আন্দোলন হয় তাতে বন্দীদের জামিনের প্রশ্নে পার্টির করণীয় কিছু নেই। কয়েকটি খুব উল্লেখযোগ্য বিষয় এই প্রসঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসে। প্রথমটি পার্টি নেতৃত্বের আত্মশ্লাঘায় একটা বিরাট বড় ধাক্কা দেয় এই খাদ্য আন্দোলন। এই আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টির চিরাচরিত মরশুমী আন্দোলনের বদ্ধ জলাশয়ে গণ আন্দোলনের রুদ্ধ গতিকে এক ধাককায় মুক্ত করে দেয়। সংগ্রাম যে কতখানি জনমনকে প্রভাবিত করতে পারে, এবং আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা সৃষ্টি করতে পারে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল ১৯৬৬-র খাদ্য তথা গণ আন্দোলন। সবচেয়ে বেশী প্রত্যাশার সৃষ্টি হল ছাত্র, যুব, তরুণ পার্টি সভ্যদের মধ্যে। তাঁরা সদ্যমুক্ত পার্টি নেতৃত্বের কাছ থেকে আশা করেছিলেন আরও নতুন নতুন সংগ্রামী কর্মসূচী ঘোষণা।

গণ্ডগোল বাধল সেখানেই। ধীরেন বসাকের মতে ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনে প্রথম সারির নেতারা সব জেলে। দ্বিতীয় স্তরের আত্মগোপনকারী নেতৃত্ব দিয়ে এভাবে একটা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন এত সংগঠিত ও সফলরূপে হয়ে যেতে পারে তা প্রথম শ্রেণীর নেতৃত্ব ভাবতে এবং মেনে নিতে পারেননি। ব্যক্তিনির্ভর নেতৃত্বের অপরিহার্যতা, যা কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের অহমিকার ভিত—তা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনে। এটা ঘটনা যে, চৌষট্টির পার্টি ভাঙন-এর সময় তরুণ প্রাণ, যারা চেতনায়

যতখানি না বিপ্লবী, উত্তেজনায় ও আগ্রহে তার চেয়ে বেশী ছিল, তারা সি.পি.আই (এম)-কেই প্রকৃত বিপ্লবের বাহক ভেবে এই শিবিরে যোগ দেয়। '৬৬-র গণ আন্দোলনে এরাই সর্বস্ব দিয়ে অংশগ্রহণ করে ব'লে প্রথম সারির নেতৃত্বের তরফে এরকম প্রচেষ্টা শুরু হল যাতে প্রকাশ্যে না হলেও গোপনে এই আন্দোলনকে প্রকৃত বিপ্লবী নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত না বলে নৈরাজ্যবাদী নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত বলে আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। বস্তুতপক্ষে, এই আন্দোলন হয়েছিল বলেই প্রথম সারির নেতারা এত তাড়াতাড়ি জেল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন।'[৩১] হরিনারায়ণ অধিকারীও লিখেছেন যে..."তাই পার্টি নেতৃত্বের অনেকে বলতে শুরু করলেন এই আন্দোলন সংগঠিত নয়, স্বতঃস্ফূর্ত। পার্টির নদীয়া জেলা কমিটির সভায় মন্তব্য হলো এই আন্দোলন শুধু স্বতঃস্ফূর্ত, অসংগঠিত নয়, এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা ছিল মূলতঃ রেলে চাউলের চোরাকারবারীরা। এই মন্তব্যে কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের ছাত্র-যুব সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যদিও পরে পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি তার পর্যালোচনায় আন্দোলনের নেতৃত্ব, সংগঠিত রূপ ও সাফল্যকে স্বীকার করে নিয়ে প্রশংসা করে। তবু প্রথমে নেতৃবৃন্দের স্ব স্ব একক মূল্যায়ন ও মন্তব্য পার্টির অভ্যন্তরে সংঘাত ও ক্ষত সৃষ্টিতে হল সহায়ক। রোমান্টিক অতিবিপ্লবী মানসিকতায় উদ্বুদ্ধদের কাছে এইসব মন্তব্য হলো তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের মূলধন।"[৩২]

স্বতঃস্ফূর্ততার প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগরের রামু ব্যানার্জী মনে করেন, ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলন পুরোপুরি স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত করার কাজটা আগে থেকেই কমিউনিস্ট যুব-ছাত্ররা চালিয়ে আসছিল। ঘটনার দিনও ছাত্র-ফেডারেশনের কর্মীরা এবং সর্বোপরি নাদু চ্যাটার্জী বিক্ষোভের পুরোভাগে ছিলেন—যদিও জনতার বৃহদংশ যারা এগিয়ে এসেছিল তারা খাদ্যসংকটের প্রত্যক্ষ শিকার। রামু ব্যানার্জীর কথায়—ছেষট্টিতে ছাত্রফ্রন্ট মদন সাহার হাতে থাকলেও বাদবাকি সর্বত্র নাদু চ্যাটার্জী প্রায় একচ্ছত্র নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়—"Nadu was neither an organiser nor a theoretician. He was a spot activist."[৩৩] ছেষট্টি পরবর্তী নদীয়া জেলায় সি.পি.আই (এম) বিরোধিতায় যিনি সবাইকে নিয়ে এগিয়ে গেছেন, সেই নাদু (শোভেন) চ্যাটার্জী সম্পর্কে পরে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। তবে নাদু চ্যাটার্জী মনে করেন যে কমিউনিস্ট পার্টির চেষ্টাতেই কৃষ্ণনগরে খাদ্য আন্দোলন পুলিশ-বিরোধিতার চেহারা ছেড়ে রাজনৈতিক-স্তরে বিরোধিতার চেহারা নেয়।

কৃষ্ণনগরে খাদ্য আন্দোলনে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের জন্য কাশীকান্ত মৈত্র বিনা ফি-তে কৃষ্ণনগর কোর্টে মামলা লড়েন।

ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনে রাণাঘাট কখনোই উত্তাল হয়নি। এই বিক্ষোভ সর্বত্র মূলতঃ ছাত্রকেন্দ্রিক ছিল। কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, নবদ্বীপ বা শান্তিপুরে ছাত্র ফেডারেশন-এর নেতৃত্বে—সর্বত্রই ব্যাপক প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। রাণাঘাট কলেজ এত সব হয়ে যাওয়ার পরেও চুপচাপ থাকায় সেখানকার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে শাঁখা ও শাড়ী পাঠিয়ে

দেওয়া হয়।[৩৪] আসলে দীর্ঘদিন ধরেই রাণাঘাটের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হত তারা হল রাণাঘাটের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই ব্যবসায়ী শ্রেণী তাঁদের স্বার্থসাধনে চিরকাল রাজনৈতিক দলগুলিকে কাজে লাগিয়ে এসেছে। যুব-ছাত্রদের মধ্যে সবরকম সুবিধাবাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে যাতে সামাজিক রাজনৈতিক স্তরে সচেতনতা না ছড়াতে পারে। বামপন্থী আন্দোলন এই শহরে চিরকালই দুর্বল। যদিও রাণাঘাট-পূর্ব অঞ্চলে (যেদিকে এশিয়ার বৃহত্তম উদ্বাস্তু শিবির কুপার্স ও রূপশ্রী রয়েছে) দীর্ঘকাল ধরেই সি.পি.আই-এর ঘাঁটি কিন্তু এই উদ্বাস্তু রাজনীতিও পরবর্তীকালে অদ্ভুত সুবিধাবাদের রাস্তায় চলে। যদিও এই উদ্বাস্তু শিবিরগুলি থেকে নদীয়ার বহু বাম কমিউনিস্ট নেতা উঠে এসেছিলেন যেমন ধুবুলিয়ার শান্তিরঞ্জন দাশ, উমেশ মজুমদার, রূপশ্রীর সুভাষ বসু, দীনেশ মজুমদার প্রমুখ—তবু মধ্য ষাটের পর থেকে অর্থাৎ পুনর্বাসন সমস্যা মোটামুটি কেটে যাওয়ার পর থেকে কোন রকম জঙ্গী আন্দোলনে ব্যাপক ভাবে উদ্বাস্তুদের আগ্রহ কমে যায়। সাধারণভাবে উদ্বাস্তুরা খুবই পরিশ্রমী ছিল। রাণাঘাটে খেটে খাওয়া মানুষরা মূলতঃ উদ্বাস্তু শ্রেণী থেকেই এসেছিলেন (মজুর বা শ্রমিক শ্রেণী যাঁরা বিভিন্ন পাওয়ারলুমে কাজ করতেন)। কিন্তু জীবনধারণের সংগ্রামে পর্যুদস্ত এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে স্থির প্রত্যয়ে রাজনৈতিক জীবনাদর্শ বেছে নেওয়ার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। নদীয়ায় ধুবুলিয়া, কি রাণাঘাটে, পুনর্বাসনের পরে, উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকায় স্রোতবিরুদ্ধ রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের প্রতি ব্যাপক অনীহাই লক্ষ্য করা গিয়েছে। রাণাঘাট শহরে ব্যবসায়ী-চোরাচালানকারী-রাজনৈতিক নেতা—এই ত্রিমুখী চক্র কোনভাবেই কোন স্বাধীন রাজনৈতিক উদ্যোগকে মাথা তুলতে দেয়নি। অপরদিকে উদ্বাস্তু শিবিরে মধ্য-ষাট দশকের রাজনৈতিক চেহারাটা ছিল সি.পি.আই বনাম সি.পি.আই (এম) —রূপশ্রী ক্যাম্পে এই লড়াইটা ছিল তীব্রতর—কুপার্সে অতটা নয়। নকশালবাড়ি যুগের সূচনায় সি.পি.আই (এম) এই ক্যাম্পগুলিতে সি.পি.আই-কে হটানোর চেষ্টা করেছে। সুতরাং এলাকা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলির অন্য কোন দিকে তাকানোর অবকাশ ছিল না।

ফিরে যাওয়া যাক ছেষট্টির দিনগুলোয় নদীয়ার বাকী অংশে। ছেষট্টির ফেব্রুয়ারীতে বসিরহাটের ঘটনার পরদিন চাকদহে কেরোসিন তেল ও খাদ্যের দাবীতে স্থানীয় বি.ডি.ও অফিসে অভিযান করার জন্য প্রধানত ছাত্রদের নেতৃত্বে এক বিরাট মিছিল বেরোয়। সে সময় এতবড় মিছিল চাকদহ অঞ্চলে বিরল ছিল। একটা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে জনতার প্রায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হবার উপক্রম হয়।

নদীয়ার আর একটি উল্লেখযোগ্য লড়াকু জায়গা ছিল মুড়াগাছা। মুড়াগাছা চিরকালই বর্ধিষ্ণু এলাকা—সঙ্গতিসম্পন্ন হিন্দু বনেদী ব্রাহ্মণদের আদি বাসস্থান। শিক্ষার প্রচারেও মুড়াগাছা যথেষ্ট অগ্রসর ছিল। নদীয়ার বহু প্রাচীন স্কুলের মধ্যে মুড়াগাছা হাইস্কুল অন্যতম। এই গ্রামে এবং আশেপাশের গ্রামগুলিতেও বামপন্থী আন্দোলন একজন নব্যযুবকের দ্বারা প্রভূত প্রভাবিত হয়েছিল। তিনি হলেন কৃষ্ণনগর পলিটেকনিকের ছাত্র অরুণ মুখার্জী, যদিও

মুড়াগাছায় সি.পি.এম-এর স্থানীয় নেতা ছিলেন পাঁচু ব্যানার্জী। সঙ্গে আরও যে কজন কমিউনিস্ট কর্মী ছিলেন তাঁরা হলেন—মোহন মুখার্জী, দুখু চুনারি, বৃন্দাবন বিশ্বাস প্রমুখ। কিন্তু ছাত্রমহলে অরুণ মুখার্জীর প্রভাবই ছিল সর্বাধিক। মুড়াগাছা স্কুলই পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রথম স্কুল যেখানে বি.পি.এস.এফ-এর ইউনিট খোলে। ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনের আগে মুড়াগাছা ও পাশের ধর্ম্মদাতেও খাদ্যের দাবীতে ছাত্র ধর্মঘট হয়। এই স্কুল ছাত্ররাই মুড়াগাছা ও ধর্ম্মদাতে বামপন্থী ভাবধারাকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করে তোলে। বহু ছাত্র ও যুবককে এইভাবে সি.পি.আই (এম) পার্টি আকৃষ্ট করে। '৬৬-তে মুড়াগাছা হাইস্কুলের শিক্ষকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্কুলে বহু ধর্মঘট হয়। স্কুলের ছাত্রদের রাজনৈতিক ভাবধারায় দীক্ষিত করবার ব্যাপারে স্থানীয় দাদাদের ইমেজ ও প্রভাব খুবই কাজে লাগে। ফলে বামপন্থী আন্দোলনে ব্যাপক ছাত্রদের টেনে আনতে যেমন বিশেষ কষ্ট করতে হয়নি, তেমনই শুধুমাত্র দেখে অনুপ্রাণিত হয়েই, বামপন্থার বিশেষ কিছু না বুঝেই ব্যাপক যুব-ছাত্রদের দল, আন্দোলনে সামিল হয়। এমনকি সে সময়ের তীব্র খাদ্যসংকট কিছু কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন ছাত্রকেও খাদ্য-আন্দোলনে সামিল করে। মুড়াগাছার পরবর্তীকালের এক জঙ্গী নকশাল নেতার মতে—'৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের পরপরই জ্যোতি বসু যখন তড়িঘড়ি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আসেন ও কৃষ্ণনগর টাউন হল ময়দানের মিটিং-এ সাংগঠনিক ক্ষেত্রে নির্বাচনের ওপর জোর দেন, আন্দোলনকে পিঠ চাপড়িয়ে, তখন অধিকাংশ ছাত্রনেতাই হতাশ হন। সংগঠনের মধ্যে অনেকেই তখন দ্বিমত পোষণ করতে শুরু করেন।

নদীয়ার উত্তরে পলাশীপাড়ায় '৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। কৃষ্ণনগরের মিটিং বা মিছিলে বা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়া বা গ্রেপ্তার বরণ করা সবই হয়েছিল। সেসময় পলাশীপাড়ায় পুলিশের ওপর জনরোষ এমনই ছিল যে মিটিং-এ আই.বি এজেন্ট দেখলেই ধরে প্রহার চলত। লাগাতার দু-তিনমাস ব্যাপী আন্দোলন চলল। কৃষ্ণনগরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে নদীয়ার তৎকালীন জেলাশাসক রমারঞ্জন ভট্টাচার্য স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এক সভা আহ্বান করেছিলেন। কৃষ্ণনগরের শিক্ষাব্যবস্থার অচল পরিস্থিতি বন্ধ করার জন্যও কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সভা করেন।

এই যে ছাত্রসমাজের তুখোড় রাজনৈতিক সচেতনতা ও ঔচিত্যবোধ তা মধ্য ষাটের গোটা বাংলা জুড়েই ঘটনাপ্রবাহে প্রতিফলিত। ভেতরের কারণগুলো যথা সমাজের চারদিকে হতাশা, ভবিষ্যৎ অন্ধকার, মূল্যবোধের বিকৃতি, দারিদ্র, শিক্ষার সুযোগের অভাব আর সর্বোপরি খাদ্য সংকট—এসব ছাড়াও আন্তর্জাতিক অবস্থাটাও ছাপ ফেলেছিল যথেষ্ট। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মহাবিতর্ক ছাড়াও বিপ্লবী যুদ্ধ হিসাবে ভিয়েতনামের লড়াই-এর প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী। এই প্রসঙ্গে একটা সংবাদের কথা উল্লেখ করা যায়। *১০ই জুলাই ১৯৬৬ সালে 'নবদ্বীপ বার্ত্তায়'* প্রকাশিত একটি খবর চোখে পড়ে—"গত ৫ই জুলাই নবদ্বীপ শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিভিন্ন মাধ্যমিক ও কোনো

কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন বোমা বর্ষণের প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করে।" এই যে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ছাপ তখনকার অগ্রণী ছাত্র যুব কর্মীদের মনে পড়েছিল তারা তাকে বোঝবার, উপলব্ধি করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল।[৩৫]

যাই হোক খাদ্য আন্দোলনের চাপে সাফল্য বলতে একটা জিনিষই হাতে পাওয়া গেল—সেটা হল বন্দীমুক্তি। এই বন্দীমুক্তি কার্যত সরকারকে বাধ্য হয়েই দিতে হয়েছিল। প্রথমে মুক্তি পান জ্যোতি বসু। ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারত রক্ষা আইনে ধৃত আটক কমিউনিস্ট বন্দীরা মুক্তি পেয়ে যান। জ্যোতি বসু মুক্তি পেয়েই কৃষ্ণনগরে আসেন এবং অন্যান্য কাজের সঙ্গে গণরোষে নিহত সাব-ইন্সপেক্টর যতীন দত্তের বাড়ীও যান। প্রকাশ্য একটি সভা হয়, সেই সভায় উৎপল দত্তও আসেন। জ্যোতি বসু খাদ্য সমস্যা নিয়ে কথা না বলে, আগামী নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন। হরিনারায়ণ অধিকারী তাঁর বইতেও এ সম্পর্কে বলেছেন "...পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব লাগাতার সংগ্রামের কর্মসূচীর দিকে না গিয়ে পরিস্থিতি মূল্যায়নের নামে এক অদ্ভুত নীরবতা গ্রহণ করেছিলেন। অনেকের এই নীরবতা সম্পর্কে অনুমান ঃ কলিকাতা ৭ম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠানের আগেই 'কট্টর বামপন্থী' নেতৃবৃন্দের অনেককে জেলে আটক করা হয়, ফলে পার্টি কংগ্রেসের নেতৃত্ব চলে যায় মূলতঃ মধ্যপন্থীদের হাতে। সুতরাং জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ঐ 'কট্টর বামপন্থী' অংশ নীরবতা অবলম্বন করে আসলে তাঁদের পক্ষীয় এবং বিপক্ষীয় তথ্য অনুসন্ধানে সময় নিয়োগ করেন। যা আসলে সেই পুরানো গোষ্ঠীতান্ত্রিকতার নামান্তর ও পুনরাবৃত্তি।" শুধু তাই নয় "আসলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে বলেই আমরাই প্রকৃত "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি" থেকে সি.পি.আই (এম)-এ বিবর্তন। সুতরাং নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব তাঁদের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়েই ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝিতেই একমত হয়েছিলেন—তাতে কোন সন্দেহ নেই।"[৩৬]

"The uncommon militancy of the food movement of March '66 which was to a great extent a spontaneous outbursts of anger, greatly encouraged the extremists but they were rather disappointed to find that this militancy was harnessed by the left parties to win the general elections."[৩৭] এই মনোভাব সাধারণভাবে কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যে ছড়ালেও সাধারণ মানুষ ১৯৬৭-র চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনকে স্বাগত জানিয়েছিল। এই নির্বাচন ভারতীয় কমিউনিস্ট দল দুটির প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনে, স্বাধীনোত্তর ভারতে কংগ্রেসী সরকারগুলির পতন নিশ্চিত করতে, কমিউনিস্টদের এক বৃহৎ অংশের ভবিষ্যৎ ভাঙনের রাস্তা প্রশস্ত করতে এবং সর্বোপরি নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছাকে বাস্তবে প্রতিফলিত করতে এক নির্ধারকের ভূমিকা নিয়েছিল।

কিন্তু তার আগে অর্থাৎ সাতষট্টির নির্বাচন ঘটার আগেই কিভাবে নদীয়ার বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিস্ট মহলে বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ ঘটছিল তা পর্যালোচনা করা যাক।

কৃষ্ণনগর শহরে কমিউনিস্টদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংগঠিত শ্রমিক ফ্রন্টে যাঁরা

নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংগঠনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মনীন্দ্রনাথ বাগ, বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নও এঁরই অধীনে ছিল। কালো দত্ত ছিলেন মটর ইউনিয়নে। এই ফ্রন্টে রামু ব্যানার্জী, নাদু চ্যাটার্জীও কাজ করতেন। এছাড়া মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী ইউনিয়নও নাদু চ্যাটার্জীরই অধীনে ছিল। নাদু চ্যাটার্জী সে সময় শহর কমিটির সম্পাদকও বটে। যাঁদের নাম করা হল, তাঁরাই মূলতঃ শহরের যুব ছাত্রদের কাছের লোক ছিলেন। বিশেষ করে নাদু চ্যাটার্জী প্রায় সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং নেতাসুলভ অহমিকাবিহীন এক 'দাদা' ছিলেন। নদীয়ার বহু জায়গায় যেমন হয়েছে, 'পাড়ায়' জনপ্রিয়তার ইমেজ থেকে অনেক নেতাই উঠে এসেছেন। শান্তিপুরে কালাচাঁদ দালালও একইভাবে যুবকদের কাছে বহু পরিচিত মুখ ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কর্মী নাদু চ্যাটার্জী অল বেঙ্গল পুলিশ সংগঠনের স্ট্রাইকে সক্রিয় অংশ নেওয়ায় তাঁকে প্রথমে সাসপেণ্ড করা হয় এবং পরে আট মাসের জন্য অন্তরীণ থাকেন। কৃষ্ণনগরে ফিরে এসে স্থানীয়-পাড়ার কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের (মিহির শীল, ভদু চাটুয্যে) সংস্পর্শে তিনি ধীরে ধীরে বাম রাজনীতির দিকে ঝোঁকেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। বরাবরই সমসাময়িক জেলা নেতৃত্ব থেকে নাদু চ্যাটার্জী একটু আলাদাভাবে কাজ করতে পছন্দ করতেন। জেলা নেতৃত্বের গান্ধীবাদী আইন অমান্য আন্দোলন-সুলভ খাদ্য আন্দোলনকে '৬৬ সালে তুঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য নাদু চ্যাটার্জীর নেতৃত্ব অবিসংবাদীভাবে দায়ী ছিল এবং এইভাবেই পরবর্তীকালে মাওবাদী আন্দোলনে নদীয়া জেলায় নেতা হিসাবে নাদু চ্যাটার্জীর আত্মপ্রকাশের শুরু হয়েছিল।

১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কারণটির কোন সমাধান হয়নি। খাদ্যের অভাব বা মূল্যবৃদ্ধি বা মজুতদারি কোনটির দিকেই তখন সি.পি.আই (এম) নেতাদের তাকিয়ে বা ভেবে দেখার সময় ছিল না। তাঁরা ছেষট্টির সেপ্টেম্বরে বাহাত্তর ঘণ্টা ভারত বনধের ডাক দিলেন সবই আসন্ন নির্বাচনের স্বার্থে। বন্‌ধ ডেকে আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার এও আরেক গান্ধীবাদী কৌশল বলে সন্দেহ করলেন অনেকেই। যাইহোক তখনও অব্দি বাম কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের বা কর্মীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই পদক্ষেপ নিয়ে কোন প্রকাশ্য সমালোচনা হয় নি। কিংবা বিরুদ্ধে থেকেই বিকল্পটা বার করার সচেতনতা বা বাস্তব অবস্থা তৈরী হয়নি তখনও। বন্‌ধের জন্য কর্মীরা প্রস্তুতিও নেন। চাকদহের পুরনো সি.পি.আই (এম) নেতা সৌরেন পাল জানান যে সেসময় সি.পি.এম কোন আন্দোলনের ডাক দিলে তার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে প্রায় মাসখানেক ধরে গ্রামে যাওয়া, সেখানকার হাটগুলোতে হাটসভা করা, গ্রামের মাটির কুঁড়ের দেওয়াল বা গাছে পোস্টার মারার কাজ চলত। এইভাবে চাকদহের শুধু মিউনিসিপ্যাল এলাকাই নয়---চারদিকের গ্রামগুলোতে সি.পি.আই (এম)-র ভিত শক্ত হতে শুরু করে।

সাতষট্টির নির্বাচনের আগে পার্টির সভ্যদের একাংশে প্রচলিত নির্বাচন-বিরোধী মনোভাবকে কৌশলে দমিয়ে রাখার জন্য নেতৃত্ব কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, যেমন বলা হয়, নির্বাচনে সংশোধনবাদীদের সাথে এবং কংগ্রেসের দলত্যাগী কোন অংশের সঙ্গে নির্বাচনী

ফ্রন্ট, আঁতাত, বোঝাপড়া বা ঐক্য ইত্যাদি জাতীয় কোন কিছুই করা হবে না। কিংবা প্রকৃত বামপন্থী শক্তি ও গণতান্ত্রিক শক্তির স্বার্থে "জনগণতান্ত্রিক মোর্চার আদর্শে" নির্বাচনী ঐক্য গড়া হবে। পার্টির এই কৌশলগত অবস্থানের ফলে পশ্চিমবাংলায় শাসকগোষ্ঠী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দুই ফ্রন্ট গঠিত হল। সি.পি.আই (এম)-এর নেতৃত্বে সংযুক্ত বামফ্রন্ট (ইউ.এল.এফ) এবং সি.পি.আই-এর নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস সহ বা প্রগতিশীল সংযুক্ত বামফ্রন্ট। পশ্চিমবাংলার মধ্য কৃষকদের প্রতিনিধি হিসাবে অজয় মুখার্জী ও সুশীল ধাড়া ১৯৬৭-র নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ছেড়ে বাংলা কংগ্রেস গঠন করে কংগ্রেস সরকারকে পরাজিত করার আহ্বান জানান। এই যে নির্বাচন প্রাক্কালে কংগ্রেস বিরোধী শিবির দুটি বামপন্থী শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়—তাদের দুই পক্ষের মধ্যে তিক্ততা কংগ্রেসের চেয়েও বেশী হয়ে দাঁড়ায়।

রাজ্যরাজনীতির এই প্রেক্ষাপটে জেলার বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনী স্নায়ুযুদ্ধ চলেছিল। প্রথমে কৃষ্ণনগরের কথা। কৃষ্ণনগর (পশ্চিম) বিধানসভা আসনে প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে কিছু অসুবিধা হয়। কৃষ্ণনগর (পশ্চিম) অর্থাৎ ধুবুলিয়া এলাকায় সি.পি.আই (এম)-এর ভিত শক্ত করার তাগিদে কৃষ্ণনগরের কর্মীরা ওখানে অমৃতেন্দু মুখার্জীকে চাইছিলেন। অপরপক্ষে এস.এস.পি. (কৃষ্ণনগরের কাশীকান্ত মৈত্র যে পার্টির নেতা ছিলেন)-এর পক্ষ থেকে সত্য দাশগুপ্তকে ওই আসন দেওয়ার দাবি উঠেছিল। অবশেষে কৃষ্ণনগর পশ্চিমে অমৃতেন্দু মুখার্জীকেই দাঁড় করানো হল এবং সি.পি.আই (এম)-ই ওই আসন দখল করে।

শান্তিপুরে খাদ্য আন্দোলনের পর থেকে অজয় ভট্টাচার্য ও তাঁর গোষ্ঠী সমালোচিত হন। '৬৬-তে তিনি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যপদ ত্যাগ করেন এবং বিভিন্ন স্থানে খাদ্য লুটে নেতৃত্ব দেন। ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে অজয় ভট্টাচার্য-কালাচাঁদ দালাল-গোষ্ঠী শহর কমিটির প্রসাদ থেকে সরে যেতে থাকেন। অপর দিকে ধীরেন বসাক এই সময় শহর কমিটিতে নেতৃত্ব কায়েম করার ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে এগোচ্ছিলেন। '৬৭-র নির্বাচনে অজয় ভট্টাচার্য-র সম্ভাব্য প্রার্থীপদ আটকানোর জন্য ধীরেন বসাক প্রার্থী হিসাবে কানাই পাল-এর নাম প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব জেলা নেতৃত্বের কাছেও মনঃপুত হয় সঙ্গত কারণেই, কানাই পাল আর.সি.পি.আই-র সদস্য হওয়া সত্ত্বেও। অপরদিকে অজয় ভট্টাচার্য গোষ্ঠী এই সিদ্ধান্তর প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদে তাঁদের অনুগত বৈদ্যনাথ প্রামাণিক নামে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির এক কর্মীকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করিয়ে দেন। এর ফলে ধীরেন বসাক জেলা নেতৃত্বের কাছাকাছি আসার সুযোগ পান। নির্বাচনে কানাই পাল জেতেন। শান্তিপুরের কমিউনিস্ট ক্যাডাররা যাঁরা একজন সি.পি.আই (এম) প্রার্থীকেই চেয়েছিলেন সাতষট্টির নির্বাচনে, শান্তিপুরে প্রচারের কাজ না করে, রাণাঘাটে গৌর কুণ্ডুর হয়ে কাজ করতে যান। এমনকি এই বিক্ষুব্ধ কর্মীরা শান্তিপুরে অমৃতেন্দু মুখার্জী নির্বাচনী প্রচারে এলে তাঁকে স্টেশনে আটকেও দেয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচনে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের অভিযোগে অজয় ভট্টাচার্য গোষ্ঠীকে সি.পি.আই (এম) শো-কজ করে। এই শো-কজের

কোনো উত্তর যায় নি। যেহেতু শান্তিপুর শহরে এলাকাভিত্তিক কাজকর্মের জন্য অজয় ভট্টাচার্য গোষ্ঠীর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ও গণসমর্থন ছিল, সেই কারণেই এই গোষ্ঠী পার্টির নেতৃত্বকে এইভাবে অগ্রাহ্য করার সাহস দেখান। শান্তিপুরে এইসময় বিক্ষুব্ধ সি.পি.আই (এম) কর্মীদের মধ্যে ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য, কেষ্ট ঘোষ, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়সহ আরও অনেকে। এঁরা ধীরে ধীরে শান্তিপুরে মার্কসবাদী প্রচার সমিতি গড়ে তোলেন ও সি.পি.আই (এম) নেতৃত্ব বিরোধী একটা কেন্দ্র হিসাবে কাজকর্ম শুরু করেন। পরবর্তীকালে নকশালবাড়ী রাজনীতির কেন্দ্র হিসাবে শান্তিপুরে এই সমিতি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

নবদ্বীপে ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনের পরপরই রাজনৈতিক মহলে একটা গুজব ওঠে যে দেবী বসুকে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। কারণ হিসাবে যেগুলো শোনা গিয়েছিল সেগুলি এই—আনন্দবাজার পত্রিকায় পার্টি বিরোধী বিবৃতি দান, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ যোগাযোগ, গ্রেপ্তারী এড়াবার জন্য পার্টি নির্দেশ অমান্য করে বিধানসভায় অনুপস্থিতি—এসব কারণেই পার্টি তাঁকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে শোনা যায়।[৩৮] গুজবের সত্যতা অপ্রমাণিত হলেও একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেল প্রার্থী নির্বাচনে। বাষট্টি সালের ডাকসাইটে এম.এল.এ দেবী বসু-র বদলে নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রে সাতষট্টিতে সি.পি.আই (এম) প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করানো হল কৃষক ফ্রন্টের নেতা কানাই কুণ্ডুকে। সাতষট্টির নির্বাচনী ফলাফলে গোটা দেশব্যাপী কংগ্রেসের ভরাডুবির মধ্যে দ্বীপের মতো জেগে রইল নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্র। এখান থেকে কংগ্রেস প্রার্থী শচীন্দ্র মোহন নন্দী জিতলেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, কানাই কুণ্ডু হেরেছিলেন নবদ্বীপ শহরে ভোট কম পাওয়ায় এবং নবদ্বীপ শহরে কমিউনিস্ট পার্টি চিরকাল সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়ে এসেছে। স্থানীয় সংবাদপত্রে লেখা হল "নবদ্বীপ কেন্দ্রে গত তিনটি নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি যেসব এলাকায় বেশী সংখ্যক ভোট পেয়েছিল সে সব এলাকায় এইবার কমিউনিস্ট প্রার্থীর ভোট না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।"[৩৯] সুতরাং পার্টি কর্মীরা এখানেও অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনার কথা তুললেন। চাকদহ-তে সাতষট্টির নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী সুবল মণ্ডল দাঁড়ান ও জেতেন। এখানেও সি.পি.আই (এম) ক্যাডাররা অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে ভোটে প্রচার চালান।

নদীয়ার উত্তরাঞ্চলে তেহট্ট বিধানসভা আসন থেকে কংগ্রেসের শঙ্কর দাস ব্যানার্জী জেতেন। সেখানকার সি.পি.আই (এম) সাংগঠনিকভাবে তখনও যথেষ্ট দুর্বল ছিল। মনে রাখতে হবে অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রার্থী নদীয়ার এক বিত্তশালী জমিদার পরিবারের সন্তান ও স্বয়ং ব্যারিস্টার ছিলেন।

সাতষট্টির নির্বাচনে গোটা দেশে কংগ্রেস সরকার প্রত্যাখ্যাত হয়। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসবিরোধী গণরোষ ছিল তুঙ্গে। সেই উচ্ছ্বাসের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল মানুষের আচরণে। এখানেও স্বতঃস্ফূর্ততার প্রকাশ। পাড়ায় পাড়ায় ল্যাম্পপোস্টের আলো লাল কাগজে মুড়ে দেওয়া হল, টাঙিয়ে দেওয়া হল কানা বেগুন ও কাঁচকলার ফেস্টুন। বিধানসভায় মোট

২৮০টি আসনের মধ্যে ১২৭ টি পেয়ে কংগ্রেস সংখ্যালঘু দলে পরিণত হল। নদীয়া জেলার ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যাবে এখানেও কংগ্রেসের শোচনীয় হার হয়। বিধানসভার চৌদ্দটি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পায় চারটি। বাকি দশটির মধ্যে বাংলা কংগ্রেস পায় পাঁচটি, দুইটি, সি.পি.আই (এম), একটি, সি.পি.আই, একটি এস.এস.পি. এবং একটি নির্দল।

কৃষ্ণনগর পূর্ব ও পশ্চিমে যথাক্রমে জেতেন কাশীকান্ত মৈত্র (এস.এস.পি) ও অমৃতেন্দু মুখার্জী (সি.পি.এম), শান্তিপুরে কানাই পাল সি.পি.এম সমর্থিত প্রার্থী হিসাবে, রাণাঘাট পূর্ব ও পশ্চিমে যথাক্রমে নিতাইপদ সরকার (সি.পি.আই) ও গৌর কুণ্ডু (সি.পি.আই (এম))।

পরের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে হরিনারায়ণ অধিকারীর বই থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক। "পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়াতে রাজ্য সরকার গঠনের দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। এই অবস্থায় রূপকথার গল্পের মত পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠনের নীরব প্রচেষ্টা শুরু হলো। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং দলত্যাগী কংগ্রেস নেতা হুমায়ুন কবির পর্দার আড়াল থেকে এই উদ্যোগ নিলেন। তিনি টেলিফোনে জ্যোতি বসুর সাথে যোগাযোগ করে দুই ফ্রন্ট মিলে কংগ্রেসবিরোধী সরকার গঠনের সম্ভাব্যতা ব্যাখ্যা করলেন। জ্যোতি বসু সি.পি.আই (এম)-এর অন্যান্য নেতাদের সাথে যোগাযোগ করলেন। হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখরা সম্মতি জানালেন, তার পরবর্তী ঘটনাবলীর ইতিহাস খুবই দ্রুতগতিসম্পন্ন। ইউ.এল.এফ এবং পি.ইউ.এল.এফ মিলে গঠিত হয়ে যায় যুক্তফ্রন্ট।"[৪০]

এইভাবে ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলন যে একটা সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিল, তার মৃত্যু ঘটল সাতষট্টির নির্বাচনে। তবু গতানুগতিক বামপন্থী আন্দোলনে ছেষট্টির আন্দোলন কয়েকটা তরঙ্গের সৃষ্টি করে, যা ভবিষ্যৎকে উজ্জীবিত করেছিল। এক, আন্দোলনকে তৃণমূল স্তরেই অনেক বেশী সফল করা যায়, পরিচিত পরিবেশে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করাটা অনেক সহজ। দুই, ব্যারিকেড পদ্ধতিতে লড়াই চালিয়ে ছাত্র-যুবকরা অনভিজ্ঞ হয়েও লক্ষ্যে সফল, আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ। তিন, জেলা ও আঞ্চলিক স্তরের নেতাদের প্রভাবও শক্তি বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনমাফিক ওপরতলার নেতৃত্বের নির্দেশ ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দৃঢ়তা; এবং চার, সবচেয়ে বড়ো কথা, জনগণ আর প্রচলিত কায়দায় শাসন-শোষণ মেনে নিতে চাইছেন না—বিপ্লবের সপক্ষে লেনিনের[৪১] এই উক্তির সঙ্গে তৎকালীন প্রেক্ষাপটকে যাচাই করে নেওয়া।

এই সংগ্রামী বাতাবরণকে অস্বীকার করার উপায় ছিল না বলেই নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্লোগান হল "যুক্তফ্রন্ট সরকার, সংগ্রামের হাতিয়ার।" শাসকশ্রেণীর এই আপাতঃ বিপ্লবী চরিত্র ও তার প্রতিক্রিয়া অচিরেই পশ্চিমবাংলায় নিয়ে এল এক অভাবিত 'প্রত্যাশা-বিস্ফোরণের ইতিহাস।'

সূত্র নির্দেশ

১ *হরিনারায়ণ অধিকারী ঃ ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও কিছু ঘটনাবলী,* দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, প্রথম মুদ্রণ, অক্টোবর, ১৯৮৮, প্রকাশক ঃ 'মার্কসবাদী ফোরাম' এর পক্ষে হরিপদ মুখার্জী, পৃষ্ঠা-১৮;

২ *আজিজুল হক ঃ "নকশালবাড়ি ঃ বিক্ষোভ-বিদ্রোহ-বিপ্লব এবং রাশিয়া,* ইণ্ডিয়ান প্রগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৫৬;

৩ *হরিনারায়ণ অধিকারী ঃ তদেব,* পৃষ্ঠা-২৩;

৪ *গোবিন কাঁড়ার ঃ প্রবন্ধ ঃ 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে ভাঙার পূর্বমুহূর্তে দমদম কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরের দিনগুলি', "কমিউনিস্ট ভাঙন ও বিরোধ ঃ শেষ কোথায়",* র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব, নভেম্বর, '৯৩, পৃষ্ঠা-২-৩;

৫ *'পৃথ্বীরাজের দলিল'* যা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থেকে ছদ্মনামে *সমর মুখার্জীর* লেখা;

৬ *হরিনারায়ণ অধিকারী, তদেব,* পৃষ্ঠা-২৮;

৭ Resolutions of the Tenali convention of the Communist Party of India (Marxist)—সূত্র ঃ *তদেব,* পৃষ্ঠা-৫৫;

৮ *দেশহিতৈষী* ঃ ৬ নভেম্বর, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা-২;

৯ *তদেব,* পৃষ্ঠা-২;

১০ *তদেব,* পৃষ্ঠা-১৩ (এখানে কংগ্রেস শুরু হওয়ার আগে ভারতরক্ষা আইনে কমিউনিস্টদের একটা অংশকে গ্রেপ্তারের কথা বলা হয়েছে।)

১১ *মন্তব্য ঃ* তেমনই অমৃতেন্দু মুখার্জীও যে সি.পি.আই (এম)-এ যোগ দেবেন, তাও পরিষ্কার জানা ছিল না। সি.পি.আই.-তে থেকে যাওয়ার পর সুশীল চ্যাটার্জী কর্মীর অভাবে প্রায় অকেজো হয়ে পড়েন, কিন্তু কমিউনিস্ট মহলে শ্রদ্ধার আসনটি অক্ষুন্ন রাখেন। সুশীল চ্যাটার্জী দক্ষ সাংগঠনিক হওয়ার সুবাদে, প্রাক্-বিভাজন পর্বে-কৌশলে তাঁকে প্রায়ই কৃষ্ণনগর থেকে দূরে হরিণঘাটায় পাঠিয়ে দেওয়া হত সংগঠনের কাজে। এখানে উল্লেখ্য যে, হরিণঘাটা দীর্ঘদিন ধরেই কংগ্রেসী ঘাঁটি ছিল। নদীয়ার বিভিন্ন কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাতে এই মন্তব্যগুলি বেরিয়ে এসেছে। এগুলি নদীয়ার কমিউনিস্ট মহলে প্রতিষ্ঠিত মতামত।

১২ যেমন অমৃতেন্দু মুখার্জী, কালাচাঁদ প্রামাণিক প্রমুখ;

১৩ বাস্তবিকই জঙ্গী উদ্বাস্তু আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টি দ্রুত তার সংগঠন বাড়িয়ে নেয়। যথেষ্ট গভীরভাবেই তখন বামপন্থী দলগুলি উদ্বাস্তুদের সমস্যাটি বুঝতে পেরেছিল ও তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

১৪ নবদ্বীপে *'প্রগতি পরিষদ'* ছিল মার্কসীয় দর্শন চর্চাকেন্দ্র। পরবর্তীকালে নকশালপন্থী রাজনীতির পক্ষে এই পরিষদের বহু কর্মীই কাজ করেন। পরে আলোচনাসূত্রে এই

পরিষদের কথা আরও এসেছে।

১৫ সেসময়ে *'নবদ্বীপ বার্তা'*-য় প্রকাশিত এটি ছাড়াও অপর একটি সংবাদ উদ্ধৃত করা হল ঃ "জনদরদী কমিউনিস্ট পার্টির নবদ্বীপ তথা পশ্চিমবঙ্গ শাখার নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তায় জনমন ক্ষুব্ধ ঃ মুখে মুখে কমিউনিস্টদের প্রতি ধিক্কার ঃ নবদ্বীপের জনগণ এক মিছিলে কমিউনিস্ট কমিশনারদের পদত্যাগ দাবী করেন। স্থানীয় কমিউনিস্ট এম. এল. এ দেবী বসুর কুশপুত্তলিকা পোড়ামাতলায় দাহ করা হয়।"

—৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬২, পৃষ্ঠা-১

১৬ নবদ্বীপের প্রয়াত সি.পি.আই (এম) নেতা *দেবী বসু*-র দেওয়া বিবৃতি অনুসারে লিখিত।

১৭ *'নবদ্বীপ বার্তা'*, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬২ পৃষ্ঠা-১;

১৮ চাকদহের পুরনো সি.পি.আই (এম) নেতা (বর্তমানে বিক্ষুব্ধ) *অরুণ ভট্টাচার্যের* লিখিত বিবৃতি থেকে উদ্ধৃত।

১৯ *রুবি ঃ 'আমরণ জাগরণ', শহীদ স্মরণে, সৈন্য,* ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-১৬;

২০ *Amiya Samanta : The Emerging Profile (vol. III)*, chap : Urban youths and Profile of a club, pp.27.
অমিয় সামন্ত চব্বিশ পরগণার পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট থাকাকালীন তিন খণ্ডে এই রিপোর্টে লিখেছিলেন, যা স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে একটি গোপন দলিল হিসাবে পেয়েছি। এটি অপ্রকাশিত।

২১ *রুবি ঃ তদেব,* পৃষ্ঠা-১৭, রুবি ভট্টাচার্য (রুবি (জয়শ্রী) ভট্টাচার্য হলেন প্রয়াত অজয় ভট্টাচার্যের স্ত্রী);

২২ *Amiya Samanta : Ibid,* pp. 27;

২৩ *তদেব,* পৃষ্ঠা-২৭;

২৪ তাঁতশিল্প সংক্রান্ত সমস্যা লিখিত হয়েছে শান্তিপুরের একদা নকশালপন্থী কর্মী, এখন তাঁত বুনে জীবিকা নির্বাহের কাজে যুক্ত বুলু চ্যাটার্জীর সাক্ষাৎকার থেকে;

২৫ *Amiya Samanta, ibid*; pp. 2-3;
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য *আজিজুল হক* এক জায়গায় লিখেছেন যে, "চৌষট্টির পর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে...কমিউনিস্ট না হওয়াটাই তখন পাপ, মার্কুইজ-দেব্‌রে পড়া মার্কসবাদীদের আবির্ভাবে বাজার ছেয়ে যায়।" *কারাগারে আঠারো বছর,* দে'জ পাবলিশিং বইমেলা ১৯৯০, পৃষ্ঠা-১২;
রবীন্দ্র রায় সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন এদেশে ষাটের দশকের ছাত্র অস্থিরতাকে ঃ ..."The leisure of the student life itself, as well as the leisure and comforts of the middle-class background of many students–inculcates at the sametime the possibility of speculation,

the formation of ideals (whether these are spiritual or worldly), and in many cases a boredom–an inability to utilize this leisure in a productive fashion on one's own. The absence of cares–as well as the associated lack of status–often encourages a hankering for responsibility and a partial distaste for student existence, no matter how enjoyable this life may be..."

তাঁর মতে ছাত্র সমাজের বৃহদংশ ভবিষ্যৎ পৃথিবীর যে চিত্রটা কল্পনা করে তা সবসময় তাদের পারিপার্শ্বিক দুনিয়ার তুলনা থেকেই উঠে আসে।

Rabindra Ray – 'The Naxalites and Their Ideology', Chap. Bengali Society, Oxford University Press, Delhi, 1988, pp. 74-75;

২৬ *কৌশিক ব্যানার্জী ঃ নকশালবাড়ী ও যুব ছাত্র আন্দোলন,* ভাষা, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯২ পৃষ্ঠা- ১০-১১;

উল্লম্ফন পর্ব

২৭ *নবদ্বীপ বার্তা,* ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬২, পৃষ্ঠা-১;

২৮ এই তথ্যগুলি *সাক্ষাৎকারের* ভিত্তিতে সংগৃহীত;

২৯ *হরিনারায়ণ অধিকারী, তদেব,* পৃষ্ঠা-৬;

৩০ এই সময় জেলার বিভিন্ন স্থানে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের সংখ্যা ঃ—

১০ই মার্চ, ১৯৬৬ অব্দি গ্রেপ্তারের সংখ্যা ছিল মোট ১০৭৮ জন, এর মধ্যে কৃষ্ণনগরে ৩৭৪ জন, শান্তিপুরে ১৫০, নবদ্বীপে ১৩৮ জন, রাণাঘাটে ৯৭, এবং অন্যান্য স্থানে ৩২৫জন। ২০শে মার্চ, ১৯৬৬ অব্দি জেলায় মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা ছিল ১৫০০ জন।

—*নবদ্বীপ বার্তা,* ২০শে মার্চ, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা-১০১২৮

৩১ সরাসরি খাদ্য-আন্দোলনের দিকে আঙুল না তুললেও কৃষ্ণনগরের *প্রাক্তন সি.পি.আই (এম) বিধায়ক সাধন চট্টোপাধ্যায়* মনে করেন যে নদীয়ায় চৌষট্টি-উত্তর পর্বে বামপন্থী নেতৃত্বের প্রথম সারির লোকজন জেলে থাকাকালীন যাঁরা ক্ষমতার স্বাদ পেলেন, তাঁরা অতিবিপ্লবী মানসিকতার লোক। নেতারা জেলে থাকায় এঁরা ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার কাজটি সারেন। অন্যদিকে নবদ্বীপ প্রগতি পরিষদের সদস্য *মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য* মনে করেন যে নেতারা জেলে থাকায় লাভ এই হয় যে পিছন থেকে টেনে ধরার কেউ ছিল না বলে আন্দোলন এত উত্তুঙ্গে উঠতে পেরেছিল।

৩২ এই মন্তব্য তুলে দেওয়া হয়েছে *হরিনারায়ণ অধিকারীর* পূর্বোক্ত বই (পৃষ্ঠা ৮২) থেকে, যেখানে তিনি আরও বলেছেন যে, পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য ও নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক অমৃতেন্দু মুখার্জী (গদাদা)-র নাম জড়িয়ে তখন এই প্রচার চলত।

৩৩ মন্তব্যটি *সাক্ষাৎকারের* ভিত্তিতে গৃহীত ও প্রাসঙ্গিক বলে এখানে দেওয়া হল।

৩৪ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে 'বিপ্লবের' চেহারাটা ভীষণভাবে পৌরুষ, মেয়েদের 'বিপ্লবী' ইমেজ সে সময় তো বটেই, আজও যেন কিছুটা অস্বাভাবিক। সমাজে লিঙ্গ-বৈষম্যের যে বহুরকম দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায় তারই একটা দিক দেখা যায় রাণাঘাটের ছেলেদের উদ্দেশ্যে এই 'শাঁখা-শাড়ী' পাঠানোয়, বিপ্লব-বিদ্রোহে অংশগ্রহণ যেন ছেলেদের একচেটিয়া; অন্যভাবে, এই কাজে না অংশ নেওয়ায় মেয়েলিপনা ফুটে ওঠে। যুগে যুগে সংগ্রামে মেয়েদের অংশগ্রহণ ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেয়ে যেন 'মিথ্' হয়ে গেছে, তাঁরা হয়ে গেছেন ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত।

৩৫ ১৯৭১ সালে সংগৃহীত একটি তথ্য থেকে নদীয়া জেলার দুটি স্থানের স্বাক্ষরতার কিছু তুলনামূলক হিসাব প্রসঙ্গক্রমে এখানে তুলে দেওয়া হল।

		শহর	গ্রাম	সার্বিক
কৃষ্ণনগর	ঃ	৬৫.৩%	২৪.৬%	৩৭.৪%
নবদ্বীপ	ঃ	৫৫.৬%	২৪.৭%	৪২.৯%

সার্বিক স্বাক্ষরতার হিসাবে কল্যাণী, রাণাঘাট ও চাকদহ-র অবস্থান ছিল যথাক্রমে ৫০.৬%, ৪১.০%, ৪০.৭%.

সূত্র ঃ *Census Report, West Bengal, Part IIA, 1971 Series 22;*

৩৬ *হরিনারায়ণ অধিকারী ঃ তদেব,* পৃষ্ঠা - ৮৩-৮৪;

৩৭ *Amiya Samanta, ibid*, pp. 2-3;
প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, এইভাবে জনগণের বিপ্লবী মেজাজের জন্য ধন্যবাদ জানানো হল, কিন্তু তাকে সমীহ করা হল না।

৩৮ *নবদ্বীপ বার্তা,* ২৮ আগস্ট, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা -১;

৩৯ *তদেব,* ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা - ১;

৪০ *হরিনারায়ণ অধিকারী, তদেব,* পৃষ্ঠা - ৮৫;

৪১ *Lenin, V.I. : 'Left-wing Communism – An Infantile Disorder' :* Collected Works, Vol. III, Progress Publishers, Moscow, pp. 84-85.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নকশালবাড়ির ঘটনা ঃ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে ও নেপথ্যে; নদীয়ায় মাওবাদ-এর আবির্ভাব

১৯৬৭ সালের মে মাসে উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি এলাকায় চা-বাগিচা মালিক ও জোতদারদের বেনামী জমি দখলের সংগ্রাম শুরু হয়। পার্টির দার্জিলিং জেলা কমিটির নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষকদের এই জঙ্গী আন্দোলন এলাকার ভূস্বামীদের আতঙ্কিত করে তোলে এবং সেই সঙ্গেই গোটা যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে একটা বিরাট সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। 'জমি উদ্ধারের' স্লোগানকে সামনে রাখলেও মূলতঃ সিদ্ধান্ত হয় ঐ অঞ্চলে (নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া— তিনটে থানায়) সামন্ত কর্তৃত্ব উচ্ছেদ করে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। মহকুমা কৃষক সভার সভাপতি ছিলেন জঙ্গল সাঁওতাল। ১৯৬৭ সালের ২০ শে মে থেকে ২২ শে মে কৃষকরা প্রসাদজোতে বেনামী জমির ওপর দখল নেন। ২৪শে মে পুলিশ সেই জমি পুনরুদ্ধার করতে গেলে কৃষকদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। বরকা মাঝি, ত্রিবেণীকানু, শোভান আলি সহ ১০ জন কৃষক রমনী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। ২৫ শে মে কৃষকরা পুলিশ সাব-ইন্সপেকটর সোনম ওয়াংদিকে হত্যা করে। গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠতে শুরু করে 'কৃষক কমিটি'। সমগ্র অঞ্চলে জোতদারের কর্ত্তৃত্ব সংকটের মুখোমুখি হল। ফলতঃ চাপ সৃষ্টি হল যুক্তফ্রন্ট সরকারের ওপর।

সাতষট্টির প্রাক-নির্বাচন পর্বে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে একটা রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। গ্রামাঞ্চলের মধ্যকৃষকদের প্রতিনিধি হিসাবে পশ্চিমবাংলার অজয় মুখার্জী ও সুশীল ধাড়া সাধারণ নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ছেড়ে বাংলা কংগ্রেস গঠন করে কংগ্রেস সরকারকে পরাজিত করার আহ্বান রাখেন।[১] নির্বাচনোত্তর পবিস্থিতিতে যেহেতু সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি হিসাবের বাইরে চলে যায়, সেহেতু সি.পি.আই.(এম) 'বিদ্রোহী বা বিক্ষুব্ধ কিংবা দলত্যাগী কংগ্রেসের সঙ্গে মোর্চা বা ফ্রন্ট বা সমঝোতা নয়'-পার্টিতে গৃহীত এই লাইন পরিবর্তন করে বিদ্রোহী কংগ্রেসী দল বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দেয়। অজয় মুখার্জী হলেন মুখ্যমন্ত্রী;স্বরাষ্ট্র, পুলিশ দফতর থাকল তাঁবই হাতে। জ্যোতি বসু হলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী, হরেকৃষ্ণ কোঙার হলেন ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী। শুরু থেকেই যুক্তফ্রন্ট সরকারে শুরু হয়ে গেল সূক্ষ্ম স্নায়ুযুদ্ধ।

অজয় মুখার্জী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় গ্রাম শহরের জোতদার শ্রেণী, ভূস্বামী, ধনী কৃষক, মিল মালিক এবং অন্যান্য ধনিক গোষ্ঠী কংগ্রেস থেকে তাঁদের আনুগত্য সরিয়ে বাংলা কংগ্রেসে আনল। উত্তর বঙ্গে উৎখাত হওয়া জোতদারদের হয়ে তাদের শ্রেণী প্রতিনিধিরা চাপ সৃষ্টি করল অজয় মুখার্জীর উপর। অন্যদিকে সি.পি.আই.(এম)-র রাজ্য নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তরে

চিন্তাভাবনার এক সূক্ষ্ম বিরোধ চলতে থাকে। এখানেও সেই আপোষকামী, প্রশাসনের অংশীদার, মধ্যপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে বামপন্থী, দলকেন্দ্রিক নেতৃত্বের চাপা সংঘাত। *হরিনারায়ণ অধিকারী* তাঁর বইতে লিখেছেন —"হরেকৃষ্ণ কোঙার যখন বলছেন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হাতিয়ার করে জমির লড়াই তীব্র করতে হবে, তখন প্রমোদ দাশগুপ্ত বলছেন যুক্তফ্রন্ট সরকারে জোতদার, মিলমালিক প্রভৃতি কায়েমী স্বার্থ ও শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধিরাও রয়েছে, লড়াই চালাতে হবে তাদের বিরুদ্ধেও। জ্যোতি বসু চাপা ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে বলছেন —তাহলে যুক্তফ্রন্ট সরকার টিকে থাকবে কি করে। সি.পি.আই.(এম)-এর নেতৃত্বের শীর্ষস্তরে অপ্রকাশ্য এই চাপা বিরোধ ছিল।"[২] ফলে নকশালবাড়ির ঘটনার সংবাদ মহাকরণে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী সি.পি.আই.(এম)-কে দায়ী করে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিলেন। সি.পি.আই.(এম) পড়ল বিপদে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, আমূল ভূমি সংস্কার, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এবং একচেটিয়া পুঁজি বাজেয়াপ্ত করার ধ্বনি দিয়ে দলের নেতারা কর্মীদের উজ্জীবিত করেছিলেন। এই ধ্বনি নিয়ে কর্মী ও সাধারণ মানুষ এগিয়ে যেতে থাকলে সরকার টিকে থাকে না বা সরকার থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। সি.পি.আই.(এম)-এর চরিত্র বিপ্লবী কিনা তার আসল পরীক্ষা প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলেই শুরু হয়ে যায়। দলটি পুলিশী দমনের পক্ষে রায় দিতে পারছে না —পারছে না সরকারের পতন ডেকে আনতে। সরকারে থেকে সংস্কারের রাজনীতি যা সি.পি.আই.(এম)-র কর্মসূচীতে লুকিয়ে ছিল, তা প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায় দল বিপদে পড়ে। প্রথম দিকে নকশালবাড়ির জমি দখলের আন্দোলনের খবর সি.পি.আই.(এম)-র কেন্দ্রীয় মুখপত্র *পিপলস ডেমোক্রেসি*-তে প্রকাশিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়।[৩] কিন্তু মন্ত্রীত্ব টিকিয়ে রাখার তৎপরতায় এই পরিকল্পনা কার্যকরী হয়নি। আসলে নকশালবাড়ির বেনামী জমি উদ্ধারের সংগ্রামকে সমর্থন করা, না করা নিয়ে পার্টি নেতৃত্বে মত বিরোধ ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল সন্দেহ নেই। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার কালনা থেকে সাতষট্টির নির্বাচনে জয়ী হওয়ার আগে বহু ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, ভূমি আইন সংস্কার করে কিছু কাজের কাজ হয় না। "...He on many occasions, spoke about the futility of land reform laws, as they could not be properly implemented through bureaucratic machinery. In the Autumn number of Deshhitaishi - 1373 B.S. (1966), only a few months before his induction into the cabinet as land and land revenue Minister, he wrote – "The Ruling class and the Bourgeois economists advocate land reform for social justice and for reformation in social structure, by shrewdly sabotaging real land reform through peasant's democratic movement. The revisionists of our country are also indirectly helping this progaganda of the ruling class in favour of land reform."[৪] বাস্তবিকই মন্ত্রী হওয়ার পরও হরেকৃষ্ণ কোঙার বিভিন্ন জেলায় সি.পি.আই.(এম) কর্মীদের নির্দেশ দেন লুকানো অর্থাৎ বেনামী জমি উদ্ধারে ও বিলি বন্টনের

কাজে। বেনামী জমি চিহ্নিত করে সেখানে লাল ঝাণ্ডা পুঁতে দেওয়া হত। কিন্তু সরকার রক্ষার তৎপরতায় মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে জুন মাসে হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিশ্বনাথ মুখার্জী ও সুশীল ধাড়া (এই তিনজনের দলীয় প্রতিনিধিত্ব মনে রাখতে হবে)-কে নিয়ে মন্ত্রী মিশন গঠিত হল। এই মিশনের আরো তিনজন সদস্য ছিলেন অমর চক্রবর্ত্তী, ননী ভট্টাচার্য ও দেওপ্রকাশ রাই। এই মিশন শিলিগুড়ি লোকাল কমিটিকে ভূমি দখলের সশস্ত্র আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়ে শেষে 'ম্যান্ডেট' জারী করে চলে আসেন। মনে রাখতে হবে উত্তরবঙ্গে বেনামী জমির দখলের আন্দোলন ছিল প্রচণ্ড জঙ্গী। ১৯৫৯ সাল থেকেই শিলিগুড়ি মহকুমার তিনটি থানা এলাকায় বেনামী জমি দখলের আন্দোলন শুরু হয়েছিল —যদিও পরে এই আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গের একজন জঙ্গী 'কমরেড' হিসাবে চারু মজুমদার তখন থেকেই 'ক্ষুদে গেরিলা' বলে খ্যাত হয়েছিলেন।[৫]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য চারু মজুমদার ১৯৬৪-র পার্টি সম্মেলনে প্রথম তাঁর বক্তব্য রেখে পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা প্রকাশ্যে আনেন। যদিও তখনও তিনি কোনও দলিল দেননি। তাঁর বক্তব্য মূলগত ভাবে ছিল এই —(ক) বর্ত্তমান যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল মাও সে-তুঙ চিন্তাধারা, (খ) ভারতের সর্বত্র বিপ্লবী অবস্থা আছে, (গ) এলাকাভিত্তিক ক্ষমতাদখলই ভারতীয় বিপ্লবের এগোবার মাধ্যম, নির্বাচন নয়, (ঘ) কেবলমাত্র গেরিলা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই বিপ্লবের বিকাশ ও অগ্রগতি সম্ভব। ১৯৬৫ সাল থেকে ভারতে কৃষি বিপ্লবের ওপর তিনি রাজনৈতিক দলিল লেখা শুরু করেন —যেগুলি পার্টির অভ্যন্তরে আলোচিত হওয়ার আগেই বাইরে প্রকাশ হয়ে যায়। এই নিয়ে তৎকালীন পার্টির রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তর সঙ্গে চারু মজুমদারের তীব্র বিরোধও সৃষ্টি হয়।[৬] ১৯৬৭-র এপ্রিল মাসে তাঁর অষ্টম ও শেষ দলিলে চারু মজুমদার হরেকৃষ্ণ কোঙার-এর নির্দেশিত ভূমি রাজস্ব নীতিকে তীব্র আক্রমণ করেন। হরেকৃষ্ণ কোঙার মন্ত্রী হয়ে জমির বিরোধ জে.এল.আর.ও-র মাধ্যমে মীমাংসার ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। চারু মজুমদার লিখলেন —"...তিনি (হরেকৃষ্ণ কোঙার) প্রথমে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে সমস্ত ভেস্ট জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করবেন। তারপর তার পরিমানটা কমে গেল। শেষে জানালেন যে, এ বছর যেমন আছে তেমন থাকবে। খাজনামাপের ব্যাপ্যারটা জে.এল.আর.ও.-দের দয়াতে ছেড়ে দেওয়া হল। কৃষককে পথ বাতলানো হল দরখাস্ত করার এবং বলা হল কৃষকের জোর করে জমি দখল করা চলবে না। হরেকৃষ্ণবাবু শুধু কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য নন —তিনি বাংলাদেশের কৃষকসভারও সম্পাদক। তাঁরই কৃষকসভার ডাকে গত ১৯৫৯ সালে কৃষক ভেস্ট জমি ও বেনামী জমি ধরার আন্দোলন চালিয়েছিল। সরকার জমির মালিকদের স্বার্থে দমননীতি চালিয়েছে, উচ্ছেদের রায় দিয়েছে, তবু কৃষক অনেক ক্ষেত্রে সে জমি ছাড়েনি —গ্রামের একতার জোরে দখল রেখেছে। কৃষক সভার নেতা মন্ত্রী হওয়ার পর কি তাদের আন্দোলনকে সমর্থন করলেন?"[৭] ওই একই দলিলে —ভেস্ট জমির আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে অর্থনীতিবাদকে প্রশ্রয় দেয় —এই মত দিয়ে চারু মজুমদার

লিখলেন —"………তাই অর্থনীতিবাদ সংগ্রামী কৃষকের ঐক্যে ফাটল ধরায় এবং ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষককে হতাশাগ্রস্ত করে। অর্থনীতিবাদীরা প্রত্যেকটি সংগ্রামকে বিচার করে কত মণ ধান দখল হল বা কত বিঘা জমি কৃষক পেল এই হিসাব থেকে। তারা কখনও বিচার করে না —কৃষকের সংগ্রামী চেতনা বাড়ল কিনা সেই নিরিখে।" (*পৃষ্ঠা*- ২৭) তিনি আরও লিখলেন —"…….লেনিন যেখানে লিখেছেন, কোনো প্রগতিশীল আইন পাস করলেও সে আইন যদি আমলাতন্ত্রের হাতে কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তা হলে কৃষক কিছুই পাবে না। সুতরাং আমাদের নেতারা লেনিন ও বিপ্লবী পথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন।" (*পৃষ্ঠা*- ২৮) চারু মজুমদারের অনুগামী শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ির পার্টি সদস্যরা তাঁদের প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত রাখলেন। তাঁদের মত ছিল এই যে আইনী রাস্তায় ও আদালতের মাধ্যমে যদি কৃষকদের মধ্যে ভূমি বিলি বন্টনের ব্যবস্থা হয়, তাহলে অবিলম্বে গ্রামাঞ্চলে দুটি পরস্পরবিরোধী কৃষক শ্রেণীর সৃষ্টি হবে—এক, যারা জোর করে ভূমি দখল করেছে, দুই, যারা আদালতের মাধ্যমে বৈধভাবে জমির স্বত্বলাভ করেছে। এছাড়াও অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, যেসব কৃষকরা আইনগত বা বৈধ উপায়ে জমি লাভ করেছে, তারা ধীরে ধীরে শ্রেণী সংগ্রামী মনোভাব হারিয়ে সুবিধাবাদী শ্রেণীতে পরিণত হয়।

'দেশব্রতী'তে লেখা হল—- "…কৃষকদের নিজেদেরই জমি নিতে হবে, ছিনিয়ে নিতে হবে, যাব অর্থ এতকালের পুরনো কায়েমী সামন্তবাদী ব্যবস্থার মূলে আঘাত, নূতন রাষ্ট্রশক্তির মূল পতনের সূচনা। এই কাজটি প্রচলিত বুর্জোয়া আইন ও শৃঙ্খলা মারফৎ সম্পন্ন হয়ে যাবে, এমন আশা ডাঙ্গের সঙ্গে দেখছি এখন হরেকৃষ্ণ কোনার-রাও করছেন।"* চোদ্দ দলের যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল ফরোয়ার্ড ব্লক বিবৃতি দিল যে 'অতিবামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বিপন্ন করছে'। মুখ্যমন্ত্রী নকশালবাড়িতে 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' চলছে ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় রক্ষীবাহিনী চেয়ে পাঠালেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন-ও বিবৃতি দিলেন—- নকশালবাড়ির অবস্থা উদ্বেগজনক। সাতষট্টির জুনের শেষাশেষি কলকাতায় নকশালবাড়ির সমর্থনে সুশীতল রায়চৌধুরী, পরিমল দাশগুপ্ত মিছিল বের করলেন। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি কলকাতার চিহ্নিত 'মিলিট্যান্ট' ছাত্ররা যারা সংবাদপত্রে 'উগ্রপন্থী এম এফ' বলে উল্লিখিত হচ্ছিল, তারা ছাত্র ফেডারেশনের প্রকাশ্য জেলা সম্মেলনে মাও-সে তুঙ, কানু সান্যালের নামে শ্লোগান তোলে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে সাতষট্টির পশ্চিমবঙ্গে মূল সমস্যা হয় 'নকশালবাড়ি'। সুতরাং যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির সামনে এই সন্ত্রাসকারীদের 'বহিষ্কার' করাই প্রথম কর্তব্য হয়ে পড়ে। পাশাপাশি তীব্র খাদ্যসংকট, আরও নতুন নতুন খাদ্য আন্দোলন বা ভূমি দখলের আন্দোলন —সবই ঘটে যাচ্ছিল, কিন্তু একা নকশালবাড়ি সবাইকে আড়াল করে দাঁড়াল। তার অন্যতম কারণ সি. পি.আই.(এম) নেতৃত্বের অন্তঃসারশূণ্যতা এবং সে সময়ের মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই। কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক বা জেলা —প্রতিটি স্তরে তৎকালীন সি.পি.আই.(এম) এবং পাশাপাশি অন্যান্য বামদলগুলি পুরোপুরি শূণ্যগর্ভ হয়ে পড়েছিল। নেতৃত্বের ওপর সাধারণ কর্মীদের কারও আস্থা ছিল না।

এ সত্য 'আটটি দলিল' নিরপেক্ষ ভাবেই কর্মীরা উপলব্ধি করেছিলেন।

নদীয়া জেলার দিকে তাকানো যাক। কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, রাণাঘাট, শান্তিপুর, চাকদহ — প্রতিটি জায়গায় শহর সি.পি.আই.(এম) নেতৃত্ব বাকি কর্মী ও বৃহৎ জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল জেলে আটক থাকার জন্যই হোক বা মানসিকভাবেই হোক। সি.পি.আই.(এম) -এর বহু নেতাই পরবর্তীকালে সে সময়ের 'উগ্রপন্থী'-দের প্রাধান্য লাভের কারণ হিসাবে বলেছেন যে, যেহেতু পঁয়ষট্টি অব্দি ছুতোনাতায় বারবার নেতাদের জেলে যেতে হয়েছিল, সেই কারণে দ্বিতীয় সারির কর্মীরা অনায়াসে সেই শূণ্যস্থান দখল করে বাম 'হঠকারী' আন্দোলনের দিকে পার্টি কর্মীদের টেনে নিয়ে যেতে পেরেছিল। কল্যানী শহরের প্রাক্তন সি.পি.আই.(এম) বিধায়ক, নদীয়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য, এবং রাণাঘাট রূপশ্রী ক্যাম্পের অন্যতম উদ্বাস্তু নেতা সুভাষ বসু, বলেছেন যে ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনে প্রায় জনাকুড়ি উজ্জল তরুণ ছেলেকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সম্পদ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন —কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই নকশালবাড়ি আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছে। এক বছরের মধ্যেই এই উজ্জ্বল ছেলেরা পার্টির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল কি করে?

কৃষ্ণনগর শহরে অমৃতেন্দু মুখার্জী চিরকালই 'মধ্যপন্থী' নেতা হিসাবে চিহ্নিত। বহুদিনের পোড় খাওয়া কমিউনিস্ট কর্মী, অথচ জনগণের কাছের লোক হিসাবে তিনি কোনদিনই সমাদৃত হননি। ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনের সময় তিনি জেলে ছিলেন, জেল থেকে বেরিয়ে এই আন্দোলনের চরিত্র নির্ধারণ করতেও তিনি অক্ষম হন। জনগণের মেজাজ মেপে দেখার ক্ষমতা না থাকার ফলেই দেখা গেল, নকশালবাড়ি ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলা নেতৃত্ব বহিষ্কার করার আগেই কৃষ্ণনগর শহর কমিটির সব সদস্যই (একমাত্র সাধন চট্টোপাধ্যায় ছাড়া) পার্টির সদস্যপদ থেকে ত্যাগপত্র জমা দিয়ে আসেন পার্টি অফিসে। আগেই বলা হয়েছে, যাঁকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণনগর ও নদীয়ায় নকশালপন্থী কর্মীরা সি.পি.আই.(এম-এল) -এ যোগ দেয়, সেই নাদু চ্যাটার্জী আদৌ কোন তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন না, ভাল বক্তা ছিলেন না, কিন্তু ভালো সংগঠক ছিলেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে দক্ষ ছিলেন এবং নেতা হিসাবে সাধারণ কর্মীদের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পেরেছিলেন।

অমৃতেন্দু মুখার্জীকে বাদ দিলে কৃষ্ণনগরের সি.পি.আই.(এম) জেলা কমিটির আরও দুই উল্লেখযোগ্য নেতৃস্তরের কর্মী ছিলেন ইন্দু ভৌমিক ও নিশি চক্রবর্তী। এঁরা দুজনেই বহু পুরোনো কমিউনিস্ট কর্মী, পার্টির জন্য নিবেদিত প্রাণ। প্রথমজন অবিভক্ত নদীয়ার মৎসজীবিদের নিয়ে, পরে কৃষক ফ্রন্টে কাজ করে গেছেন। ইন্দু ভৌমিক রাণাঘাটের উদ্বাস্তুদের নিয়েও কাজ করেছেন। সাধারণ খেটে খাওয়া উদ্বাস্তু কর্মীদের মধ্যে প্রাথমিক সমাজতন্ত্রের পাঠ দেওয়ায় ব্যাপারেও তিনি মনোযোগী ছিলেন। রূপশ্রী ক্যাম্পের বাসিন্দাদের তিনিই প্রথম 'সোভিয়েট দেশ' ও অন্যান্য মার্কসীয় বই-এর পরিচয় ঘটান। সুভাষ বসুর কথায় উদ্বাস্তুদের মধ্যে পড়াশুনোর কালচার গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন ইন্দু ভৌমিক। নিশি চক্রবর্তীও নামকরা সংগঠক ছিলেন। অথচ 'নকশালবাড়ি' ঘটে যাওয়ার পর এঁরা কেউই

হঠকারী লাইনের প্রতি আগ্রহী যুবকদের পুরোনো পথে ফেরাতে পারেননি। এর জন্য ছেষট্টির স্মৃতি মূলতঃ দায়ী হলে, বহু নকশালপন্থী কর্মীর ভাষ্যে এই দুই নেতাই জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর প্রথম প্রথম প্রতিষ্ঠান বিরোধী কথাবার্তা বলতেন। এমনকি নিশি চক্রবর্তী পার্টি লাইনের বাইরে একটি পৃথক গোষ্ঠী গড়ে তোলার চেষ্টাও করেছিলেন —কিন্তু এঁরা কেউই অল্পবয়েসী বিদ্রোহী ছেলেদের আস্থাভাজন হয়ে উঠতে পারেননি। ইন্দু ভৌমিক পার্টির সবসময়ের কর্মী হিসাবে জীবনধারণ করতেন, শেষ বয়সে অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের ওপর আস্থা রাখতে সাহস করেননি। এগুলো অবশ্যই নকশালপন্থী কর্মীদের ব্যাখ্যা হিসাবে 'ভাববাদ প্রসূত' বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু ঘটনা এই যে, নদীয়া জেলার ক্ষেত্রে কৃষ্ণনগরের অধিকাংশ সদস্যই 'সাংগঠনিক দাসত্ব'-কে অগ্রাহ্য করেন। কারণ, মাওবাদের সঠিক তাৎপর্য বোঝা বা জমিদখলের মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্র দখলের লড়াই-এ নামার প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করার চেয়েও তাদের কাছে নকশালবাড়ি আন্দোলনকে সমর্থনযোগ্য মনে হয়েছে —খানিকটা সাবেক কমিউনিস্ট পার্টির বাকসর্বস্বতার বিরুদ্ধে সুস্থ প্রতিক্রিয়া হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে মধ্য ষাট দশক প্রস্তুত হয়েছিল প্রচলিত পার্টিমনস্ক রাজনীতির গড্ডলিকা প্রবাহের বিরুদ্ধে যেতে।।

মনে রাখতে হবে, সাতষট্টির জুলাই মাসে কৃষ্ণনগরে ছাত্রফেডারেশনের ডাকে খাদ্যের দাবিতে এক ধর্মঘট পালিত হয়।* জেলা শাসকের কাছে ধর্মঘটী স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা যে দাবি পেশ করে, তাতে খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করা, সস্তাদরে চাল দেওয়া বা রেশনে চালের বরাদ্দ বাড়ানো ইত্যাদি দাবির পাশাপাশি 'নকশালবাড়ির পুলিশী ব্যবস্থা তুলে নিতে হবে,' 'সেখানে ধৃত কৃষকদের মুক্তি দিতে হবে' —এজাতীয় দাবিও জানানো হয়। কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠনও যে নির্দেশকে অমান্য করার সাহস দেখিয়ে নকশালবাড়ির ঘটনাকে সমর্থন করছিল তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এটি। বাস্তবিকই একদিকে 'ভুখা মিছিলের দাবি'-র সঙ্গে 'নতুন ধারার' রাজনৈতিক সংগ্রামকে একাত্ম করার ঝোঁকটি এসেছিল তৎকালীন ব্যাপক মানুষের প্রতিষ্ঠানিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের প্রতি প্রত্যাশাভঙ্গ থেকে।

নবদ্বীপেও সাতষট্টির আগস্টে একটি খাদ্য আন্দোলন হয়। খাদ্যের দাবীতে নবদ্বীপ শহরে ছাত্রদের যে মিছিল ও বিক্ষোভ হয়, দেবী বসু কার্যত তাকে পরিকল্পিত বলে নিন্দা করে বিবৃতি দেন। সেই সময় নবদ্বীপ শহরের সি.পি.আই.(এম) শিবিরও একইভাবে বিদ্রোহী জনতার মেজাজ বুঝতে ব্যর্থ হয়। তার ওপরে সাতষট্টির নির্বাচনে নবদ্বীপ শহরে সি.পি.আই.(এম) প্রার্থী কানাই কুণ্ডুর পরাজয় ও অন্যান্য জটিলতা নিয়ে শহর কমিটিতে পারস্পরিক দোষারোপ ও সন্দেহের বাতাববণ সৃষ্টি হয়েছিল। এর সঙ্গে আগস্টে খাদ্যের দাবীতে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল শাসকশ্রেণীর পক্ষে যথেষ্ট চিন্তা উদ্রেককারী। ফলে কৃষ্ণনগরের মতই নবদ্বীপের পার্টি নেতৃত্বও সাধারণভাবে অনেকেরই আস্থা হারিয়েছিল।

শান্তিপুরে নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান ঘটার পর্বে শহর সি.পি.আই.(এম)-এর অবস্থা অন্যরকম কিছু ছিল না। অজয় ভট্টাচার্য-কালাচাঁদ দালাল পরিচালিত মার্কসবাদী প্রচার সমিতি ব্যাপক তরুণ বিদ্রোহীদের বিভিন্নভাবে আকৃষ্ট করেছিল। সব ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত প্রভাব অনুঘটক

হিসাবে কাজ করেছিল। আগেই বলা হয়েছে পার্টি নেতৃত্বে বিমল পাল খুব জনপ্রিয় বা আকর্ষক কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারেননি। পাল্টা নেতৃত্বের কেন্দ্র হিসাবে ধীরেন বসাক উঠে আসছিলেন ঠিকই, কিন্তু নকশালবাড়ির ঘটনা তাঁকেও আগ্রহী করে তুলেছিল। গোপনে নকশালবাড়ির ঘটনাবলী সম্বন্ধে কাগজপত্র আনিয়ে তিনি পড়তে শুরু করেন। প্রমোদ সেনগুপ্তর সঙ্গে প্রথমদিকে যোগাযোগও রেখেছিলেন যদিও পরে তিনি এ পথে বেশীদুর এগোননি। পার্টিনেতৃত্ব ধীরেন বসাকের এই সাময়িক 'পদস্খলন'-কে পরে কাজে লাগায়। নকশালপন্থীরা যে সময় শান্তিপুর শহরকে প্রায় নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছিল, সে সময়ের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, শান্তিপুর শহরে সি.পি.আই.(এম) ও সি.পি.আই.(এম-এল)-এর মধ্যে কোন বৈরিতা দেখা যায়নি। অন্যান্য যে কারণই থাকুক, আসল কারণ ছিল শান্তিপুর শহরে পার্টি নেতৃত্ব কোনদিন এমন শক্তিশালী কেন্দ্র তৈরী করতে পারেনি, যা 'নকশালদের' মোকাবিলা করতে পারে। এই শহরের ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি পরবর্তীকালে কানাই পাল, মোকসদ আলীর মত অন্য বাম পার্টির নেতাদেরও প্ররোচিত করেছিল নকশালদের 'মোকাবিলা' কারী anti-Naxal squad-এর বিরোধিতা করতে।

রাণাঘাট শহর, আগেই বলা হয়েছে, উদ্বাস্তু রাজনীতি বাদ দিয়ে কোনদিনই আলাদাভাবে বামপন্থী রাজনীতির উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি। এর একটি কারণ, রাণাঘাট শহরের প্রাচীন ধনী বনেদী বংশগুলির সামন্ততান্ত্রিক, রক্ষণশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারা, ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির শহর-রাজনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ —একে ছাপিয়ে সি.পি.আই.(এম)-এর রাজনীতি রাণাঘাটকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এই উদাসীন রাজনৈতিক আবহাওয়াকে প্রথম অশান্ত করেছিল নকশালপন্থী যুবকেরা —তারাও সংখ্যায় ছাপিয়ে যেতে পারেনি অনেক অখ্যাত গ্রামাঞ্চলের যুবকদের।

চাকদহ প্রসঙ্গে এলে দেখা যায় পার্টিতে যাঁরা সদস্যপদ পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে এবং বামমনোভাবাপন্ন ছাত্র-যুবকদের মধ্যে চাঞ্চল্য এনেছিল নকশালবাড়ি। লোকাল কমিটির অধীনে এমন কোনো অঞ্চল ছিল না যেখানে বিক্ষোভ দেখা যায়নি। নকশালবাড়ি কৃষক অন্দোলনকে কেন্দ্র করে মত ও পথের আলোচনা, বিতর্ক চলে পুরো ১৯৬৭ সাল জুড়ে। বহু সদস্য —বিশেষতঃ অল্পবয়েসীরা ঝুঁকে পড়েন নকশালবাড়ির দিকে। নেতৃত্বের কিছু অংশের মধ্যেও ঝোঁক দেখা দেয় নতুন মতের দিকে, যদিও দু-এক বছরের মধ্যে তারা পথ পাল্টে ফিরে আসেন পুরোনো খাতে। কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যে, নদীয়াতে ষাটের দশকের শেষাশেষি যে যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা, সাময়িকভাবে হলেও, নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ছিলেন কিন্তু নতুন পার্টিতে চূড়ান্ত পর্বে যোগ দেননি, তাঁরা কিন্তু অনেকেই আর সি.পি.আই.(এম)-এর মূলস্রোতে মিশে যেতে পারেননি। বিক্ষুব্ধ পার্টিকর্মী হিসাবে এঁরা পরবর্তীকালে পরিচিত হয় —যেমন নবদ্বীপে রবি ভট্টাচার্য, চাকদহে সৌরেন পাল, অরুণ ভট্টাচার্য, শান্তিপুরে ধীরেন বসাক, কৃষ্ণনগরে রামু ব্যানার্জী প্রমুখ।

দৃষ্টান্ত হিসাবে নদীয়ার এই চারটি শহরকে দেখানো হলেও প্রায় সবজায়গাতেই একইভাবে নতুন প্রজন্মের কল্পনা ও আবেগকে বশীভূত করতে ব্যর্থ হয় জেলা সি.পি.আই.(এম) নেতৃত্ব। প্রথম সারির নেতারা জেলে থাকার জন্যই এই 'নৈরাজ্যবাদী প্রবণতা' —কেবল এটাই ব্যাখ্যা হিসাবে দাঁড় করানো হলে তা হয় অতিসরলীকরণের প্রচেষ্টা। কারণ, সেই ভয়ানক আকাল, ছাত্র অশান্তি, ভুখা মিছিল, সারা দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, দীর্ঘদিনের একদলীয় শাসনের অভ্যস্ত বন্ধন থেকে নতুন বহুদলীয় বা যুক্তফ্রন্টীয় শাসনের অনভ্যস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বামপন্থী পার্টিগুলির পারস্পরিক অবিশ্বাস ও রেষারেষি —সে সময়ের চলমান সংকট হিসাবে মানুষকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছিল। এইসব সংকটের সামগ্রিক প্রতীক হয়ে এসেছিল নকশালবাড়ি। প্রত্যন্ত এক এলাকার বিচ্ছিন্ন এক আন্দোলন দিয়ে যে প্রতিক্রিয়া শুরু, অচিরেই তা ব্যাপক জনতার প্রত্যাশাভঙ্গকে মূর্ত্ত রূপ দেবে, শাসকশ্রেণী সম্ভবতঃ তা আঁচ করতে পেরেছিলেন ও সেই জন্যই এই আন্দোলন নিয়ে প্রশাসন কোন মোহ পোষণ করেনি।

যুক্তফ্রন্ট সরকার তার দমননীতি অব্যাহত রাখল। সি.পি.আই.(এম) রাজ্য নেতৃত্ব শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ির সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। পার্টি থেকে বিতাড়িত হলেন চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সৌরেন বসু, জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখ। রাজ্য নেতৃত্বের স্তরে এবং বিভিন্ন জেলা কমিটি থেকে প্রায় চল্লিশ জন সদস্যকে এই আন্দোলন সমর্থন করার জন্য বহিষ্কার করা হল। 'দেশহিতৈষী' থেকে বিতাড়িত হলেন সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত, নিরঞ্জন বসু; বিভিন্ন জেলা কমিটিগুলি থেকে অসিত সেন, পরিমল দাশগুপ্ত, প্রমোদ সেনগুপ্ত, সুনীতি ঘোষ, দিলীপ বাগচী(মুর্শিদাবাদ), মহাদেব মুখার্জী (আসানসোল), ছাত্র-ফ্রন্ট থেকে নির্মল ব্রহ্মচারী, শৈবাল মিত্র, আজিজুল হক, বিমল করগুপ্ত প্রমুখ। অন্যান্য রাজ্য যেমন তামিলনাড়ুর শ্রী আপ্পু, উত্তরপ্রদেশের শিউকুমার মিশ্র, বিহারের জামশেদপুর অঞ্চলের শ্রমিক নেতা সত্যনারায়ণ সিং, এবং কাশ্মীরের গোটা ইউনিটকেই পার্টি বিরোধী বলে ঘোষণা করা হল। সাম্প্রতিককালের তথ্য হল যে, রাজ্য কমিটি প্রথম যে ১৯ জনকে দল থেকে বহিষ্কার করে, তাদের মধ্যে নকশালবাড়ির কোন নেতা ছিলেন না। বাস্তবিকই সি.পি.আই.(এম)-এর বহু কর্মী ও নেতাই সাতষট্টির নির্বাচনোত্তর পর্বে একটা মোহভঙ্গের পর্যায়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা খুঁজছিলেন। নকশালবাড়ির ঘটনায় প্রমোদ দাশগুপ্ত হরেকৃষ্ণ কোঙার "চক্র"-এর ভূমিকায় তাঁরা ক্ষুব্ধ হলেন। হরেকৃষ্ণ কোঙার, "নকশালবাড়ির জেনারেল ডায়ার" হিসাবে চিহ্নিত হলেন।[১°] যিনি চিহ্নিত করেছিলেন সেই প্রমোদ সেনগুপ্ত "আমার বিচার" শীর্ষক প্রবন্ধে 'দেশব্রতী'-তে লিখলেন —"১৯৬২-তে পার্টির ভাগাভাগির পর আমরা অনেকেই মনে করেছিলাম যে, এইবার সত্যসত্যই পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতি অনুসরণ করে একটা বৈপ্লবিক পার্টি রূপে গড়ে উঠবে। কিন্তু নেতারা জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর তার বিশেষ কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। ....পার্টির মধ্যে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার কোন স্থানই নেই।"

"........অন্যদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভুলের জন্য পার্টি নেতৃত্ব অনেকবার বদলেছে। কিন্তু এদেশে নেতারা তত্ত্বে ও প্রয়োগে যত ভুলই করুন না কেন, তাঁরা নেতাই রয়ে যান। এঁরা সারা জীবন ধরে নেতা। নানা আমলাতান্ত্রিক কায়দায় এঁরা পার্টিটাকে নিজেদের জমিদারীতে পরিণত করে ফেলেছেন। জঙ্গী শ্রমিক কৃষকদের পার্টিতে আনা হয় না। পার্টির বেশীর ভাগ সভ্যই পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর। এঁদের জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই নেই। ফলে এঁদের বৈপ্লবিক চরিত্র ক্রমে নষ্ট হয়ে যায় ও তাঁদের পেটি বুর্জোয়া দোষগুলিই পার্টির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে।"[১১]

এরই মধ্যে সাতষট্টির পাঁচ-ই জুলাই তরাইয়ের বিদ্রোহী কৃষকদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তাদের পার্টি মুখপত্র *'পিপলস ডেইলী'-র* সম্পাদকীয় বিভাগে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। "চৈতালী ঝড়ের বজ্রনাদ ফেটে পড়েছে ভারতবর্ষের আকাশে। দার্জিলিং এলাকার বিপ্লবী কৃষকশ্রেণী ঘোষণা করেছে বিদ্রোহ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবীদের নেতৃত্বে গ্রামীণ সশস্ত্র সংগ্রামের একটি লাল এলাকা স্থাপিত হয়েছে। ভারতীয় জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের পক্ষে এই ঘটনাটি প্রচণ্ড তাৎপর্যপূর্ণ।"

"...সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধনবাদী, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী আমলা, স্থানীয় দুষ্কৃতকারী বদস্বভাব ভদ্রসম্প্রদায় এবং প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক পুলিশবাহিনী বিপ্লবী কৃষকশ্রেণীর কাছে এক অকিঞ্চিতকর শক্তি। কৃষকশ্রেণী তাদের ধূলিসাৎ করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবীরা চূড়ান্ত সঠিক কার্যটিই করেছেন এবং করেছেন অতি উত্তমরূপে। চীনের জনগণ আনন্দের সঙ্গে তারিফ জানাচ্ছেন দার্জিলিং এলাকার এই বিপ্লবী ঝটিকার উদ্দেশ্যে, যেমন জানাচ্ছেন তামাম দুনিয়ার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আর বিপ্লবী জনসাধারণ।"

"...তাই আজ দার্জিলিং এলাকার বিপ্লবী কৃষকশ্রেণী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে —একটি প্রলয়ঙ্কর প্রচণ্ড বিদ্রোহ। এবং এটা তামাম ভারতবর্ষব্যাপী লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের এক অশান্ত বিপ্লবের ভূমিকা। ভারতের জনগণ নিশ্চয়ই তাদের পিঠ থেকে এই পর্বতপ্রমাণ গুরুভার বোঝাগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে এবং জয় করবে পরিপূর্ণ মুক্তি। ভারত ইতিহাসের সাধারণ ঝোঁকটি আজ এই লক্ষ্যে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে এই প্রবল প্রবণতাটিকে পিছুটানে নিবৃত্ত করতে পারে।"

"কোন্ পথে পরিচালিত হবে ভারতবর্ষের বিপ্লব এটাই হচ্ছে আজকের মৌল প্রশ্ন যা নির্ধারণ করবে ভারতীয় বিপ্লবের সাফল্য এবং ৫০ কোটি ভারতবাসীর ভাগ্য। এই বিপ্লবের সামনে আজ একটি মাত্র পথই খোলা আছে, একটিমাত্র পথই আজ তাকে বেছে নিতে হবে, তা হল কৃষকশ্রেণীরওপর নির্ভরতা, গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি (base area) স্থাপন, দীর্ঘ প্রলম্বিত (protracted) সশস্ত্র লড়াইয়ের নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতা, গ্রামকে দিয়ে শহরকে ঘিরে ফেলা এবং এই ভাবে শেষ পর্যন্ত শহরগুলি একের পর এক দখল করে ফেলা। এই পথই মাও সে তুঙ-এর পথ। এই পথেই চীন বিপ্লব বিজয়ের পথে এগিয়ে গেছে। এবং এই পথটিই সমস্ত নিপীড়িত জাতি এবং জনগণের বিজয়ের একমাত্র পথ।"[১২]

৫ই জুলাই এর এই প্রবন্ধে মূলতঃ নকশালবাড়ির পরের সম্ভাব্য 'বিপ্লবের' চেহারাটাই ছকে দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসের ১৮ থেকে ২৭ তারিখে মাদুরাই-তে অনুষ্ঠিত সি.পি.আই.(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, ব্যর্থতা, সমালোচনা ইত্যাদি নিয়ে মন্তব্যকে অযাচিত ও এই পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ বলে মন্তব্য করা হয়। "The Central Committee considered it extraordinary that the Chinese did not deem it their elementary duty to take up their differences with our party on a party-to-party level before they openly comment in their press and radio." Further the Central Committee took serious objections to the open support of the CPC to the extremists of the Naxalbari movement. "Such support, to the splinter group and the reliance placed on them for leading the Indian revolution cannot be justified in terms of any Marxist - Leninist oranizational principles."[১৩]

মাদুরাই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা হল—"পার্টিকে কয়েকটি প্রশ্নের সাফ জবাব দিতে হবে। আন্তর্জাতিক বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনে নেতা আছে কি নেই। থাকলে সেই নেতৃস্থানীয় পার্টি চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কি না? যদি হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ কি; বলা হচ্ছে, আমাদের পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে চীন নাক গলাচ্ছে।....আন্তঃপার্টি সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ পরীক্ষিত মার্কসবাদী নিরীখ, নজীর ও ইতিহাস আছে। কালমার্কস থেকে মাও-সে-তুঙ সেই ঐতিহাসিক ধারাটিকেই পুষ্ট করে গেছেন ও আজও যাচ্ছেন। সেটা কি? বিপ্লবের স্বার্থে, প্রয়োজনবোধে, কোন পার্টি নেতৃত্ব ভুল করলে অথবা বিপ্লবী বিরোধী ক্রিয়াকলাপ চালালে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি থেকে তাকে কঠোর ও নির্মম সমালোচনা করে সেই ভুল অথবা মাকসবাদ-বিরোধিতাকে সমূলে উদঘাটন ও উৎপাটন করা। ...সুতরাং কোন পার্টি নেতৃত্বের মার্কসবাদ বিরোধী নীতি কোন অর্থেই জাতীয় নয়। এটি সম্পূর্ণভাবে একটি আন্তর্জাতিক প্রশ্ন। এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব লেনিনবাদের উপর দাঁড়িয়েই সর্বদাই তার মোকাবিলা করে।"[১৪]

বস্তুতঃ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান লিন পিয়াও —এর তত্ত্বাবধানে ছেষট্টি থেকেই তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন সংগ্রামশীল দেশগুলির আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে চীন প্রচার করতে শুরু করে। ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ চীনা কমিউনিস্টপার্টির মুখপত্রে বিশ্লেষিত হতে থাকে। বিশেষতঃ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দুই লাইনের মতাদর্শগত সংগ্রাম ও পরবর্তী বিভাজন নিয়ে চীনা পত্রিকাগুলি তীব্র মন্তব্য করতে থাকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখায়। আগেই আলোচিত হয়েছে ষাটের দশকে চীনে ঘটে যাওয়া সাংস্কৃতিক বিপ্লব এদেশের ছাত্র-যুবদের অগ্রণী অংশকে খুবই প্রভাবিত করতে থাকে।

লিন পিয়াও-এর 'জনযুদ্ধের জয় দীর্ঘজীবি হোক' *'পিপলস ডেইলী'*-তে ১৯৬৫ সালের

৩রা সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়। এই লেখাতে মাও-সে-তুঙ-এর রণনীতিই চূড়ান্ত বলে ঘোষিত হয়। প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে লিনপিয়াও-এর এই লেখা এদেশের বাম-কমিউনিস্টদের মধ্যে যারা বস্তুত তাদের প্রতিটি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে চীনা বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুরু করলেন। ভারতরাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ, গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি এলাকা স্থাপন বা নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল আন্দোলনের প্রথম ধাপ বলা এবং আরও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণের কাজেও চীনা পার্টির মুখপত্রকে তুলে ধরা হল।

উনসত্তরের ৮ই এপ্রিল পত্রিকায় *The Statesman* পত্রিকায় (পৃষ্ঠা- ২) লেখা হল —"চীনের নবম পার্টি কংগ্রেস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বর্মা, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও অন্যান্য দেশে সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে উৎসাহ ও সাহায্য দেবে বলে প্রস্তাব নিয়েছে। ভারতের বিপ্লবীরাও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে সদ্য পা বাড়িয়েছে, সংগ্রামের পর্যায়গুলিতে এই বিপ্লবীদের শক্তি উত্তরোত্তর বাড়বে।"

সাতষট্টির নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের পরবর্তী দিনগুলোয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার বিপ্লবী ঘটনাবলী পিকিং রেডিও-য় নিয়মিত বিশ্লেষিত হত এবং এই বিশ্লেষণ বিদ্রোহী কমিউনিস্ট কর্মীদের লেখায়, বক্তব্যে নিয়মিত প্রচার করা হত।

নদীয়ার শান্তিপুরে অজয় ভট্টাচার্য - কালাচাঁদ দালাল-এর নেতৃত্বে বাম-কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা যে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম করছিল, সে সম্পর্কে ১৯৬৭-র ১৭ই অকটোবরে *Hsinhua News Agency* - একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে।[১৫]

"In Sarbanandipara and Santipur, the revolutionary groups of the Indian Communist Party led the peasant in the armed occupation of the area, trained the youth for organised armed resistance, called on the peasant to oppose the procurement policy of the reactionary government and unfolded a campaign to seize rice. Unarmed police dared not visit the area. The panic stricken Indian government described the situation as 'alarming political developments' which might culminate in Naxalbari struggle."

শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকার সাহাপাড়া —সর্বানন্দীপাড়া এলাকা সত্যিই এমন একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিল যে জেলা প্রশাসন একটা সময় এই অঞ্চলে অজয় ভট্টাচার্য গোষ্ঠীর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। চীনে প্রকাশিত এই রিপোর্ট এই অঞ্চলের বামবিপ্লবীদের মনোবল তুঙ্গে তোলে। কিন্তু প্রকৃত মাও-নির্ধারিত পথে এই প্রতিরোধ আদৌ গড়ে উঠেছিল কিনা তা এই রিপোর্টিং-এ ধরা পড়েনি। বস্তুতঃ চীনা প্রচার মাধ্যমগুলি যা করছিল, তা অনেকটা 'বাড়ির ছাদ থেকে বিপ্লব দেখে' হাততালি দেওয়ার মতো।[১৬] এর ফলে নকশালবাদী কর্মীদের একটা ক্ষতিকর অভ্যাস হয় —চীনের মন্তব্য শুনে আন্দোলনের ওঠা-বাড়া নির্ধারণ করা। প্রকৃতপক্ষে এই রিপোর্টিং গুলিতে কোনো ঘটনার বহিরঙ্গের বিবরণ সঠিক থাকলেও, অন্তর্নিহিত মূল্যায়নের কোনো অবকাশ দেওয়া হত না। হয়ত অত দূর থেকে তাৎক্ষণিক ভাবে সেটা সম্ভবও ছিল না। ১৯৬৭-তেই চারু মজুমদারের কিছু অনুগামী

চীনে যান। তাঁদের একজন খোকন মজুমদারের বিবৃতি অনুযায়ী মাও সে তুঙ এই প্রতিনিধিদের বলেন যে, ভারতের মানুষকে নিজেদেরই লড়াই করতে হবে দেশের মুক্তির জন্য। চীনা জনগণ অন্যান্য পরামর্শ বা অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন এই পর্যন্ত।[১৭] এই মত সেই সময়ে আদৌ গুরুত্ব পায়নি। প্রকৃতপক্ষে চারু মজুমদার পন্থী বিপ্লবীদের সঙ্গে অন্যান্য মাওবাদী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রকৃত মাও বাদী সংগ্রামী লাইন ও তার সঠিক প্রয়োগ নিয়ে বহু বিতর্ক চলে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে অন্যান্য মাও বাদী গোষ্ঠীগুলির প্রায় কোন প্রভাবই পশ্চিমবঙ্গে ধরা পড়েনি। অন্ধভাবে যা করার চেষ্টা হচ্ছিল তা চারু মজুমদার ও 'দেশব্রতী' গোষ্ঠীর চীন বিপ্লবের ব্যাখ্যা ও তার প্রয়োগ। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে আদর্শগত ব্যাখ্যা —যতখানি পরিমাণে সেটা তত্ত্বের এবং তত্ত্বগত বিতর্কের আকারে থাকে সেটা প্রথমে সাড়া ফেলে বা নাড়া দেয়, আকৃষ্ট করে অগ্রনী অংশকে। সাধারণ যে কর্মীবাহিনী — ছাত্র-যুবই হোক বা সাধারণ জনতার অংশ —যার মধ্যে পশ্চাদবর্ত্তী, মধ্যবর্ত্তী সবকিছুই মিলেমিশে থাকে, সেখানে একটা আদর্শগত আলোচনা, একটা তাত্ত্বিক রচনা বা একটা বা দশটা দলিল, সবকিছুর থেকে একটা বাস্তব সংগ্রাম অনেক বেশী নাড়া দেয়। এই কথা বলার অর্থ এই আগেও বলা হয়েছে, মধ্য ষাট দশকের বিপ্লবী পরিস্থিতির পরিপক্কতা — যার ওপরে চারু মজুমদার ও অনুগামীরা বার বার জোর দিয়েছিলেন, তা যথেষ্টই ছিল, তবু যেখানে খামতি থেকে গিয়েছিল, তা ছিল শহরে ও গ্রামে চারু মজুমদারের নির্দেশের প্রতি অধিক নির্ভরশীলতা (যা সেই সময় ও অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে অস্বাভাবিক ছিল না; এটা এসেছিল —(ক) যথেষ্ট তাত্ত্বিক জ্ঞানসম্পন্ন আঞ্চলিক নেতার অভাবে, প্রয়োজনে যিনি পরিস্থিতি ও পর্যায়ের সঠিক বিশ্লেষণ করতে পারেন, (খ) চীনা সমর্থন ও সি.পি.আই.(এম-এল) কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ আস্থা ও ফলতঃ সত্তরের শুরুতে পারস্পরিক যোগাযোগের রাস্তা ছিন্ন হয়ে গেলে কার্যতঃ স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপ, (গ) নিজের এলাকাতে 'নেতা' হয়ে ওঠার প্রবণতা। ঊনসত্তর থেকে বাহাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় 'নকশালবাড়ি আন্দোলন হিসাবে যে বিদ্রোহ উত্তাল হয়, তা অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিয়েছে। খতমনীতিই ছিল একমাত্র যোগসূত্র। কারণ অগ্রণী অংশের কাছে যে অভ্যুত্থান ছিল মাও সে তুঙ তত্ত্বের প্রায়োগিক ব্যবহার, মফস্বলে ও গ্রামের কর্মীদের কাছে তার অর্থ দাঁড়ায় চারু মজুমদার-এর তত্ত্বের প্রায়োগিক ব্যবহার —অর্থাৎ 'চারুবাদী আন্দোলন'। সাতষট্টির পর থেকে নতুন ধারায় উদ্দীপিত ছাত্র বা যুব-জনতা যারা নকশালবাড়ি থেকে কৃষক আন্দোলনের ডাক শুনল ও এগিয়ে গেল, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা মাও-এর তত্ত্ব অনুযায়ী perceptual stageথেকে conceptual stage- যাওয়ার অবকাশ পায়নি।[১৮] বিশেষ করে শহরে ছাত্রদের ক্ষেত্রে উল্টোটাই ঘটেছে। যদি সে সময়ের ছাত্র রাজনীতির নাড়ির গতি অনুভব করা যায়, তাহলে দেখা যাবে আবেগ এবং বিদ্রোহী অহংকারই এক বিরাট অংশকে টেনে এনেছিল নকশালবাড়ির রাস্তায়, রাজনৈতিক বোধ নয়। মধ্য-ষাটের পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনকে একটু বিশ্লেষণ করা যাক। নদীয়ার প্রাসঙ্গিকতাও একই সঙ্গে ধরা পড়বে।

আগেই বলা হয়েছে বাম বি.পি.এস.এফ-এর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কলকাতার একদল 'র‍্যাডিকাল' হিসাবে পরিচিত ছাত্রদল মুখর হচ্ছিলেন তাঁদের নতুন নিজস্ব পত্রিকা '*ছাত্রফৌজে'র* মাধ্যমে। আগেকার ছাত্র ফেডারেশনের পত্রিকা *'ছাত্রছাত্রী'*র বিরুদ্ধে মঞ্চ তৈরী হল। সে সময় পশ্চিমবঙ্গে ছড়ানো-ছিটানো যে সব গোষ্ঠী 'বামপন্থী কমিউনিজম তত্ত্ব' নিয়ে চিন্তা করছিল (যেমন *চিন্তা, দক্ষিণদেশ, কমিউন* ইত্যাদি) —তাদের অনেকেই *ছাত্র-ফৌজে* বক্তব্য রাখত। '*ছাত্রফৌজে'-র* কর্ণধার গোষ্ঠীতে ছিলেন শৈবাল মিত্র, নির্মল ব্রহ্মচারী, বীরেশ ভট্টাচার্য, প্রলয়েশ মিশ্র, দিলীপ পাইন, প্রদ্যুৎ রায়, আজিজুল হক প্রমুখ। এই পত্রিকাতেই চারু মজুমদারের 'আটটি দলিলের' তিনটি দলিল ছাপা হয়। '*ছাত্রফৌজে'*র মাধ্যমে দক্ষিণবঙ্গে *'আন্তঃপার্টি সংশোধনবাদ বিরোধী'* একটি মঞ্চ তৈরী হচ্ছিল। ছাত্ররা গ্রামে যাওয়ার কথা ভাবছিল, প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই সময়েই ঘটল *প্রেসিডেন্সী কলেজের* আন্দোলন, যা এই ধূমায়মান ছাত্র বিদ্রোহকে আরও ঘনীভূত করল। ১৯৬৬-র ৩০ শে আগষ্ট একেবারেই আভ্যন্তরীণ কিছু অব্যবস্থার অভিযোগ তুলে ইডেন হিন্দু হোস্টেলের ছাত্ররা অনশন ও অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন। সেপ্টেম্বরে এই কলেজ থেকে মূলতঃ রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন করার জন্যই স্নাতক স্তরের সাতজন ছাত্রকে (প্রেসিডেন্সির), মৌলানা আজাদ কলেজের একজন ছাত্রকে হোস্টেল ও কলেজ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্য আরও দুজনকে (এরাও প্রেসিডেন্সির) স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি না করার আদেশ দেওয়া হয়। এঁদের প্রায় প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামে যান। এই ছাত্র আন্দোলন প্রেসিডেন্সির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে কলকাতার বিভিন্ন কলেজে ছড়িয়ে পড়ে ও কলকাতার গণ্ডি ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ ছাত্র সমাজকেও অনুপ্রাণিত করে। উচ্চ-শিক্ষার এই 'কুলীন' কেন্দ্রে অনমনীয় ছাত্র 'বিদ্রোহ' সমগ্র বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া তোলে। তৎকালীন বাম রাজনীতিকরা প্রেসিডেন্সীর এই ধারাবাহিক ছাত্র অশান্তির থেকে ফসল তোলার আশা করে প্রথমদিকে এই আন্দোলনকে সমর্থন জানান। কিন্তু অচিরেই সমকালীন রাজনৈতিক চাতুর্য্য ও কলাকৌশলের সম্যক পরিচিতি ঘটল—তাদের নিজেদের ভাষায় "চোখ ফোটার প্রক্রিয়া" —যখন দেখা গেল প্রেসিডেন্সীর ছাত্রনেতাদের তখনকার বাম ছাত্র ফেডারেশনের নেতারা ব্যবহার করেছিলেন মাত্র। এখানে তুলে দেওয়া যাক আন্দোলনকারী এক ছাত্রনেতা অমল সান্যালের বিবৃতি, "Movement in the Presidency College died a natural death. With the advent of General Election in 1967 the top CPI(M) leaders urged on the students not to fritter away energy in student movement and called upon the students to work for the cause of the electoral battle which they called as a great political battle to rouse the masses and mobilise them for the purpose of eventual revolution."[১১] '৬৭-র নির্বাচনে প্রেসিডেন্সী কনসোলিডেশনের ছাত্ররা কোনরকম আন্তরিকতা ছাড়াই সি.পি.আই.(এম) প্রার্থীদের হয়ে প্রচার চালায়। নদীয়ার অমল সান্যাল এক রকম দায়সারা ভাবেই কৃষ্ণনগর (পশ্চিম) বিধানসভা আসনের প্রার্থী অমৃতেন্দু মুখার্জীর

হয়ে কাজ করেন। যদিও সেদিনের বিদ্রোহী কনসোলিডেশনের নেতা অসীম চ্যাটার্জীর আজকের দৃষ্টিভঙ্গী হল —সেদিন বাম কমিউনিস্ট নেতারা যা করেছিলেন —বৃহত্তর রাজনীতির স্বার্থে ক্ষুদ্রতর আন্দোলনকে বলি দেওয়া —কৌশলগত দিক দিয়ে সেটাই ঠিক ছিল। অর্থাৎ সেদিন তাঁর বা তাঁদের আবেগ রাজনৈতিক ভাবে অপরিণত ছিল।

এই অসীম চ্যাটার্জী, যিনি 'কাকা' নামে ছাত্রমহলে নেতা হিসাবে দ্রুত উঠে আসছিলেন, অতি সত্বর নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় কর্মী হিসাবে পরিচিত হন। চারু মজুমদারের কৃষক আন্দোলনের তত্ত্বকে কাজে রূপায়িত করতে অসীম চ্যাটার্জীই এগিয়ে আসেন কলকাতার ও মফস্বলের ছাত্রসমাজের প্রধান প্রতিনিধি হয়ে। মেদিনীপুরের ডেবরা গোপীবল্লভপুরে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলায় ব্যপ্ত হন তিনি। চারু মজুমদারের শ্রেণীশত্রু, খতমের তত্ত্বকে প্রথম কার্যকরীও করেন ইনিই। সবচেয়ে বেশী সংখ্যক জোতদার 'খতম'ও হয় ডেবরায় (১২০ জন)। কোন স্তরের মাওবাদী ছিলেন এই অসীম চ্যাটার্জী? তুলে দেওয়া যাক অমল সান্যালের বক্তব্য—

"...Ashim had great capability for leadership and was a very good organiser. He used to clinch the critical issues involving organisational matters rather easily.....I never found in him a very versatile and thorough knowledge of politics. But he had an insight to understand a person and could distinguish between friend and foe......In the face of trouble he kept himself composed and aplomb. He was adventurist, but whatever he did, he did methodically, calculatedly and in a premeditated way."[২০]

বাস্তবিকই অসীম চ্যাটার্জী নিজেও কবুল করেছেন যে[২১] মার্কসীয় তত্ত্বে তাঁর চেয়ে সহপাঠী রণবীর সমাদ্দার বা অমল সান্যাল কিংবা রতন খাসনবীশ অনেক বেশী সমৃদ্ধ ছিলেন।

চারু মজুমদারের সঙ্গে অসীম চ্যাটার্জীর সাক্ষাৎ ঘটে —তাঁর নিজের বক্তব্য অনুযায়ী[২২] সাতষট্টির ডিসেম্বর মাসে। সঙ্গে ছিলেন নদীয়ার অমল সান্যাল। এর আগে মে মাসে নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান অসীম চ্যাটার্জীকে অভিভূত ও আগ্রহী করে। 'নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি' যা ১৪ই জুন '৬৭ সালে গঠিত হয়েছিল —অসীম চ্যাটার্জী তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও সদস্যও হন। নকশালবাড়ির অভ্যুত্থান ও কৃষকদের নেতৃত্বে সশস্ত্র পন্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কর্মসূচীর উপরে অসীম চ্যাটার্জী আস্থা পোষণ করতে শুরু করেন! কিন্তু তখনও চারু মজুমদারের সঙ্গে পরিচিত হননি তিনি। যখন পরিচিত হলেন, তখন তাঁর মনোভাব কি হল জানা যায় পূর্বোক্ত বিবৃতিটির একটি প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করলে ঃ

".........Ashim's relation with CM was not good. I heard that Ashim met CM twice in 1967 and 1968 in early part. After meeting Ashim commented that CM was a bureaucrat and had no depth in political knowledge. He gave out that..........CM did nothing to guide the Naxalbari movement. Kanu

Sanyal, Jangal Santhal and others organised the movements and CM was set up as ideologue of the movement, by focussing public attention on him only to camouflage the actual leadership of Naxalbari movement. Hence CM was no more than a built-up leader."[২৩]

সাতষট্টির শেষাশেষি দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদার সম্পর্কে তখনও স্বচ্ছ কোন ধারণা যিনি গড়ে তুলতে পারেননি, আটষট্টির শেষাশেষিই তিনি গোপীবল্লভপুরে চারু মজুমদারের কর্মসূচীকে রূপায়ন করতে কাজে নেমে পড়েন। কলকাতার ছাত্রবন্ধুদের সংগঠিত করেছেন, কাজে নামাচ্ছেন, গ্রামে নিয়ে যাচ্ছেন।

অন্যতম সহকর্মী অমল সান্যাল যিনি ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত উজ্জ্বল মেধার অধিকারী ছিলেন —তাঁর ভাবনা এই সময় কোন খাতে বইছিল, সেটাও দেখা যাক। তাঁর বক্তব্যের লেখক কৃত সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ করা হল।[২৪]

'সাতষট্টির মার্চ মাস নাগাদই সি.পি.আই.(এম)-এর সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশনের সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে। কেষ্ট ঘোষ, সুধাংশু পালিত, সরোজ মুখার্জী যাঁরা সি.পি.আই.(এম)-এর তরফে প্রেসিডেন্সির ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন, তাঁদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ছেষট্টিতে প্রেসিডেন্সিতে ছাত্র ফেডারেশনের ইউনিট খোলার সময় বিপ্লবের বাহক হিসাবে সি.পি.আই.(এম) নেতৃত্বের ওপর এঁদের খুবই আস্থা ছিল। সাতষট্টির ফেব্রুয়ারীতে অসীম চ্যাটার্জী কোন বন্ধুর সূত্র ধরে মাও-এর উদ্ধৃতি সম্বলিত একটি রেড বুক যোগাড় করেন। চীন তখন এঁদের কাছে সঠিক বিপ্লবী দিশার কেন্দ্রস্থল। সাতষট্টির মাঝামাঝি কলকাতা জেলা ছাত্র ফেডারেশন সম্মেলনের আগে আগেই অসীম চ্যাটার্জী, অমল সান্যাল, সব্যসাচী চক্রবর্তী, অশোক সেনগুপ্ত, রনবীর সমাদ্দার, দিলীপ চক্রবর্তী প্রমুখকে বহিষ্কার করা হল। এই সময়ই অর্থাৎ সাতষট্টির জুন মাসে ঢাকুরিয়ার রামচন্দ্র স্কুলে বিদ্রোহী বাম ছাত্ররা তাদের এক সম্মেলন ডাকে। সারা বাংলা থেকে প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেয়। প্রেসিডেন্সির ছাত্ররা ছাড়াও, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিষাণলাল চ্যাটার্জী, পবিত্রপাণি সাহা, কৃষ্ণনগর থেকে শুভ্রাংশু ঘোষ, বিপ্লব ব্যানার্জী, মহিমময় চন্দ, শুভ্র সান্যাল, বিদ্যাসাগর কলেজের নির্মল ব্রহ্মচারী, পল্লব গোস্বামী —এঁরা ও আরও অনেকে এই সম্মেলনে এসেছিলেন। কৃষিবিপ্লবই ছিল মূল আলোচ্য বিষয় —যদিও খুব সৃজনশীন কিছু এই সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসেনি।'

অমল সান্যাল এই পর্বে কলকাতা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। গ্রামে গিয়ে নিজের সাধ্যমতো কিছু একটা করতে হবে —এই ভেবে কৃষ্ণনগরে নিজের পৈতৃক বাড়িতে ফিরে যান। নদীয়ার চাপরা থানার মহাখোলা গ্রামে একাই, একটা হাই স্কুলে চাকরী নিয়ে যান। রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে অল্পদিন বাদেই সেই চাকরী যায়। প্রাইভেট টিউশন নিয়ে তবুও কিছুদিন তিনি গ্রামে থেকে যান। এরপর তাঁর বিবৃতিই উদ্ধৃত করা যাক।

"...During my two and half months' stay there I could not achieve much success in mobilising peasantry. I had no clear cut idea of my political

line. Apathetic attitude of the peasantry also disheartened me. At this juncture Kaka wrote me a letter and consequently I was informed by kaka that they had already started work in Gopiballavpur area of Midnapur and encouraging response from the peasantry had gladdened them. I was requested to accompany them for rural work at Gopiballavpur area. Readily I accepted the proposal...Ashim directed me to organise work at Parulia village under Gopiballavpur P.S. Accordingly I had been to Parulia village and put up at a primary school house. Food was not available always. To politicalize the peasantry was my main political work. Exploitation of the rural gentries, usurers, moneylenders was propagated and peasantry was urged that they should rise in rebellion to capture political power. We had a very vague idea about ways for seizure of political power. Only about ten days I stayed there. From Calcutta I wrote a letter to Kaka wherein I expressed my inability to pursue the political activity."

"...I had a belief in Socialism....with the passage of time, more so due to my rueful experience in rural area for a few days at Mahakhola and also at Gopiballavpur the belief was shaken. I found people were very inert and passive and they were not prepared for such showdown entailing lots of miseries. I was also not much equipped with sociological theories that would replace a new set of values and beliefs for the old ones. After going through my course in economics my impression has been that socialism per se is desirable but a path of transition as I conceived desirable earlier, entailed more social cost than benefit....."[২৫]

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হল মধ্য-ষাটের কলকাতার অগ্রণী ছাত্রসমাজের বিপ্লবী মানসিকতার বিশ্লেষণের জন্য। একদিকে বিপ্লবের জন্য ব্যগ্রতা, ষষ্ঠ দলিলে (৩০ আগষ্ট '৬৬) চারু মজুমদার ডাক দিচ্ছেন —"কমরেডস! স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের পিছনে না ছুটে আজ সংগঠিতভাবে পার্টিজান সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। সময় ছয় মাসও নেই, এর ভিতরেই আমাদের এই সংগ্রাম শুরু করতে না পারলে, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের মুখে আমাদের সংগঠিত হওয়ার দুরূহ কাজের সম্মুখীন হতে হবে।"[২৬] এই সংগ্রামের চেহারা ছকেও দিচ্ছেন এই দলিলগুলোতেই। "কৃষিবিপ্লব আজকের এই মুহূর্তের কাজ। এ কাজ ফেলে রাখা যায় না এবং এ কাজ না করে কৃষকের কোনোই উপকার করা যায় না। কিন্তু কৃষিবিপ্লব করার আগে চাই রাষ্ট্রশক্তির ধ্বংসসাধন। রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস না করে কৃষিবিপ্লব করতে যাওয়ার মানে সোজা সংশোধনবাদ। ...মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে তুঙের চিন্তাধারা আমাদের শিখিয়েছে, যদি কোনো এলাকায় কৃষককে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে সেই এলাকার রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভাঙার কাজে এগিয়ে যেতে হবে। ...অথচ পরিশ্রমী মেধাবান ছাত্ররা গ্রামে গিয়েও ফিরে আসছিল, কারণ প্রকৃতপক্ষে "Guilt was not altogether absent from their enthusiasm for the agrarian poor who were expolited,

since certainly few, if any of them, suffered from a sense of personal injustice as cause for joining the movement."[২৭] বিপ্লবী ছাত্রদের এই পেটিবুর্জোয়া মধ্যবিত্ত চরিত্র প্রমাণ করেছিল মানুষের সচেতনতাই তার সামাজিক অবস্থানকে নির্ধারিত করে না। একটি আধা-সামন্তবাদী, আধা-ঔপনিবেশিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা চিহ্নিত করার কাজে অগ্রণী বুদ্ধিজীবী অংশ হিসাবে ছাত্ররা যতখানি তৎপর ছিল, সেই সমাজের অন্দরমহলের চালচিত্র সম্পর্কে তারা ততখানিই অজ্ঞ ছিল। ফলে কোন বিশেষ মন্ত্র আবৃত্তি করে যেমন ধর্মে দীক্ষিত হওয়া যায় না, তেমনি রেড বুক হাতে নিয়ে গ্রামে গেলেই শ্রেণীচ্যুতি ঘটানো যায় না —এই সিদ্ধান্তে আসতে তাদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গে মধ্য-ষাট দশকের ছাত্রসমাজের বিপ্লবী চিন্তাধারা লিন পিয়াও-এর তত্ত্ব, যা সাতষট্টির সূচনাবর্ষতেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় "চমৎকার বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছে" বলে ঘোষণা করেছিল, তারই রাসায়নিক বিক্রিয়া।

শাসক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া

১৯৬৭ সালের ২১ শে নভেম্বর যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যায়। অজয় মুখার্জী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এই সরকারকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে ছিলেন না। আগেই বলা হয়েছে বাংলা কংগ্রেস শুরু থেকেই গ্রাম্য মধ্যচাষীদের সমর্থন পুষ্ট ছিল। নকশালবাড়ির কৃষক-বিদ্রোহ ঘটার পর গ্রাম্য জোতদার, ভূমিমালিক, ধনীকৃষক, মহাজন সবাই এসে আশ্রয় নিল বাংলা কংগ্রেসে। শুরু থেকেই তাই সি.পি.আই.(এম)-এর ওপর অজয় মুখার্জী চাপ দিতে থাকেন নকশালপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক স্তরে দমনমূলক ব্যবস্থা নিতে। চোদ্দ দলের ফ্রন্টে সি.পি.আই.(এম) তখন প্রায় একঘরে, ত্রিশঙ্কু অবস্থা। একদিকে এই সরকার ক্ষমতায় আসায় সর্বত্র সি.পি.আই.(এম) কর্মীরা বেনামী জমি বা খাস জমি দখলের আন্দোলনে সোৎসাহে নেমে পড়েছে, কলকারখানায় শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্ত ঘেরাও সংগ্রাম চালিয়ে অধিকার আদায়ে তৎপর, অন্যদিকে নকশালবাড়ি প্রশ্নে সি.পি.আই.(এম) এর অভ্যন্তরীণ দ্বিধা, দোলাচল ও সংকট প্রসঙ্গে সি.পি.আই-এর সুবিধাবাদী অবস্থান —এসব কিছুই তৎকালীন পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে তুলেছিল। সি.পি.আই.(এম) নকশালবাড়ি ঘটনাকে প্রশাসনিক বা আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবে না দেখে রাজনৈতিক স্তরে মোকাবিলা করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। বস্তুতপক্ষে নকশালবাড়ি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সি.পি.আই.(এম) তার মতাদর্শগত অবস্থান নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাস থেকেই সি.পি.আই.(এম) কেন্দ্রীয় কমিটি মতাদর্শগত দলিল গ্রহণের সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু করে দেয়।

সুতরাং একমাত্র অজয় মুখার্জীর তরফে চাপ দেওয়া ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের উপর যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দেওয়ার আর কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল বলে জানা নেই। উল্লেখযোগ্য যে গোটা সাতষট্টি সাল জুড়ে রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে বিশেষ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি।[২৮] কিন্তু এটাও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য

যে এই সময়েই লোকসভা ও রাজ্যসভায় প্রায়ই প্রশ্নোত্তরপর্বে নকশালবাড়ির ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে রাজ্য সরকারের কাছে বিভিন্ন অনুসন্ধান করা হয়েছে। এখানে কেন্দ্রীয় আইনসভার দুই কক্ষের দুটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তর পর্ব তুলে দেওয়া হল।

সাতষট্টির ১৬ই নভেম্বর রাজ্যসভায় উত্থাপিত নকশালবাড়ি সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন সম্পর্কে কলকাতায় রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে উত্তর চেয়ে পাঠানো হয়। প্রশ্নগুলি ছিল এইরকমঃ

(ক) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সাম্প্রতিক কালে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে শাসক ফ্রন্টেরই একটি রাজনৈতিক দল চীনের সাহায্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সশস্ত্র বিদ্রোহে লিপ্ত হতে চেষ্টা করেছে, সে সম্বন্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে অবহিত করা হয়েছে কিনা,

(খ) যদি হয়ে থাকে, তাহলে এ ব্যাপারে কোন তদন্ত করা হয়েছে কি না।

(গ) তদন্ত করা হয়ে থাকলে, তার ফলাফল কি,

(ঘ) রাজ্য সরকারেব তরফে জনগণের কোন অংশের কাছ থেকে কোন দলিল বা অন্য কোন জিনিষের সন্ধান পাওয়া গেছে কিনা, যা উপরোক্ত অভিযোগকে সমর্থন করে, এবং যদি পাওয়া গিয়ে থাকে, তাহলে সেটা কি ধরণের, এবং

(ঙ) রাজ্য সরকারের তরফে এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ মিলেছে কি, যাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর করা বিবৃতি —যে সাতষট্টির সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে নাথুলা পাসে চীনা অনুপ্রবেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর যোগাযোগ আছে —তার সত্যতা মেলে?

উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর প্রেক্ষিতে রাজ্য থেকে যে উত্তরগুলি পাঠানো হয় সেগুলি ছিল এইরকম—

(ক) সংবাদপত্রে প্রকাশিত উপরোক্ত বিবৃতির একটি প্রতিলিপি রাজ্য সরকারের তরফে স্বরাষ্ট্র দফতরে পাঠানো হয়েছে (নম্বর ৮৯৯৬পি, তাং ১০.১১.৬৭)

(খ) এবং(গ) একত্রে—সি.পি.আই.(এম)-এর উগ্রপন্থী গোষ্ঠী যারা নকশালবাড়ি গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত, তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। এই গোষ্ঠী চীন থেকে অস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা করছে এবং স্থানীয়ভাবেও অস্ত্র ছিনতাই-এর চেষ্টা করছে যাতে তাদের পরিকল্পিত সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান সফল হয়।

এই গোষ্ঠীর প্রধান সক্রিয় কর্মী ও নেতাদের পি.ডি.এ্যাকটে আটক করা হয়েছে ভারতবিরোধী এবং রাজ্য বিরোধী কার্য্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য।

(ঘ) এবং (ঙ)-র উত্তর —কিছু দলিল ও সাক্ষ্যপ্রমাণ আটক করা হয়েছে কিন্তু জনস্বার্থের খাতিরে সেগুলিকে প্রকাশ করা যাবে না।[২৯]

লোকসভাতেও অনুরূপভাবে যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছিল যেগুলি এইরকম — (ক) দেশে চীনা মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক কাজকর্ম সাম্প্রতিককালে বর্ধিত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এ মর্মে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে কি?

(খ) যদি হয়ে থাকে, তাহলে সেই কার্যকলাপ রোধ করার জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?

উত্তর ঃ(ক) এটা স্বীকার্য যে সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে চীনাপন্থীদের অর্থাৎ সি.পি.আই.(এম) -এর অভ্যন্তরে যারা উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী—সোজা কথায় যারা নকশালবাড়ি গোষ্ঠী নামে পরিচিত, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(খ) এই গোষ্ঠীর কার্যকলাপের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়েছে এবং কিছু প্রধান সক্রিয় নেতা ও কর্মীদের পি.ডি.এ্যাক্টে আটক করা হয়েছে তাদের সক্রিয়তা দমন করার জন্য।

এর পরবর্তীকালে লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় কক্ষই বারবার পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র সচিব অথবা গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন পাঠিয়েছে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উত্তাপ নির্ধারণের জন্য। বোঝাই যাচ্ছে, সে সময়ের কেন্দ্রীয় শাসকদলের প্রভূত মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ। মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সাল অব্দি এই পাঁচ বছরে আট বার শাসনক্ষমতা হাত বদল হয়েছে। কখনও যুক্তফ্রন্টের শাসন, (১৯৬৭-এর মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রথম যুক্তফ্রণ্ট ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৭০-এর মার্চ পর্যন্ত দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট), কখনও ইচ্ছামত নির্বাচিত সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতির শাসন (১৯৬৮-র জানুয়ারী থেকে ১৯৬৯-র ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত প্রথম দফায়, দ্বিতীয়—১৯৭০-র মার্চ থেকে ১৯৭১-এর মার্চ অব্দি তৃতীয় দফায় ১৯৭১-র ৩০শে জুন থেকে ১৯৭২-এর মার্চ পর্যন্ত); মধ্যে শিখণ্ডী সরকার স্থাপন যেমন ১৯৬৭-র নভেম্বরের শেষ থেকে তিন মাসের জন্য ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের মুখ্যমন্ত্রীতে পি.ডি.এফ সরকার; আবার ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে জুন অব্দি ফের অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে কংগ্রেস—মুসলীম লীগের কোয়ালিশন সরকার স্থাপন। শেষমেশ ১৯৭২ সালের এপ্রিল থেকে ছয় বছরের জন্য সিদ্ধার্থশংকর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সি.পি.আই-এর সমর্থনে শাসন চালায়। ঊনসত্তর থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে সি.পি আই ও সি.পি.আই (এম)-এর মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি এবং এলাকা দখল, সর্বোপরি প্রতিশোধ নেওয়ার যে রাজনীতি চলে, তার সুযোগ কেন্দ্রের শাসকদল নিতে বিন্দুমাত্র দেরী করেননি। এত হস্তক্ষেপ হতে পেরেছিল কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার নিজে প্রবল বিপাকে পড়া সত্ত্বেও। (১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে আটটি রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়ে তার একচেটিয়া ক্ষমতা রক্ষায় বেসামাল হয়ে পড়ে। "সিণ্ডিকেট" পন্থী নেতৃত্বের সাথে প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর তীব্র মতভেদ জাতীয় কংগ্রেসে ভাঙন ডেকে আনে।) এইরকম অন্তর্ঘাতের রাজনীতি—কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলগুলির পারস্পরিক সম্পর্ককে সাতষট্টি থেকে বাহাত্তরের মধ্যে বিষিয়ে তোলে। কিন্তু তাও জনসাধারণের নির্বাচনের রাজনীতির প্রতি আস্থা কিছুমাত্র কমেনি, যদিও আস্থাভাজন হবার মত আচরণ সে সময়ের রাজনৈতিক দল ও নেতাদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না। সারণী ৩.১-এ এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে।

সারণী—৩.১
Electorate Data
Assembly Elections
[West Bengal]

Year of Election	Total Votes	Total Votes Polled	Valid Votes	Votes Rejected	Percentage of Votes Polled	% of Rejected Votes
1967	20241088	13378428	12663030	715398	66.10	5.33
1969	20685310	13758072	13404310	353762	66.51	2.57
1971	22063684	13667300	13078348	588952	61.94	4.30
1972	22554276	13718535	13331517	387018	60.82	2.82

Sources : Report of General Elections to the House of the People/State Legislative Assemblies of India; The Controller of Publications, Government of India, New Delhi.

এরই মধ্যে সমগ্র রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে কলকাতা ও জেলাগুলিতে ফুটে উঠল নকশালবাড়ির সপক্ষে শ্লোগান।

"মাতৃজঠরের শিশুর স্পন্দন কেবল মায়েরাই অনুভব করতে পারেন, অপরে নয়। তেমনি নকশালবাড়ির কৃষিবিপ্লবও বিপ্লবীরাই"[৩০] (পরিশিষ্ট-২—এ বিশদে দ্রষ্টব্য)

সাতষট্টিতেই যুক্তফ্রন্ট গড়া এবং ভাঙার পালা শেষ হলে দেখা গেল সংসদীয় বামপন্থী রাজনীতির কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা তখনও শেষ হয়নি। জনসাধারণের যে অংশ ইতিমধ্যে খাস ও বেনামি জমি দখলের আন্দোলনে নেমে পড়েছিল এবং অপর যে অংশ মনে করছিল তরাইয়ের কৃষক আন্দোলন একটি দীর্ঘ লং মার্চের শুরু মাত্র[৩১] এই দুই পক্ষই যুক্তফ্রন্ট ভাঙার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলনে নেমে পড়ে। বস্তুত অর্থনৈতিক সংগ্রামের চেয়েও যেটা যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে বেশী শিরঃপীড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা ছিল কৃষকজাগরণ। সি.পি.আই (এম) দলের অবস্থান যুক্তফ্রন্টের পক্ষে গেলে সরকার ভেঙে দেওয়া হত কিনা সন্দেহ। আবার একথাও সত্যি সি.পি.আই (এম) পার্টি কিছুতেই কৃষক আন্দোলনকে সশস্ত্র বিপ্লবে রূপান্তরিত হতে দিত না। সি.পি.আই (এম) কর্মীবাহিনী জেলায় জেলায় লুকোনো জমি উদ্ধার ও বিলি বন্টনের কাজে কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে নেমে পড়েছিল। নদীয়ার মূলতঃ গঙ্গার চর এলাকায় এই জমি দখলের কাজ ভাল ভাবে ছড়ায়।[৩২] চাকদহের গঙ্গাপ্রসাদপুর, ঝাউচর, দোয়ারডাঙ্গা, পোড়াডাঙ্গা এলাকায় গঙ্গার চরে শত শত বিঘা খাস ও বেনামী জমি দখল হয়। এই আন্দোলন ঐ এলাকার ভুখা কৃষকদের মধ্যে খুবই উদ্দীপনা জাগায়। নদীয়ার গয়েশপুর, হরিণঘাটা, কল্যাণীর কাছে উত্তর চাঁদমারিতে সি.পি.আই (এম)

-এর কর্মীদের প্রত্যক্ষ মদতে কৃষকের জমি দখল হল। শেষোক্ত এলাকায় কল্যাণী শিল্প কারখানার শ্রমিকরাও যুক্ত ছিলেন।[৩৩] জেলায় জেলায় এইসব খাস ও বেনামী জমি দখলের লড়াই প্রত্যক্ষভাবে সি.পি.আই (এম)-এর ব্যানারে হচ্ছিল। অন্যদিকে নকশালবাড়ি তখন বাংলার যুব ছাত্রদের সামনে অর্থনীতিবাদ এড়িয়ে জমি দখলের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের বিকল্প দেখিয়েছে। জেলায় জেলায় পোষ্টার পড়ছে নকশালবাড়ির সমর্থনে। সি.পি.আই (এম)-এর চাপে তখনও রাজ্য আইনসভা নকশালবাড়ি এলাকায় কোনো দমনমূলক আইন বা পদ্ধতি চালু করেনি, শিলিগুড়ি মহকুমায় নেতাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া। বোঝাই যাচ্ছে সাতষট্টিতে নকশালবাড়ি আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গকে এমন অরাজকতায় নিক্ষেপ করেনি যে কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তুলবে। কিন্তু সরকার টিকল না কারণ সহজবোধ্য।

গোটা সাতষট্টি জুড়ে নকশালবাড়ির আহ্বান, আদর্শ, কর্মসূচী, ছড়িয়ে যেতে লাগল জেলায় জেলায়, তার জন্য দায়ী মূলতঃ (ক) তীব্র খাদ্য সংকটের ধারাবাহিকতা, এবং (খ) প্রশাসনিক স্তরে "অপেক্ষাকর ও দেখ" নীতির ফল।

ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলন, আগেই বলা হয়েছে, সাতষট্টির নির্বাচনী ফলাফলের ওপরেই কেবলমাত্র প্রভাব ফেলতে পেরেছিল। গোটা রাজ্যে তীব্র খাদ্যসংকট আগের মতই পীড়া দিতে থাকে। নদীয়া জেলায় সি.পি.আই (এম) ছেষট্টির সারা আকাল জুড়ে—অত বড় জঙ্গী একটা আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও—ফিরে যেতে পেরেছিল তার পুরনো পন্থায় 'ডেপুটেশন' পেশের লাইনে। মোটামুটিভাবে ছকটা এরকম ছিল — কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের এক গণডেপুটেশন বিডিও-র অফিসে-এ গিয়ে, ডেপুটেশনকারীদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল বিডিও-র সঙ্গে দেখা করে একটি স্মারকলিপির ভিত্তিতে আলোচনা সেরে জনসভা করা। মাঝে মাঝে বিডিও-কে ঘেরাও করাও হতো।[৩৪] এই কারণেই *'দেশব্রতী' "দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তির পথ"*[৩৫] শীর্ষক প্রবন্ধে লিখল—"সংশোধনবাদীদের খাদ্য আন্দোলনের শ্লোগান কি? গ্রামাঞ্চলে বিডিও ঘেরাও (দুর্ভিক্ষ ঘোষণা না করে), লঙরখানা খোলা, মাঝে মাঝে ক্ষুধিত কৃষকদের মিছিল করে শহরে ও কলকাতায় আনা, কেন্দ্রে ধর্না ও কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তর ঘেরাও, তারপর হঠাৎ সাধারণ ধর্মঘটের স্টান্ট বা চমক, এবং তাকে 'শান্তিপূর্ণ' রাখার জন্য সর্বস্ব পণ করে বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে পুলিশ-মিলিটারী-আমলাতন্ত্রের সঙ্গে গলাগলি সহযোগিতা।" নতুন যুগের নতুন নীতি কি হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে *দেশব্রতী* লিখছে—"সংশোধনবাদীদের খাদ্য আন্দোলনের ভণ্ডামির এই মুখোশ খুলে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে ও সাচ্চা কমিউনিস্টদের এগিয়ে যেতে হবে। বুর্জোয়া পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের বাধা অগ্রাহ্য করে গ্রামে ও শহরে জোতদার ঘেরাও ও মজুত উদ্ধারের কাজে নামতে হবে। এই লক্ষ্য নিয়েই মিছিল ও গণসমাবেশ করতে হবে। লঙ্গরখানা নয়, মজুত উদ্ধার; বিডিও ঘেরাও নয়, শিলিগুড়ির মতো জোতদার ঘেরাও, গণ উদ্যোগে সেই উদ্ধার করা মজুত বিতরণ এবং এই কাজে প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক বিপ্লবী গণকমিটি উজ্জীবিত ও

সক্রিয় করে তোলা—এই ধারায় চলতে হবে। বিশেষ করে কৃষকদের, টেনে আনতে হবে এই লড়াই-এ। কলকাতায় নিরামিষ ভুখামিছিলের পরিবর্তে গ্রামে-শহরে জোতদার-মজুতদারদের বিরুদ্ধে এই জঙ্গী অভিযান শুরু করতে হবে।"[৩৬]

এইরকম অভিযান চলছিলও—তবে আগের মতই বিচ্ছিন্নভাবে। সাতষট্টির জুলাই মাসে নদীয়ার ধুবুলিয়া স্টেশনে খাদ্যের দাবীতে প্রায় পাঁচশ লোক—অবশ্যই উদ্বাস্তু—রেল অবরোধ করে। অন্যদিকে নবদ্বীপে প্রবল খাদ্যসংকট সাতষট্টির আগস্ট মাসে আরও একটি খাদ্য আন্দোলন গড়ে তোলে। আগে থেকেই স্থানীয় সংবাদপত্রে যেভাবে খাদ্য সংকটকে তুলে ধরা হচ্ছিল, তা থেকে সে সময়ের বেপরোয়া অবস্থা খানিকটা আঁচ করা যায়। একটা দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়া যাক ঃ "সমগ্র নবদ্বীপ শহর ও গ্রাম আজ দুর্ভিক্ষ কবলিত—

(১) সওয়া তিনটাকা কিলো চাল

(২) ফ্যানের জন্য লাইন

(৩) ভাত ছিনিয়ে খাওয়ার দৃষ্টান্ত

(৪) পেটের জ্বালায় আত্মহত্যা শুরু।"[৩৭]

মনে রাখতে হবে সাতষট্টিতে ছেষট্টির প্রেক্ষাপট কিন্তু পাল্টে গেছে। কারণ ইতিমধ্যে "নবদ্বীপে নকশালবাড়ির সমর্থনে পোষ্টার পড়তে শুরু করেছে।" আগস্ট মাস থেকেই নবদ্বীপ শহরের পরিচারাপাড়া, দেয়ারাপাড়া, মালঞ্চপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে নকশালবাড়ি কৃষক বিদ্রোহের সমর্থনে পোষ্টার পড়ে গেছে। আগষ্টের এই খাদ্য আন্দোলনে কৃষ্ণনগরের মতো নবদ্বীপেও ছাত্ররাই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই এবার আন্দোলনের বর্শামুখ তাক করা ছিল যুক্তফ্রন্ট সরকারের দিকে। ফলে এবারেও সি.পি.আই (এম) নেতৃত্ব এই আন্দোলনকে আরও বেশী করে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে পরিচালিত করতে চাইলেন। প্রথমদিকে আন্দোলনের চেহারা সেরকমই ছিল। ৬ই ও ৮ই আগস্ট নবদ্বীপ ছাত্র ফেডারেশনের ও গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের প্রতিনিধিরা বিডিও-র কাছে খাদ্যের দাবীতে স্মারকলিপি পেশ করে এবং রাজ্যের দপ্তরবিহীন মন্ত্রী চারুমিহির সরকার-এর কাছেও স্মারকলিপি দেয়। এরপর ১১ই আগস্ট থেকে ১৪ই আগস্ট অব্দি আন্দোলন আর শান্তিপূর্ণ পথে না থেকে ট্রেন অবরোধ, স্টেশনের ওপর আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনার পথে এগোয়। স্থানীয় বিডিও অফিসে আগুন লাগানো হয়, যদিও ছাত্রদের নেতৃত্বে উপরোক্ত কাজগুলি হয়নি বলে দাবী করা হয়। ১১ই আগস্ট নদীয়ার জেলাশাসক নবদ্বীপে গেলে ছাত্র ফেডারেশন তাঁকে ঘেরাও করে। শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে ছাত্রবাহিনীর সংঘাত। পুলিশের লাঠির ঘা পড়ে ছাত্র থেকে সাধারণ মানুষের ওপরেও। দুজন মারাও যায়। ১১ই আগস্টের ঘটনার প্রতিবাদে ১২ই আগস্ট নবদ্বীপ ছাত্র ফেডারেশন পূর্ণ হরতালের ডাক দেয়। ইতিমধ্যে শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এর প্রতিবাদে ছাত্র-মিছিল থেকে শ্লোগান ওঠে—"১৪৪ ধারা নয়, কারফু নয়, খাদ্য চাই, খাদ্য চাই, গণ আন্দোলনে পুলিশী জুলুম হচ্ছে কেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার জবাব দাও"—ইত্যাদি। ক্রমশঃ পরিস্থিতি ছেষট্টির মতোই ব্যারিকেড-

খাড়া করা প্রতিরোধ আন্দোলনের দিকে এগোয়। পুলিশ গুলি চালায়—শহরের বিভিন্ন এলাকায়। বহু লোকের মৃত্যু হয়।[৩৮]

প্রশ্ন ওঠে স্থানীয় সি.পি.আই (এম) নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে। এখানেও পার্টি নিজেদের ছাত্র ফ্রন্টের বিরোধী ভূমিকা নিয়ে নিজেদের অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল। মূল সমস্যা এবারও কেন্দ্রীভূত হল যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বিব্রত না করার প্রশ্নে। ১৫ই আগস্ট নবদ্বীপের হাল দেখার জন্য ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার, আইনমন্ত্রী অমরপ্রসাদ চক্রবর্তী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য নবদ্বীপে এলে ছাত্ররা মন্ত্রীদের আটক করে। ছাত্রদের এই রোষ ছিল মূলতঃ নবদ্বীপের সি.পি.আই (এম) নেতা দেবী বসুর নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে। খাদ্যকে কেন্দ্র করে পুলিশ বনাম জনতার লড়াই-এর সময় সি.পি.আই (এম) মিছিল করে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে খাদ্য আন্দোলনের সঠিক পথ এটা নয়। পরবর্ত্তীকালেও দেবী বসু বিবৃতি দেন যে ছাত্র ধর্মঘট পরিকল্পিত। রেল আটকানো, কেবিন পোড়ানো ও মন্ত্রীদের আটকানো—সব কিছুর জন্যই তিনি ছাত্র ফেডারেশন নেতৃত্বকে দোষী করেন। *বসুমতী* পত্রিকার (যে পত্রিকায় ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনকে স্বাগত জানানো হয়েছিল) সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হল—"যদি কোন পার্টি জনসাধারণের পক্ষ হইতে খাদ্যের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন সংগঠিত করেন, তবে তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু উহার প্রাথমিক শর্ত্ত এই যে সেই আন্দোলন শান্তিপূর্ণও নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত হওয়া দরকার।"[৩৯] *দেশব্রতী* পত্রিকায়, *'পত্রিকার দুনিয়ায়' শশাঙ্ক* তীব্র আক্রমণ করলেন এই সম্পাদকীয়-কে।

"লক্ষ্য করুন 'আপত্তি নাই' কথাটা। কি অপরিসীম ঔদ্ধত্য এই সাংবাদিক পুঙ্গবের। যেখানে এককণা চাল নেই সেখানে ক্ষুধাক্লিষ্ট জনসাধারণ যদি আন্দোলনে অবতীর্ণ হন, তবে 'বসুমতী' সম্পাদক মশায়ের 'আপত্তি' নাই।...কিন্তু শুধু আপত্তি নাই বলেই ইনি ক্ষান্ত থাকেন নি, এই আন্দোলনের প্রাথমিক শর্ত তিনি বেঁধে দিয়েছেন, এই আন্দোলনকে 'শান্তিপূর্ণ' ও 'নিয়মতান্ত্রিক' হতে হবে। কংগ্রেস-বিরোধিতার ছদ্মবেশে একেবারে নেহরু-প্রফুল্ল সেনের হুবহু প্রতিধ্বনি।"[৪০]

সি.পি.আই (এম)-এর সান্ধ্য দৈনিক *গণশক্তিও* এই আন্দোলনকে সমাজবিরোধীদের আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেসীদের আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করে। *দেশব্রতীর* সংবাদদাতা লিখলেন—"সাধারণ মানুষের অনেকেই জানতে চেয়েছেন '৬৬ সালে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসী সরকারের পুলিশের ভূমিকার সঙ্গে '৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুলিশের ভূমিকার তফাৎ কোথায়? এতদিন মার্কসবাদী নেতারা যে আন্দোলনকে গণআন্দোলন বলেছেন তার সঙ্গে নবদ্বীপের আন্দোলনের পার্থক্য কোথায়? খাদ্য চেয়ে লাঠি-গুলি পেলেও কংগ্রেস আর যুক্তফ্রন্ট সরকারে কি পার্থক্য পাওয়া যায়? ...গতবছর এই প্রশ্নগুলিই তো তৎকালীন বিরোধীদলের নেতা শ্রী জ্যোতি বসু সঙ্গতভাবেই তুলে ধরেছিলেন। কংগ্রেসীদের চিরাচরিত নীতির মতো আজ মার্কসবাদী কাগজপত্র ও নেতারা কেন জনতার আন্দোলনকে সমাজবিরোধীদের দুষ্কর্ম বলে বর্ণনা করছেন?"[৪১]

নবদ্বীপ ছাত্র ফেডারেশন এইভাবেই সি.পি.আই (এম) নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে মুখ ফেরাল নকশালবাড়ির দিকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নবদ্বীপে ছাত্র ফেডারেশন পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকেই একটা প্রাণবন্ত সংগঠন হিসাবে কাজ করত। পাঠাগার চালানো, দুঃস্থ ছাত্রদের থাকার জন্য হোস্টেল চালানো—এই রকম সামাজিক কাজকর্মও চালাত। নবদ্বীপে রবি ভট্টাচার্য—যিনি ১৯৫৪ সালে নদীয়া জেলা ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হন—তাঁর মতে নবদ্বীপের ছাত্ররা ছাত্র ফেডারেশনকে অত্যন্ত লড়াকু সংগঠন হিসাবে তুলে ধরেছিল। কিন্তু তবু নবদ্বীপ কলেজে ছাত্র ফেডারেশন—ষাটের দশকে—ছাত্র পরিষদের প্রভাবকে মুছে ফেলতে পারেনি (ব্যতিক্রম '৬৫ সাল)।

১৯৬৩ ছাত্র সংসদে—ছাত্র ফেডারেশনের স্থান নিশ্চিহ্ন, ১৬টি আসনের মধ্যে ১৬টিই ছাত্র পরিষদ পায়। —নবদ্বীপ বার্তা, ১ সেপ্টেম্বর, '৬৩, পৃষ্ঠা-১.

১৯৬৫ ছাত্র ফেডারেশন সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। —ঐ, ১২ সেপ্টেম্বর, '৬৫, পৃষ্ঠা-১,

১৯৬৮ ছাত্র পরিষদের জয়—১৬টি আসনের মধ্যে ১৫টি। —ঐ, ১৫ ডিসেম্বর, '৬৮, পৃষ্ঠা-১,

সেপ্টেম্বরেই নবদ্বীপ ছাত্র ফেডারেশনের বার্ষিক সম্মেলনে 'নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানানো হয়, যুক্তফ্রন্ট সরকারের খাদ্যনীতির কঠোর সমালোচনা করা হয়, ভিয়েতনামে মার্কিনী বর্বরতার সমালোচনা করা হয়।"[৪২]

এখানেই শেষ হয় না। সি.পি.আই (এম)-এর শহর-কমিটির ভেতরেও লাগে গোষ্ঠী-কোন্দলের ছোঁয়া। ১৯৬৮-র জুন মাসে নবদ্বীপের বিশিষ্ট সি.পি.আই (এম) নেতা শংকরীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করলেন। পদত্যাগের কারণ দেখিয়ে যে বিবৃতি তিনি পেশ করেছিলেন, তাতে সি.পি.আই (এম)-র অভ্যন্তরীণ সংকট, দলাদলি, এবং পর্দার আড়ালের বহু কার্যকলাপ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। শংকরীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগগুলি ছিল মূলতঃ এই বয়ানে।

(ক) ২৪.১.৬৫ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় নবদ্বীপ কেন্দ্রের তৎকালীন বিধায়ক শ্রী দেবী বসুর পার্টি বিরোধী বিভ্রান্তিকর বিবৃতি, বিধানসভা থেকে গোপনে ছুটি মঞ্জুরীর ব্যাপারে কংগ্রেসী বিধায়ক শ্রী বীজেস সেনের সাহায্যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নিকট আত্মসমর্পণ, দলের নির্দেশ অমান্য করে পুলিশের সহিত যোগসাজশে নিজ বাড়িতে অবস্থান, পুলিশের ওপরওয়ালাদের সহিত হীন স্বার্থরক্ষার জন্য যোগাযোগ, দলের অভ্যন্তরে উপদলীয় চক্র গঠন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি প্রভৃতি অভিযোগে প্রাদেশিক কমিটি কর্তৃক শ্রীবসুকে, ১৯৬৬ সালে পার্টি থেকে যে বহিষ্কার করেন সেই বিষয়ে পার্টি মিটিং-এ আলোচনাকালে অধিকাংশ সভ্যের সঙ্গে শ্রী চট্টোপাধ্যায় বহিষ্কারের পক্ষে মত দেওয়ায় শ্রীবসু ও তাঁর উপদলীয় চক্র কর্তৃক শ্রী চট্টোপাধ্যায়কে হেয় প্রতিপন্ন

করার জন্য বিভিন্ন চক্রান্ত ও অপকৌশল প্রয়োগ করা হয়;

(খ) গত সাধারণ নির্বাচনে দলের প্রার্থী শ্রী কানাই কুণ্ডুর পরাজয়ের অন্যতম কারণ দলের উপদলীয় চক্রের মিরজাফরী কার্যকলাপ;

(গ) গত আগস্ট মাসে খাদ্য আন্দোলনে দলের উপযুক্ত নেতৃত্বদানের অক্ষমতা ও নিপীড়িত নিহতদের প্রতি চরম ঔদাসীন্য;

(ঘ) ঘোষ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের গণ আন্দোলনে স্থানীয় পার্টির নিষ্ক্রিয়তা;

এসব ও আরও বিভিন্ন অভিযোগ তুলে শংকরীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে নবদ্বীপ পার্টির অভ্যন্তরীন গণতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেবী বসু এটিকে ব্যক্তিগত পার্টিতে পরিণত করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে তাঁব বিবৃতি অনুযায়ী ও সমস্ত 'কাহিনী' জেলা কমিটি ও প্রাদেশিক কমিটির গোচরিভূত করেও শ্রী চট্টোপাধ্যায় ব্যর্থ হয়েছেন।[৪৩] এই সময় নদীয়া জেলা কমিটিতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়, গৌর কুণ্ডু প্রমুখ মধ্যপন্থী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনে এঁদের ভূমিকার কথা আগেই লেখা হয়েছে। দেবী বসুও অমৃতেন্দুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত।

বিবৃতির শেষে শংকরী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আলাদা করে উল্লেখ করছেন যে তিনি নকশালপন্থী নন, তাঁদের আদর্শে বিশ্বাসী নন ও কোনও যোগাযোগ রক্ষা করেন না। এই মন্তব্যও তাৎপর্যপূর্ণ।[৪৪]

ইতিমধ্যেই নবদ্বীপ শহরে *'প্রগতি পরিষদ'* চিহ্নিত হয়ে গেছে উগ্রপন্থী সি.পি.আই (এম)-দের কেন্দ্র হিসাবে, যারা মাও সে তুঙ-এর দর্শনে বিশ্বাসী ও চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রচার করত।[৪৫] 'প্রগতি পরিষদ' ইতিমধ্যেই পোষ্টার টাঙিয়েছে, লঙ্গরখানার খিচুড়ী খেয়ে মরবেন, না নকশালবাড়ির পথ নেবেন; নকশালবাড়ি একটি নাম বাঙলার বুকে ভিয়েতনাম জঙ্গল সাঁওতালের মুক্তি চাই।

নবদ্বীপ শহরে সাতষট্টির পরবর্তী পর্যায়ে সি.পি.আই (এম)-এর পাশাপাশি র‍্যাডিকাল বা 'উগ্রবাম' হিসাবে যাঁরা চিহ্নিত হচ্ছিলেন, তাঁরা অনেকেই 'প্রগতি পরিষদের' সদস্য ছিলেন, অনেকে ছিলেন না। গোটা নদীয়া জেলাতেই এই 'উগ্রপন্থীদের' পুলিশ এই সময় চিহ্নিত করে ফেলেছিল।[৪৬] এই 'উগ্রপন্থী'রা সি.পি.আই (এম)-এর পাশাপাশি তাঁত ও বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন। তখনও গণসংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন বর্জনের ডাক আসেনি। নবদ্বীপের প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করেই তাঁত শ্রমিকদের নিয়ে বর্ধিত মজুরীর দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলনে গড়ে তুলেছিলেন।[৪৭] এই আন্দোলনে এলাকার ছোট তাঁত মালিকদের বড় তাঁত মালিক ও মহাজনদের থেকে শ্রেণীগতভাবে পৃথক করার চেষ্টায় অন্ততঃ একটা বিভাজন সৃষ্টি ও কিছুটা বিচ্ছিন্ন করা গিয়েছিল। তাছাড়া চুক্তি স্বাক্ষরের সময় নবদ্বীপ দক্ষিণাঞ্চলের মণিপুর অঞ্চলে তাঁত শ্রমিকদের এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে শ্রমিক ফ্রন্টের কাজকর্ম, আন্দোলন, প্রচার, মীমাংসা সমস্ত কাজেই শ্রমিকদের সামনে রেখেই এই বিদ্রোহী পার্টি কর্মীরা কাজ চালাচ্ছিলেন। রবি ভট্টাচার্য যিনি

কো-অর্ডিনেশন পর্ব অব্দি নকশালবাড়ির বিপ্লবী রাজনীতি করেছেন, তাঁর মতে সি.পি.আই (এম-এল) পর্বে নবদ্বীপের শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা সহজবোধ্য কারণেই নষ্ট হয়ে যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রগতি পরিষদে বাম কমিউনিজমের যে ঐতিহ্য ছিল, তার ফলে নকশালবাড়ি আন্দোলনকে স্বাগত জানাতে দেরী হয়নি। রবি ভট্টাচার্য প্রগতি পরিষদ এবং নবদ্বীপ শহরেও নতুন বাম-রাজনীতিকে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করার কাজে অন্যতম পুরোধা ছিলেন। নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান ঘটার পর পর নদীয়া জেলার বিভিন্ন এলাকার আগ্রহী বামপন্থী কর্মীরা যেমন পলাশীপাড়ার মনু চ্যাটার্জী ও ব্যাং (বিল্বমঙ্গল) চ্যাটার্জী, কৃষ্ণনগরের চন্দন সান্যাল, নাদু (শোভেন) চ্যাটার্জী, চাকদহের অরুণ ভট্টাচার্য—রবি ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কলকাতার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ থাকার কারণে সাম্প্রতিক তর্ক-বিতর্ক, ঘটনাবলী এবং নতুন বাম-বিপ্লবী-ফ্রন্টের কাজকর্ম সম্পর্কে রবি ভট্টাচার্য ওয়াকিবহাল ছিলেন। ফলে নদীয়ায় মাওবাদী চিন্তার ও তত্ত্বের প্রভাব—সে অসিত সেনের ব্যক্তিগত প্রভাবই হোক বা কো-অর্ডিনেশনেরই হোক, নবদ্বীপে প্রথম আসে।

নদীয়ার নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি

সাতষট্টিতে নকশালবাড়ি ঘটনা ঘটার পর নদীয়ায় ধীরে ধীরে পার্টি ক্লাসের বদলে স্টাডি সার্কেল-এর সূচনা হয়। এই সময় থেকেই ছাত্র-যুবকদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়—নির্বাচনের জন্য পার্টি, নাকি শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে কাজ করার জন্য। অর্থাৎ নকশালবাড়ির ঘটনা এদের চেতনাকে নাড়া দিয়েছিল।

কৃষ্ণনগরের এক প্রাক্তন নকশালপন্থী বিপ্লবীর কথায়[৪৮] সেইসময় পাড়ায় পাড়ায়, ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্র ধরেই, ছেলেদের নিয়ে বসা হত। সেখানে 'চেয়ারম্যানের তিনটি লেখা' ও রেড বুক পড়া হত। নদীয়াতে কৃষ্ণনগরেই প্রথম *নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি*[৪৯] জেলাভিত্তিক কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য পাঁচ সদস্যের একটি সাব-কমিটি তৈরী করেছিল—যার উদ্দেশ্য ছিল জেলাস্তর ও আঞ্চলিক স্তরে উপসমিতি তৈরী করা এবং নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের অনুকরণে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো। এই আঞ্চলিক কমিটিগুলির দায়িত্ব ছিল মিটিং, মিছিল করা ও শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো। এছাড়াও স্থানীয় ছেলেদের মধ্যে থেকে কর্মীবাহিনী তৈরী করে মজুত করা চাল বা খাদ্যশস্য উদ্ধার করার কাজও করানো হত। সেই সময়ের পরিস্থিতিই এমন ছিল, যে সবার গায়েই কমবেশী নকশালবাড়ির আঁচ লেগেছিল। নকৃসসস-ও আশানুরূপ সাড়া পেল কলকাতার মত জেলাগুলিতেও। বিভিন্ন গ্রুপের মাওবাদী কর্মী ও চিন্তার লোকদের একজায়গায় মিল ঘটানোর প্রাথমিক কাজটি সাফল্যের সঙ্গেই করতে পারল এই সংগঠন। সংগঠনের সহ-সভাপতি সত্যানন্দ ভট্টাচার্য যিনি ইতিমধ্যে কলকাতা কর্পোরেশন থেকে পদত্যাগ করেছিলেন—বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বিপ্লবের সপক্ষে প্রচারে নামলেন। প্রথম

যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের পর নকৃসসস-র নামে নকশালবাড়ির স্বপক্ষে পোষ্টার পড়তে শুরু করে—'আর নির্বাচন নয়। ধনতান্ত্রিক নির্বাচন ধনতন্ত্রের শোষণকেই শক্তিশালী করে। বৃহত্তর সংগ্রামে নামুন।' 'অন্তর্বর্তী নির্বাচন বা যুক্তফ্রন্ট গঠন মুক্তির পথ নয়। নকশালবাড়ির পথে এগিয়ে যান।' 'আর নির্বাচন নয়। সংগঠন গড়ে তোলো। শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র হউক।' এবং 'কমঃ মাও সে তুঙ-এর মহান নির্দেশে বুর্জোয়া সদর দপ্তরে কামান দাগো।' এছাড়াও আরও অনেক।

গণেশ ঘোষ ছিলেন আরেকজন ব্যক্তি যিনি অন্যান্য জায়গার সঙ্গে নদীয়ার বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরে ঘুরে বাম কমিউনিস্টদের মধ্যে 'বিপ্লবী' অংশকে একত্রিত করার কাজটা করছিলেন। স্বদেশ মিত্র আসতেন (যিনি লাল ঝাণ্ডা গ্রুপের নেতা ছিলেন) হাওড়া থেকে। কৃষ্ণনগরে পরবর্ত্তীকালে রামু ব্যানার্জী যখন বিপ্লবী কমিউনিস্টদের পার্টি গঠন পর্বে মূলস্রোত থেকে সরে দাঁড়ালেন, তখন তিনি শহরের আরও দু-একজন কর্মীকে নিয়ে (যেমন ভবানী পাল চৌধুরী) 'লাল ঝাণ্ডা' গোষ্ঠীর অনুগামী বলে পরিচিত হন। এই সময় সি.পি.আই-(এম) জেলা কমিটির ইন্দু ভৌমিকের যে বিক্ষুব্ধ, কমিউনিস্টদের সঙ্গে মত সাযুজ্য ঘটেছিল—সেটা রামু ব্যানার্জী মনে করলেও সি.পি.আই (এম) নেতৃত্ব তা অস্বীকার করেন। নদীয়াতে মাওবাদী চিন্তাধারার বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির বিচ্ছিন্ন প্রভাব কতটা কাজ করেছিল, সে বিষয়ে কোন সঠিক মতামত পাওয়া শক্ত, যেমন মনীন্দ্রনাথ বাগ, যিনি ১৯৫১ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন, প্রত্যক্ষভাবে কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কথা না স্বীকার করলেও, পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী 'দক্ষিণদেশ' গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। পলাশীপাড়ার ব্যাং চ্যাটার্জী প্রথমদিকে স্বদেশ মিত্র, ডালিম চক্রবর্ত্তীদের প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তিনি মনে করেন যে, 'দেশব্রতী' গোষ্ঠীর সমান্তরাল একটা অস্তিত্ব যথেষ্ট দীর্ঘ সময় টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু পার্টি তৈরী হওয়ার মুহূর্তে আবেগের ভারে কোনো স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। দিলীপ বাগচী যে সূর্য সেন গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ রাখতেন, সে কথা *'সেই দশক'* বইতে বলা আছে। তবে এসব সত্ত্বেও নদীয়া জেলায় খুব উল্লেখযোগ্য প্রভাব অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি ধরে রাখতে পারেনি।

তবে নদীয়ায় মূল বিপ্লবী চেতনা বহন করা ও ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি করেছিল ছাত্রশক্তি। নদীয়ার প্রায় প্রতিটি মহকুমায় বিপ্লবের সপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল ছাত্ররা। কোনো কোনো এলাকায় ছাত্ররা ছাড়া সমাজের আর কোনো অংশই নতুন বিপ্লবী রাজনীতির পক্ষে উল্লেখ করার মত এগিয়ে আসেনি, যেমন বগুলা, রাণাঘাট, এবং কল্যাণী।

কৃষ্ণনগর শহরে ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাড়া জাগিয়েছিল নকশালবাড়ি রাজনীতি। খাদ্য আন্দোলনে এখানকার স্কুলের ছাত্ররাও এগিয়ে এসেছিল সরকার বিরোধী আন্দোলনে। সেই বিদ্রোহী মানসিকতা তখনও পুরোপুরি নেভেনি যেসময় নকশালবাড়ি রাজনীতির উত্তাল হাওয়া বয়ে এল। সাতষট্টির পর কৃষ্ণনগর বিপ্রদাস পাল চৌধুরী পলিটেকনিক-এর ছাত্ররা শহরে নকশালবাড়ির সমর্থনে বিরাট মিছিল বার করল—মাও সে তুঙ-এর পোষ্টার ও

নকশালবাড়ির সমর্থনে শ্লোগান নিয়ে। এই সময়ের গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে দেখা যায় কৃষ্ণনগর শহরের বিভিন্ন এলাকায় সি.পি.আই (এম)-এর 'উগ্রপন্থী' অংশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ছাত্ররাই এই আদর্শ ও কাজকর্মে অগ্রণী অংশ হিসাবে কাজ করেছে। তারা কৃষ্ণনগরের আশপাশের গ্রাম এলাকাগুলিতে কৃষকদের মধ্যে যাচ্ছে, তাদের বোঝাচ্ছে যেন সরকারের 'লেভি' সংগ্রহের অভিযানে তারা এককণা আউশ ধানও না দেয়। তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের খাদ্য-নীতির প্রকাশ্য সমালোচনা করছে। সবচেয়ে বড়ো কথা তারা শ্লোগান তুলছে—"জঙ্গল সাঁওতালের মুক্তি চাই।"[৫০] এই সময়ের আরও কিছু খবর—

(ক) নকশালবাড়ি থেকে এই জেলায় দুটি বাংলায় প্রকাশিত Leaflet (প্রচারপত্র) পাঠানো হয়েছে প্রচারের জন্য। প্রথমটির শীর্ষক—'তরাইয়ের কৃষকের পক্ষে দাঁড়ান' যাতে শিলিগুড়ি মহকুমার কৃষক আন্দোলনের বৈধতার স্বপক্ষে বলা হয়েছে। এই প্রচারপত্রে শিলিগুড়ি মহকুমা কৃষক সমিতির সভাপতি জঙ্গল সাঁওতালের স্বাক্ষর আছে—তারিখ ২০.৫.৬৭। দ্বিতীয় প্রচারপত্রের শীর্ষক ছিল 'কৃষকের ন্যায্য দাবীর সংগ্রামে সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ ঐক্যবদ্ধ হোন'—তারিখ ১৯.৬.৬৭।"[৫১]

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের পর সব জায়গাতেই ছাত্ররা প্রতিরোধ আন্দোলনে নামে। এই প্রতিরোধ যতটা না যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে, তার চেয়ে বেশী গণতান্ত্রিক সরকার পতনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চক্রান্তের বিরুদ্ধে। মনে রাখতে হবে নকশালবাড়ির রাজনীতি এদের নির্বাচনমূলক বা সংসদীয় রাজনীতির বিপক্ষে টানছিল, এবং পাশাপাশি যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে আশা করার মত বিশেষ কিছু বাকিও ছিল না। গ্রামে গ্রামে বিপ্লবী কর্মীরা সেই সময় চাষীদের মধ্যে 'লেভি' নীতির বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছিল। জায়গায় জায়গায় চাল বা চিনি বা অন্য খাদ্যশস্য চালান দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হচ্ছিল (যেমন, মাজদিয়ায় ২৭.১০.৬৭-র খবর বিপ্লবী জনতা মাজদিয়া বাজার থেকে পাচার যাওয়া চিনির বস্তা আটক করে, যা ট্রেনে করে বাইরে চালান করার জন্য পাঠানো হচ্ছিল, এবং সেই চিনি কন্ট্রোল রেটে জনগণের মধ্যে বিক্রী করে দেওয়া হয়)।

চাকদহে অন্যতম ছাত্র ফেডারেশন কর্মী ও পরবর্ত্তীকালে নকশালপন্থী নেতা অরুণ (সন্টু) বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষ্য অনুসারে সাতষট্টির নভেম্বরে যুক্তফ্রন্ট ভাঙল। ভেতরের ভাঙন শুরু হয়েছিল আগেই। যদিও যেদিন সরকার ভাঙল সেদিন ছাত্রদের তরফে চাকদহের রামলাল একাডেমীর সামনে পিকেটিং হয়, সতেরো জন ছাত্র গ্রেপ্তার হয়। চাকদহে নকশালবাড়ির সমর্থনে যে তরুণ ছাত্র ফেডারেশন কর্মীরা জড়ো হচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে নিতাই সরকার, পরিমল দেবনাথ, সঞ্জয় বিশ্বাস, গোপাল চ্যাটার্জী, অমল গুহ, অতনু সিংহরায়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশান্ত পোদ্দার, দীপক গোস্বামী, প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণনগরেও ছাত্র ফেডারেশনের তরফে সরকার ভাঙার বিরুদ্ধে পোষ্টার পড়ে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে প্রফুল্ল ঘোষের পি.ডি.এফ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে সোচ্চার এই পোষ্টারগুলোয় কিন্তু সংসদীয় রাজনীতির চেয়ে নকশালবাড়ি রাজনীতির কথাই বেশি বলা হয়েছে। যেমন, 'নয়া বাংলার

নয়া নেতা জঙ্গল কানু লাল সেলাম,' 'পুলিশের জুলুমের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠো', 'মাও সে তুঙ-এর চিন্তাধারায় যুবসমাজ জেগে ওঠো', 'মাঠের ফসল তুলবে কে? গরীব চাষী আবার কে?' 'গণতন্ত্র অর্থ—গ্রেপ্তার, লাঠিচার্জ, গুলি ও হত্যা, ধরমবীর ও প্রফুল্ল ঘোষ জবাব দাও। সামনে লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত থাকুন।' 'নকশালবাড়ির সমর্থনে এই ধরনের পোষ্টার তখন সব জায়গাতেই পড়ছে। ২৭.১১.৬৭ তারিখের খবর[৫২] অনুযায়ী শান্তিপুরের দেওয়ালে লেখা হচ্ছে—'চোরাকারবারী ও জোতদারদের দালাল প্রফুল্ল ঘোষ নিপাত যাক', এবং আড়ংঘাটায় পোষ্টার পড়ছে—'নকশালবাড়ি-কৃষক আন্দোলন জিন্দাবাদ।'

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের পর বিক্ষুব্ধ সি.পি.আই (এম) কর্মীদের পি.ডি.এ্যাক্টে গ্রেপ্তার করা শুরু হল। নদীয়ার বেশীরভাগ কর্মী ও নেতাকেই পাঠানো হল বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে। কৃষ্ণনগরের নাদু চ্যাটার্জী, রামু ব্যানার্জী, মণি বাগ, শুভ্র সান্যাল, শুভ্রাংশ ঘোষ, শান্তিপুরের অজয় ভট্টাচার্য, বীরেন দাশ—এইসব অভিজ্ঞ ও পুরনো কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হলেন তরুণ ছাত্র কর্মীরা। দেড়-দু' মাসের এই সহ অবস্থান নকশালবাড়ি রাজনীতির শিবিরকে শক্তিশালী করে তুলল।

শক্তিনগরে নকশালবাড়ি রাজনীতির নির্মাণ

শক্তিনগর কৃষ্ণনগরের উপান্তে একটি কলোনী। দেশভাগের সময় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের পাবনা জেলার হিমাইৎপুরের বাসিন্দারাই মূলতঃ এখানে এসে বাসস্থান তৈরী করেন (শক্তিনগরের জনসংখ্যার ৮৫%-ই ওপার বাংলার)।[৫৩] পাবনা জেলার হিমাইৎপুর সংলগ্ন একটি বিখ্যাত ক্লাব শক্তি মন্দির-এর নামেই, এই এলাকার নামকরণ হয়। এই 'শক্তিমন্দির' ক্লাব স্বাধীনতাপূর্ব যুগে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামী ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল। নতুন গড়ে ওঠা শক্তিনগরেও সেই কংগ্রেস ঘেঁষা মনোভাব একটি রক্ষণশীল পরিমণ্ডল তৈরী করেছিল। যে হিমাইৎপুরের প্রাক্তনীরা এই নতুন কলোনীর অভিভাবক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন, তাঁরা সবাই কংগ্রেসী রাজনীতির পোষক ছিলেন —যেমন নরেন সরকার, অমূল্য সাহা, দ্বিজেন্দ্রলাল দাস, শচীন চৌধুরী প্রমুখ। এই স্বনিযুক্ত অভিভাবকরা শক্তিনগর এলাকাকে তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মাঝে মধ্যে যে মৃদু আপত্তির মুখোমুখি হতেন না, তা নয়। 'শতদল' নামে ঐ অঞ্চলে একটা পত্রিকা বেরোত, যেখানে গোষ্ঠীতন্ত্রের আড়ালে কিছু অবৈধ, অন্যায় কাজের খবর প্রকাশ করা হত। কিন্তু ঐ পত্রিকা প্রকাশিত হলেই প্রকাশ্যে সেগুলিকে ছিঁড়ে ফেলা হত। শৈলজা লাহিড়ী নামে কলকাতার জনৈক ভদ্রলোকের ভাগ্নে ঐ কলোনীর বাসিন্দা ছিলেন। এই ব্যক্তিই পাড়ার তরুণ ছেলেদের কাছে প্রথম চীন বিপ্লব ও মাও সে তুং, নভেম্বর বিপ্লব কিংবা আলবেনিয়ায় প্রসঙ্গ তোলেন। প্রায় অন্তরালেই গুটিকতক ছেলে বামপন্থায় দীক্ষিত হয়। কিন্তু আদতে তখন শক্তিনগরে কংগ্রেসের প্রায় একচেটিয়া প্রভাব ছিল, অল্প কিছু ফরওয়ার্ড ব্লক সমর্থক ছাড়া। কংগ্রেসী-

গোষ্ঠী শক্তিনগরে কিছু ছোটোখাটো শিল্প গড়ে তোলায় মনোযোগী হল যেমন হোসিয়ারী, চর্মশিল্প, সমবায় ইট ভাঁটা, মৎস চাষ সমিতি (বর্তমান এই এলাকার তিরিশ শতাংশ লোক মৎস্যজীবী) ইত্যাদি। পরবর্তীকালে এলাকার নতুন প্রজন্ম উদ্বাস্তুদের জন্য সরকার প্রদত্ত পুনর্বাসন কল্পের বরাদ্দ অর্থ (১২০০ টাকা মাথাপিছু স্মল ট্রেড লোন ও ৬০০ টাকা গৃহনির্মাণ বাবদ) অনেকটাই এই গোষ্ঠীচক্রের দ্বারা আত্মসাৎ করা হয় বলে সন্দেহ করত। তাছাড়া ইট ভাঁটার টাকা কিংবা হোসিয়ারী শিল্পে শ্রমিকদের পাওনা টাকাও দেওয়া হত না বলে অভিযোগ উঠত। শ্রমিক বিক্ষোভ ঘটলে অত্যাচারের ঘটনাও ঘটত। সমাজজীবনের নানা ঘটনাতেও এই গোষ্ঠী প্রায় পিতৃতান্ত্রিক খবরদারির নিয়ম জারি করে যেমন শক্তিমন্দির ব্যায়ামাগার ছাড়া এলাকার আর কোনও ক্লাব সরস্বতী পূজো করতে পারবে না। এ সমস্ত ঘটনাই, এলাকার অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষদের, যুবকদের, প্রতিবাদী জোট বাঁধতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ প্রকাশ্য বিক্ষোভে পরিণত হল যে ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে সেটা হল উনিশশো সাতষট্টি সালে মে দিবস পালন।

কৃষ্ণনগর শহর সি.পি.আই.(এম) নেতৃত্বের মধ্যে অনেকেই আগে থেকে শক্তিনগরের তরুণ, প্রতিবাদী যুবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। যেমন নাদু চ্যাটার্জী, নিশি চক্রবর্তী, ইন্দু ভৌমিক, মণি বাগ, কালো দত্ত (নৃসিংহপ্রসাদ) প্রমুখ। যে সব স্থানীয় যুবক এই সময় শক্তিনগরে বামপন্থী রাজনীতির একটা পা রাখবার জায়গা তৈরী করায় সচেষ্ট ছিলেন — তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মাধাই বিশ্বাস, বেনীচরণ সরকার, কার্ত্তিক সরকার (হোসিয়ারী শ্রমিক), রমা বিশ্বাস, দুলাল চক্রবর্তী প্রমুখ। সাতষট্টির শুরুতেই কৃষ্ণনগরে নাদু চ্যাটার্জীরা যখন থেকে শহর সি.পি.আই.(এম)-এর অফিসিয়াল গোষ্ঠীর সঙ্গে বেসুর গাইতে শুরু করেছেন, তখন থেকেই বেণী সরকার-রাও শক্তিনগরে পার্টির কর্মীদের এড়িয়ে চলছেন। অণিমা ব্যানার্জী ও মুকুল ব্যানার্জী এই দুই ভাইবোন সেই সময় শক্তিনগরে সি.পি.আই.(এম) অফিসিয়াল গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন।

শক্তিনগরের এই বামপন্থী যুবকদের উদ্যোগে এলাকার কিছু খেটে খাওয়া অভাবী ও নির্যাতিত পরিবারের মেয়েরা নিজেদের এককাট্টা করার জন্য 'মহিলা সমিতি' গড়ে তোলেন। এই সমিতিতে তাঁরাই আসতেন যারা জীবনধারণের জন্য লোকের বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করতেন বা, সেলাই করে পয়সা উপায় করতেন। এই মহিলা ঐক্যও শক্তিনগরে রক্ষণশীলতার দুর্গ ভাঙায় কিছু কম অবদান রাখেনি।

সাতষট্টি সালের 'মে দিবস' পালনের জন্য আগে থেকেই শক্তিনগরের ছেলেরা গোপন বৈঠক করে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। একথা কারোর অজানা ছিল না যে এই প্রকাশ্য মিটিং-এ প্রতিরোধ আসবে। মারামারির আশংকাও ছিল। কিন্তু 'মে দিবস' পালনের মধ্যে দিয়ে এই যুবকরা মূলতঃ শক্তিনগরে বামপন্থী আন্দোলনের একটা স্বীকৃতি চেয়েছিলেন। এটা করা গেলে কলোনীর একচেটিয়া রাজনীতিকে প্রকাশ্যে খারিজ করা যাবে বলেই শহর কমিটির নেতারা ও এলাকার যুবকরা মনে করছিলেন। সি.পি.আই.(এম) পার্টির নাম দিয়ে প্রকাশ্যে

পোস্টার লাগানো হল ও লিফলেট বিলি করা হল।

অনেকেই আশ্চর্য হল যখন সি.পি.আই.(এম)-এর জেলা কমিটি এই মিটিং-এ সম্মতি জানাতে রাজী হল না। শক্তিনগরের কংগ্রেসী নেতা নরেন সরকারকে তারা তাদের অসম্মতির কথা জানিয়েও দিল। সি.পি.আই.(এম) পার্টির শহর কমিটি জেলা কমিটির সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্থানীয় বামপন্থী যুবকদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ায়। স্থানীয় কংগ্রেসীরা ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত শক্তিনগর ময়দানে মিটিং-এর বিরুদ্ধে কোর্ট থেকে ইনজাংশন জারী করায়। বামপন্থী কর্মীরাও হামলার মোকাবিলা করার জন্য বেললাইন থেকে খোয়া জোগাড় করে, পতাকাবাহী লাঠি নিয়ে —এমনকি বন্দুকও নিয়ে তৈরী হয়। শক্তিনগর ময়দানের উপর ইনজাংশন থাকায় পাশে হাইস্কুলের কাছে রাস্তার ওপর মঞ্চ তৈরী করা হল। অণিমা ব্যানার্জী সভানেত্রী, মণি বাগ প্রধান বক্তা। সমীর মজুমদার, যতীন বিশ্বাস —এই দুই স্থানীয় যুবকও বক্তৃতা করবেন বলে ঠিক হয়।

সাতষট্টির পয়লা মে, কলোনীর ইতিহাসে প্রথম রাজনৈতিক মিছিল বার হল। পুরোভাগে ছিলেন হোসিয়ারী শিল্পের শ্রমিকরা, পরে মহিলা সমিতির মেয়েরা এবং পিছনে সাধারণ বামপন্থী কর্মী ও যুবকরা। মিছিল নরেন সরকারের বাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে এসে আকস্মিকভাবে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে শক্তিনগর ময়দানে ঢুকে পড়লো। সাধারণ মানুষ দলেদলে দুটি পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের এই পেশী প্রদর্শন দেখতে এসেছিল, কিন্তু গণ্ডগোলের আশংকায় মাঠে না এসে আশপাশের বাড়ির ছাদে বা রাস্তায় জমায়েত হয়েছিল। মণি বাগ প্রথমে বক্তৃতা করেন। এরপর যেই স্থানীয় যুবক সমীর মজুমদার 'শক্তিমন্দিরের' দুর্নীতি নিয়ে বলতে শুরু করেন অমনি বোমা পড়তে আরম্ভ করে। মিটিং ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরপর বিক্ষুব্ধ জনতা প্রবলবেগে আক্রমণকারীদের দিকে তেড়ে যায়। নরেন সরকার, অমূল্য সাহার বাড়ি আক্রান্ত হয়।

ঐ একই মে দিবসে কৃষ্ণনগর শহরে টাউন হলেও একটি জমায়েত হয়। এই মিটিং ডাকা হয় জেলা সি.পি.আই.(এম)-এর তরফে যেখানে জেলা কমিটির সম্পাদক অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার বক্তৃতা করেন। (বক্তৃতায় শক্তিনগরের ঘটনাকে হঠকারী বলে নিন্দা করা হয়)। সেদিনই অফিসিয়াল নেতৃত্ব সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটে এই বিক্ষুব্ধ কর্মীদের। ফলে মিটিং-এ বিক্ষুব্ধ সি.পি.আই.(এম) কর্মীরা হৈচৈ বাধায়। ওদিকে ভেঙে যাওয়া শক্তিনগরের মিটিং থেকেও কর্মীরা মিছিল করে টাউন হলে আসে। ২রা মে রাত্রে মাধাই বিশ্বাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এলাকায় দাঙ্গাবাধানোর অভিযোগে।

এইভাবে সাতষট্টি সালের মে মাসে গোটা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নদীয়ায় শক্তিনগর কলোনীর ইতিহাসে সৃষ্টি হয় একটা "point of no-return"। সি.পি.আই.(এম) পার্টি প্রতিষ্ঠার তাগিদের চেয়েও এখানে বেশী কাজ করেছিল সামন্ততন্ত্রের ভাবধারার মানসে আঘাত করার প্রেরণা। স্ববিরোধিতাটা এখানেই ছিল যে, এলাকার কংগ্রেসী দুর্গে আঘাত হানার চেষ্টা হয় বিক্ষুব্ধ সি.পি.আই.(এম) কর্মীদের তরফেই, পার্টির অফিসিয়াল গোষ্ঠীর তরফে নয়।

শান্তিপুর ডুবু ডুবু

"The Government of West Bengal has been alerted recently by the district authorities of Nadia against certain alarming political developments which might culminate in Naxalbari type of troubles in Santipur, Nabadwip, Ranaghat and Chakdah.

It is learnt that the report which reached the Home Ministry, West Bengal had mentioned the activities of some extremist leaders in the agrarian belts of the district. It was also mentioned that Mr. Kanu Sanyal, an extremist leader of Naxalbari is in close contact with the extremist leaders in the district and paid secret visits at least three times during the last month and held several meetings with expelled ultra left leaders of the CPI(M) at Santipur. Although the 'Aus' crops prospects in Nadia seems to be bright, these extremist leaders are planning to start a campaign against Government's policy of procurement. Already they have been asking farmers "not to allow a grain of rice to be moved outside the district." This runs counter to the State Government's policy regarding available or marketable surplus of one lakh tonnes of paddy for the statutory rationing areas.

.......Meanwhile incidents of looting of rice and paddy have been on the increase during the last two months. District authorities feel that political philosophy of Naxalbari had inspired these acts of "grabbing". ....Sarbabandipara in Santipur municipal area is stated to be the main stronghold of the "ultras".

In absence of a definite directive from the state Government about the course of action, it has become difficult for local administration to adopt a firm policy for dealing with the movements. ....There were dens in Santipur where unarmed policemen do not dare tread even now.

........Confidential reports received by the local authorities indicated that a training centre for imparting lessons on rifle shooting have been opened by the extremist leaders in Bagchi Bagan and other areas in Santipur. Sarbababdipara also has developed into a cell where mass training of young boys and girls is being done on methods of organised resistance.

There is virtually a reign of terror in and around Santipur. Police appeared to be helpless and dared not even execute warrants of arrest against any of the wanted ultra left leaders in their dens. According to the information available to the police at least three rifles and eighty six rounds of ammunitions were in the possession of the ultra left group. These are suspected to have been seized by the rebels during the last food movements

in 1966 in Santipur when the local thana was raided."

উপরের সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল সাতষট্টির ৫ই সেপ্টেম্বর *অমৃতবাজার* পত্রিকায় (পৃষ্ঠা- ১ ও ৭)। সাতষট্টি সাল থেকেই নকশালবাড়ি রাজনীতির প্রভাব শান্তিপুরে কতখানি ছড়িয়েছিল তা এই রিপোর্টে পরিষ্কার। সে সময়ের গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টেও এই একই আশঙ্কার ছবি ফুটে উঠেছে। এই সংবাদটিতে প্রকাশিত কয়েকটি দিক সে সময়ের জেলাগুলিতে বিদ্রোহী সি.পি.আই.(এম) কর্মীদের কাজকর্মের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছে —যেমন (ক) নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থানের নেতৃত্বব সঙ্গে যোগাযোগ করা, (খ) জেলার কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা, (গ) খাদ্য বা খাদ্যশস্য লুঠ ও জনগণের মধ্যে তা বিতরণ, এবং (ঘ) তার সঙ্গে নদীয়াতে —বিশেষতঃ এবং সম্ভবত একমাত্র শান্তিপুরে সশস্ত্র গেরিলা তালিম।[৫৪] এটা ঘটনা যে শান্তিপুরের কিছু এলাকা যে পুলিশী প্রশাসনকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করেছিল তা গোয়েন্দা রিপোর্টেও বলা হচ্ছে এবং বারবার। গোয়েন্দা পুলিশের রেকর্ডে, নদীয়ার ফাইলে, অজয় ভটাচার্য ও শান্তিপুরের 'উগ্রপন্থীদের' কাজকর্ম সবচেয়ে বেশি আলোচিত। নদীয়ার তৎকালীন প্রশাসন এদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতো। এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও উল্লেখ্য যে তখনও অব্দি রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকার এই 'উগ্রপন্থীদের'কার্যকলাপ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত চিন্তাভাবনা শুরু করেনি। পুলিশী প্রশাসন এই রাজনৈতিক ঔদাসীন্যর কারণেও কিছুটা চুপচাপ ছিল। এমনকী সত্তর সালের মাঝামাঝি পৌঁছেও তৎকালীন গোয়েন্দা পুলিশের বড়কর্ত্তাকে রাজ্যে স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে স্পষ্ট নির্দেশ চেয়ে পাঠাতে হয় — "......On the strategy to be followed in regard to the lawlessness perpetrated by the Naxalites."[৫৫]এবং আশ্চর্য হতে হয়, যখন দেখা যায় পুলিশের পক্ষ থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা কিভাবে করা যেতে পারে তার কিছু সম্ভাব্য কৌশল পাঠানো হয়েছিল।

শান্তিপুরের ক্ষেত্রে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। পুলিশী রিপোর্টেও সে সময়ের নকশালপন্থী কর্মীদের বিবরণে তৎকালীন অবস্থার খুব একটা ফারাক পাওয়া যায় না।

"১৯৬৭-তে নকশালবাড়ি ঘটল। মনে হতো শান্তিপুরও নকশালবাড়ি —শান্তিপুরের সাধারণ মানুষ একটা পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার জবাব দিলেন ফাঁড়ি আক্রমণ করে ও রাইফেল ছিনতাই করে। ......কী চমৎকার অবস্থাই না ছিলো —জনগণ যে কোনো রকম ঘটনার জন্যে তখন প্রস্তুত।"[৫৬] বাস্তবিকই ছেষট্টি থেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যুব ও ছাত্রদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম সর্বত্রই একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। শুরুতে যদিও খাদ্যের দাবিই প্রধান ছিল কিন্তু ক্রমশঃই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা —বিভিন্ন ঘটনার সূত্র ধরে বিপ্লবী যুবকর্মীদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। শান্তিপুরে অজয় ভট্টাচার্য-কালাচাঁদ দালালের নেতৃত্বে সাতষট্টি-তে 'মার্কসবাদী প্রচার সমিতি' গড়ে ওঠে। সংগঠকরা প্রায় সবাই খ্যাতিমান, জনপ্রিয়, এবং প্রভাবশালীপার্টি সদস্য হিসাবে শান্তিপুরে সি.পি.আই.(এম)-এর পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছিল। সাতষট্টি সালে নকশালবাড়ি ঘটনার পরপরই (যদিও প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াই)

শান্তিপুরে সর্বানন্দীপাড়ায় অজয় ভট্টাচার্য ও সঙ্গীরা পুলিশের সঙ্গে লড়াই করছেন। সেইসময় এই সর্বানন্দীপাড়া, সাহাপাড়া বাম বিপ্লবীদের কর্মকেন্দ্র। নিয়মিত চাল গুদাম লুঠ করা হত। তাঁত কর্মীদের কাজ হত। স্বর্ণকার সম্প্রদায়, বিড়ি শ্রমিক দল আর এলাকার ডানপিটে যুবকদের দল —প্রত্যেকেরই প্রশাসন বিরোধী ভূমিকা ছিল।[৫৭] চিরকালই শান্তিপুরের এই এলাকা ঐতিহ্যগতভাবেই বিদ্রোহী। সর্বনন্দীপাড়ার 'ডাকাবুকো' ছেলে অজয় ভট্টাচার্যের প্রভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের 'ছাতার তলায়' আসা রাজনৈতিক কর্মী বুলু চ্যাটার্জীর ভাষ্যেও একই বক্তব্য প্রতিফলিত হয়। যুবকদের প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে অজয় ভট্টাচার্যের সহজাত প্রবণতা ও দক্ষতার কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। এই সময়েই অজয় ভট্টাচার্যর পৃষ্ঠপোষকতায় শান্তিপুরে 'যুবকল্যাণ সমিতি' নামে অপর একটি সমিতি গড়ে ওঠে যার সম্পাদক হয় শহর সি.পি.আই.(এম)-এর সদস্য দিলীপ বসাক। এর সঙ্গে যুক্ত আর যাদের নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে ছিলেন অনিল দাস, টুটুল গোস্বামী, রুদ্র ভট্টাচার্য, শিশির মুখার্জী, সুভাষ দত্ত প্রমুখ।

বুলু চ্যাটার্জীর বক্তব্য অনুসারে নকশালবাড়ি রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ার আগেই শান্তিপুরে এলাকা ভিত্তিক ঘাঁটি অঞ্চল তৈরী করার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল,—এই মতের প্রতিধ্বনি মেলে অন্য এক প্রাক্তন নকশালপন্থী কর্মী পূর্নেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতিতেও। নদীয়ায় বিক্ষিপ্তভাবে, গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতির প্রাথমিক কাজকর্ম চলছিল প্রথম শান্তিপুরে —সর্বানন্দীপাড়া, সাহাপাড়াকে কেন্দ্র করে যদিও এই গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং খুব মোটামাপেই ছিল এবং পুরোপুরি নকশালবাড়ির ছোঁয়াচ মুক্ত ছিল। প্রথমে উৎসাহবশত শুরু হলেও এই গেরিলা কাজকর্ম পরে নকশালবাড়ির মূল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়।

শান্তিপুরের এই গণসংগঠনের নেতারা দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিলেন। যুব ছাত্রদের মধ্যে এই গ্রামে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে সাতষট্টিতে। এরা যেতেন 'রেডগার্ড'-দের অনুকরণে শান্তিপুরের আশপাশের গ্রামে —যেমন হিজুলী, বরেন্দ্রনগর, বীরনগর, আঁশতলা, তাহেরপুর। আটষট্টি-উনসত্তরেও ছাত্র-যুব কর্মীরা গেছে চাঁদরা, ডোমকিরে, বাঁশডোব, তেঘড়ে —এইসব আদিবাসী অধ্যুষিত (সাঁওতাল বা রাজবংশী) গ্রামে, বা হিন্দু-মুসলমান চাষী অধ্যুষিত কদমপুর, হরিপুর, হিমায়েতপুর, বালিডাঙা, চরপানপাড়া, গয়েশপুর ইত্যাদি গ্রামে। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্ত গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্ম চলেছিল বলে পরবর্তীকালে সি.পি.আই.(এম-এল)-এর গোপন সংগঠনেরও কর্মীদের আত্মগোপনের দিনগুলিতে এই গ্রামগুলিতে তেমন কোন অসুবিধাই হয়নি।

"রাজনৈতিক ক্লাস শুধু পার্টি কর্মীদের নিয়েই হত না —গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষদের নিয়েও হত। প্রথমে তাদের কাছে টানার জন্য তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত, পরে সেই প্রসঙ্গেই রাজনৈতিক কথাবার্তা হত। কৃষকদেরও আলোচনায় অংশ নিতে বলা হত। গ্রামে গিয়ে এই ছেলেরা জন মজুরের বা যোগালের কাজ করত। আবার যে সব ছেলেদের চেহারায় শহুরে নাগরিকতার ছাপ বড় বেশি থাকত, তাদের রাত্রে ঘোরাফেরাই

নির্দেশ ছিল। গ্রামাঞ্চলে রাত্রেই পার্টি ক্লাস নেওয়া হত।"

"শান্তিপুরের আশেপাশে যুব-ছাত্রদের মাওবাদের স্বপক্ষে প্রচারের একটা অভাবিত নিদর্শন দেখা গিয়েছিল গোবিন্দপুর স্কুলে। গোবিন্দপুর গ্রামে নকশালপন্থী রাজনীতির প্রভাব তৃণমূল স্তরেও ছড়ায় —যার জন্য গ্রামবাসীদের তরফে নকশালকর্মীদের বিরুদ্ধে কোনদিন কোন প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আসেনি। এমন কি, হেডমাস্টারের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও এই স্কুলে মাওবাদের ওপর ক্লাস নেওয়া হত। এছাড়া গোবিন্দপুরে খতমও হয়নি।"[৬৮]

এবার আসা যাক শান্তিপুরের 'সশস্ত্র ঘাঁটি এলাকা' (Hsinhua News Agency -র 17th October, 1967-এর বিবরণ অনুসারে —যা আগেই দেওয়া হয়েছে) সর্বানন্দীপাড়া প্রসঙ্গে। সর্বানন্দীপাড়া শান্তিপুরের পূর্ব প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত এবং নিম্নবিত্ত মূলতঃ তাঁতজীবি পরিবার অধ্যুষিত। সাতষট্টিতে যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন শান্তিপুরে একটি ছাত্রের লরী চাপা পড়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এই গুজবকে কেন্দ্র করে যে পুলিশ পয়সার বিনিময়ে লরীটিকে ছেড়ে দিয়েছে। মূলতঃ ছাত্রদের সংগঠিত নেতৃত্বেই শান্তিপুরে শ্যামবাজার ফাঁড়ি আক্রমণ হয়। এস-ডি-ও-র গাড়ি পোড়ানো হয়। শহরে কারফিউ হয়, পুলিশ গুলি চালায় —'তাপস' নামে জনৈক ছাত্র মারা যায়। এই থানা আক্রমণের ফলশ্রুতি হিসাবে বেশ কিছু পুলিশী রাইফেল লুঠ হয় —যার মূলে অজয় ভট্টাচার্য, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়রা ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই 'মার্কসবাদ প্রচার সমিতি'র ক্রিয়াকর্মের ঘাঁটি হিসাবে সর্বনন্দীপড়া এলাকায় পুলিশী নজরদারি বাড়ে। কিন্তু পুলিশ ঢুকলেই এলাকার মহিলারা শাঁখ বাজিয়ে আগাম সংকেত পাঠিয়ে দিতেন সবাইকে সতর্ক করার জন্য। একটি নির্বিঘ্ন নিরাপদ ঘাঁটি এলাকা হিসাবে চিহ্নিত হল সর্বানন্দীপাড়া।

নকশালবাড়ি রাজনীতির অনুসারী অজয় ভট্টাচার্যের অনুগামীদের বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যাক পুলিশের বিবৃতি।

"Ajay Bhattacharya ....a Municipal Commissioner of Santipur Municipality and the Secretary of Marxbad Prachar Samity against whom an arrest warrant has remained unexecuted for the last about two months has already attained the stature of a rebel leader –like those of naxalbari. His hold on the local youth is now complete. He is, therefore, increasing his area of operations in the district. The Student Federation has also come under his influence. The number of posters released by them in support of Naxalbari rebels is staggeringly ominous.

Ajay Bhattacharya and his close associates are reported to be in possession of the rifles and ammunitions forcibly taken away during the dismal holocaust in which Shyambazar T.O.P. was burnt by an infuriated mob. They have developed a halo around themselves and flamboyantly move about in Sarbanandapur, a locality inthe heart of Santipur town, displaying utter contempt for state authority. . .....He is reported to be freely

cycling round the town visiting various places and organising processions. He organised a procession of about thiee hundred men on 7.7.67 which paraded Santipur town demanding rice at cheaper rate and increase quota of rice in ration."

–Extract from D.O. dated 9.8.67 from the S.P. of Nadia to Deputy IG of police, Presidency Range.

বাস্তবিকই গোটা নদীয়ার সঙ্গে শান্তিপুরেও তীব্র খাদ্য সংকট ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনই যে এই তীব্র প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার কারণ তা বোঝা যায়। সর্বানন্দীপাড়ার খেটে খাওয়া অভাবী মানুষদের সংঘবদ্ধ করা সে সময়ের প্রেক্ষিতে খুব কঠিন ছিল না —বিশেষ করে যে নেতারা গণসংগঠনের লোকসংযোগ শাখার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থেকে তৃণমূল স্তর অব্দি পৌঁছতে পারতেন —তাঁদের পক্ষে। অজয় ভট্টাচার্য ছাড়া আর যাঁরা বিক্ষুব্ধ সি.পি.আই.(এম) কর্মী হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কালাচাঁদ দালাল, কানাই বঙ্গ, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

শান্তিপুর সাহাপাড়ার নিম্নবিত্ত তাঁতী পরিবার থেকে শান্তিপুর গণনাট্যসংঘের সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে পরিচিত হন কালাচাঁদ দালাল। সাহাপাড়ায় —এখানেও অভাবী তাঁত শ্রমিকদেরই বসবাস —কালাচাঁদ দালাল যুবকদের জঙ্গী সংগঠন গড়ে তোলেন যার ফলে সাহাপাড়া কমিউনিস্ট পাড়া নামে চিহ্নিত হয়। রাজনীতির মূল হাল ছিল তাঁত আন্দোলন। "তন্তু জীবনের টানা আর বিপ্লবী জীবনের পোড়েনের সুতো দিয়ে নিখুঁত বুনুনী" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কালাচাঁদ দালালকে।[৫৯] পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জীর মূল্যায়নে শান্তিপুরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনস্বীকার্য নেতা ছিলেন কালাচাঁদ দালাল।

কানাই বঙ্গও সর্বানন্দীপাড়ার তাঁতী পরিবারের ছেলে, গণনাট্যসংঘের কর্মী। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় সর্বানন্দীপাড়ার গরীব পুরোহিতের ছেলে। ইনিও তাঁত শ্রমিক হিসাবে আন্দোলন শুরু করেন।

এই ব্যক্তি পরিচিতিগুলির এটুকুই প্রাসঙ্গিকতা যে নিজেরা যে অঞ্চল, যে পরিবেশ, যে দারিদ্র্য থেকে উঠে এসেছেন,সেই অঞ্চলের রাজনৈতিক স্পন্দন বোঝা এঁদের পক্ষে যতখানি সহজ ছিল, তাতে এলাকাভিত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা খুবই স্বাভাবিক পরিণতি ছিল। মনে রাখতে হবে, তখনও ছাত্র ফেডারেশনের অফিসিয়াল গোষ্ঠী এঁদের থেকে পৃথক হয়নি। ছাত্রশক্তি বিদ্রোহী শান্তিপুরের বাড়তি প্রতিরোধ ছিল।

পুলিশের একটি রিপোর্টে দেখা যায় তৎকালীন এম.এল.এ. কানাই পালকে শান্তিপুর বাজারে ৭.৮.৬৭ তারিখে একদল ছাত্র হেনস্থা করে —সস্তায় খাদ্যের দাবীতে, তারা আরও দাবী জানায় যে নদীয়ার জেলাশাসককে খাদ্যসংকট মেটানোর আশ্বাস দেওয়ার জন্য শান্তিপুরে আসতে হবে। কানাই পাল জেলাশাসককে আনতে ব্যর্থ হলে একদল ছাত্র ও যুব কল্যাণ সমিতির দিলীপ বসাক ও মদন সাহা (ইনি শান্তিপুর কলেজের ছাত্র ও ছাত্র ফেডারেশনের জেলা সম্পাদকও ছিলেন)-র নেতৃত্বে প্রায় শ'খানেক জনতা ও ছাত্র শান্তিপুর রেল লাইন

ও ন্যাশনাল হাইওয়ে অবরোধ করে। ১১ তারিখে খাদ্যের দাবীতে বার ঘন্টার জন্য শান্তিপুর শহরে বনধ পালিত হয়।[৬০]

দেখা যাচ্ছে নকশালবাড়ি নিরপেক্ষভাবেই শান্তিপুর একটা জঙ্গী-বাম-রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। খাদ্যসংকট ছিল তার প্রধান অনুঘটক এবং এই প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠান বিরোধী রাজনীতিতে একজোট হয়ে অংশগ্রহণ করেছিল ছাত্রশক্তি (যেখানে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের ছাত্রনেতা তনু মৈত্রর নাম পাওয়া যায়, শান্তিপুর কলেজের বিদ্রোহী ছাত্রকর্মী গৌরীশঙ্কর দত্ত, পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী, কিংবা তাপস চক্রবর্তীর নামের সঙ্গে), ছাত্র ফেডারেশনের হয়ে, সি.পি.আই.(এম) সমর্থিত বিধায়ক কানাই পাল (যিনি চিরকালই 'ইস্যু ভিত্তিক রাজনীতি'-তে বিশ্বাসী ছিলেন) এবং বিক্ষুব্ধ সি.পি.আই.(এম) কর্মী ও মার্কসবাদী প্রচার সমিতির অজয় ভট্টাচার্য ও তাঁর ব্যাপক অনুগামীরা। নকশালবাড়ি রাজনীতি আসার পরে এই গণক্ষোভকে মাওবাদের সপক্ষে টেনে আনতে নেতৃত্বের বিশেষ সময় লাগেনি। অন্তত এ ক্ষেত্রে চারু মজুমদারের বিশ্লেষণ যথাযথ ছিল যে "....এখনই নকশালবাড়ির ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশে postering শুরু হয়ে গেছে, কোলকাতা ও শহরতলীতে ব্যাপক পোস্টারিং শুরু হচ্ছে, আমাদের leaflet ওরা ছাপিয়ে বিলি করছে....বাংলাদেশের বিপ্লবী শক্তি আমাদের উপলক্ষ করে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। সুতরাং চেয়ারম্যানের কথা 'A single spark can start a prairie fire' বাস্তবে ঘটছে।"[৬১]

এই তীব্র খাদ্যসংকটের আরও একটি ছবি পাওয়া যায় গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে "During the month of June 1967, some rowdy people of Santipur were found to forcibly loot articles from different houses, shops and rice carrying cyclists and distributing it among themselves. Ajoy Bhattacharya now expelled from the party was found organising and encouraging actively this group from behind. On 13.6.67 at 20.30 hours about 500 men raided the MR shop of Satyanarayan Sen of Mudipara Lane, Santipur and forcibly looted away 37 and half quintals of rice. Besides this cash worth Rs. 200.00, one bag of rice and nine bags of wheat were also found missing from the shop. Ajoy Bhattacharya was found acting in the forefront in connection with this incident and he was made accused by Santipur P.S. case No. 20 dt. 14.6.67 u/s 147/447/379 IPC. On the same day wheat carrying in a tempo was also looted at Santipur."[৬২]

শান্তিপুরে অজয় ভট্টাচার্য হয়ে উঠলেন একজন ভাববাদী নায়ক —নিপীড়িত জনগণের 'চোখের মণি' —পুলিশের কাছে 'অধরা' অথচ শহরময় তাঁকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় এমনই তাঁর 'কবচকুণ্ডল'—সদৃশ বর্ম! অজয় ভট্টাচার্যের এই 'জীবনের চেয়ে বৃহৎ' ইমেজ তৈরীতে পুলিশের অবদানও কিছু কম ছিল না —সেটা আগের উদ্ধৃত রিপোর্টেরপরবর্তী অংশ উল্লেখেই প্রমাণিত হয়।

"After this incident the police were in search of Ajay Bhattacharya.

On 3.7.67 at about 10:00hrs. a police party led by O.C. Santipur P.S. went to Sarbanandipara to secure the arrest of Ajoy Bhattacharya and other accused. At the sight of the police in the locality an alarm created by the local people by blowing several conchshells simultaneously and a few hundreds of men came out of their houses to resist the police party in the execution of their duty. The police finding the situation very much awkward withdrew themsemves tactfully to avoid a major clash.

After this incident Ajay Bhattacharya was not found to take part in open activities and he was moving in a circumscribed area with a good number of his followers having arms in their possession. Subsequently he intensified secret activities among his staunch followers and organising them in militant lines....... . Now Sarbanandipara and Sahapara, where Ajoy Bhattacharya originally resides has become a cell and the police is not in a position to enter into the area without taking risk of a major clash even loss of life.

As a result of organisational efficiency of Ajay Bhattachraya, the common people of the area including a section of the students have become inclined to his extremist activities. Kanai Pal (M.L.A. - CPM) seems to have secret link with Ajay Bhattacharya in his extremist activites."

.....In conclusion this may be mentioned that no action is possible against this militant group of Ajay Bhattacharya, without taking the risk of exchange of fire as they are in possession of firearms."[৬৩]

এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৭.৮.৬৭ তারিখে যে নোট দেওয়া হয়েছে সেটিও উল্লেখযোগ্য।

"Ajay Bhattacharya's political stature as depicted herein seems to be grossly exaggerated. It is high time the district authorities should show courage and determination to arrest him."[৬৪]

প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখের দাবী রাখে যে অজয় ভট্টাচার্য-র এই 'জীবনের চেয়ে বড়ো' গড়ে তোলা চেহারা কালক্রমে তাঁকে এবং তার সঙ্গীদের মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। শুধু সি.পি.আই.(এম) নয়, তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও একটা পর্যায়ে এই গোষ্ঠীর ফারাক গড়ে ওঠে। শান্তিপুর শহরেই সত্তর পরবর্তী পর্যায়ে তরুণতর এক প্রজন্ম গড়ে ওঠে, যারা বাম রাজনীতিতে একদা অজয় ভট্টাচার্যের অনুগামী ছিল, সি.পি.আই.(এম-এল) পার্টি গঠনের পর তারা ক্রমে অজয় ভট্টাচার্য-কালাচাঁদ দালালদের পাল্টা গোষ্ঠী তৈরী করে। বীরেন দাশও সূত্রাগড় এলাকায় পৃথকভাবে নকশালবাড়ির আদলে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। একাত্তর-বাহাত্তরে শান্তিপুরে সি.পি.আই.(এম-এল) কর্মীরা রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সঙ্গে লড়াই করছিলেন নিজেদের মধ্যেও। অত্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণকারী একটি মন্তব্য বেরিয়ে এসেছিল অসীম চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শান্তিপুরে অজয় ভট্টাচার্য গোষ্ঠী সম্পর্কে —

"I sometimes hear about Ajay Bhattacharya of Santipur. As a member of

the State Committee, I did not get a good report on Ajay. He is a free lancing type something like Ashu Majumder of Jadavpur who of course died bravely."[৬৫]

এই মন্তব্য কয়েকটি দিক দিয়ে গভীর তাৎপর্য্য বহন করে। সত্তরের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে অসীম চ্যাটার্জীর এই মন্তব্য সে সময়ের শান্তিপুরের মাওবাদী রাজনীতির প্রায়োগিক চেহাবার একটি দর্পন।

আমরা সেই উজ্জ্বল সূর্যালোকের জন্যই অপেক্ষা করছি

"আমরা পার্টি সভ্যদের কাছে ঐক্যবদ্ধ হতে আবেদন করছি, আবেদন করছি পার্টি কর্মসূচীর এবং এর রাজনৈতিক লাইনের পক্ষে এককাট্টা হয়ে দাঁড়ানোর জন্য। আমাদের আবেদন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত ও ভুল আমাদের সমালোচকদের বিকল্প লাইনকে প্রত্যাখান করুন।" ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে বর্ধমানে সি.পি.আই.(এম)-এর কেন্দ্রীয় প্লেনামের প্রাক্কালে পার্টি কর্মসূচী এবং রাজনৈতিক লাইনের সপক্ষে পলিটব্যুরো (In defence of Party's Programme and Political line by Polit Bureau) শীর্ষক একটি সংযোজিত দলিলের উপসংহারে উপরে উদ্ধৃত আবেদন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।[৬৬] প্রথম কথা, কেন্দ্রীয় প্লেনামের আগে কেন্দ্রীয় খসড়া দলিলের সমালোচনায় অন্ধ্ররাজ্য প্লেনাম সহ অন্যান্য রাজ্যেও যে বিরুদ্ধ মত গড়ে উঠেছিল তাকে গোড়াতেই কাটছাঁট করা। দ্বিতীয় কথা নকশালবাড়ির ঘটনা ও তার সূত্র ধরে পরিবর্তিত পরিস্থিতির আঁচ করে রাশ টেনে ধরা। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে কেন্দ্রীয় কমিটির খসড়া দলিলের সমালোচকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।

"এই প্রসঙ্গে পলিটব্যুরোর বক্তব্যের কিছু লক্ষ্যণীয় বিষয় বা দিক ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসুদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। সি.পি.আই.(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির মতাদর্শগত খসড়া দলিলের সমালোচকদের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে তাঁদের প্রয়াস ছিল কিন্তু সি.পি.আই.(এম)-এর সামগ্রিকভাবে উল্লিখিত সব বিষয়ে সোভিয়েত বিরোধী মনোভাবকে জাহির করা বা তুলে ধরা এবং মতাদর্শগত ক্ষেত্রে সি.পি.আই.(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি তার দলিলে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সংশোধনবাদী নেতৃত্বের স্বরূপ সঠিকভাবে উদ্ঘাটন করেছে, তা দেখানো। বহু ক্ষেত্রেই সি.পি.আই.(এম) পলিটব্যুরো বুঝানোর চেষ্টা করেছে তারাই হলো সমালোচকদের চেয়ে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে বস্তুনিষ্ঠভাবে সংগ্রামরত।"[৬৭]

১৯৬৮-র এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বর্ধমান প্লেনামের অধিবেশন থেকে অন্ধ্রের প্রতিনিধিরা সমবেতভাবে ওয়াক-আউট করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা কেউ তা করেননি, কারণ (ক) আগেই পশ্চিমবঙ্গের নেতৃস্থানীয় সি.পি.আই.(এম) বিরোধী ব্যক্তিত্বদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, এবং (খ) প্লেনামে প্রতিনিধি বাছাই-এর ক্ষেত্রেও একটা চালাকি

করা হয়েছিল, চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী রাজ্যস্তর থেকে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে প্রতিনিধি ঠিক না করে পার্টির মনোনীত প্রতিনিধিদের পাঠানো হয়েছিল।

সি.পি.আই.(এম)-এর পক্ষ থেকে দৃঢ় ভাবে ঘোষণা করা হল —'নকশালবাড়ি নেতাদের নাশকতামূলক এবং বিভেদমূলক শ্লোগানের কোন স্থান নেই। তারা প্রকাশ্যেই এবং লজ্জাহীনের মত যেখানে সি.পি.আই.(এম)-এর বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজ সম্ভব তার জন্য এবং যেখানে সম্ভব নয় সেখানে বিভেদমূলক কার্যকলাপের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। পার্টির মধ্যে একটি বিভেদমূলক পার্টি গঠনের এইরূপ ষড়যন্ত্রকে বরবাদ করাতে হবে। আপোষহীন বিপ্লবীয়ানার নামে কট্টরদের ধ্বংসাত্মক কৌশলের বিরুদ্ধে প্রত্যেক সৎ পার্টি সভ্যকে দ্বিগুণ তৎপর হতে হবে।[৬৮]

পার্টির তরফ থেকে তৎপরতার এই বিপদসংকেত বাজাবার যথেষ্ট কারণ ছিল। ১৯৬৮-তে ডিসেম্বর মাসে কোচিনে অনুষ্ঠিত সি.পি.আই.(এম)-এর অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রকাশিত রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ১৯৬৪-তে যেখানে সি.পি.আই.(এম)-এর প্রাথমিক ও প্রার্থী সদস্যদের মোট সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০৬, ৩১৩ এবং ১২,৩৭০, ১৯৬৮-র প্রথমদিকে তা কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৫,৪০২ এবং ১১.০২৩-তে।[৬৯] পুলিশ রিপোর্টেও সাতষট্টিতে পুলিশের হিসাবমত পার্টির সদস্যসংখ্যা যা পাওয়া যাচ্ছে —পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা দাঁড়াচ্ছে ১৮,০০০ এবং এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যই যে 'উগ্রপন্থী' —অর্থাৎ ৬,০০০ তা বলা হচ্ছে।[৭০]

ইতিমধ্যে ১৯৬৭ সালের ১৩ই নভেম্বর কলকাতায় এই বিপ্লবী সি.পি.আই.(এম) নেতৃত্ব এক বৈঠকে মিলিত হয়ে রাজ্য পর্যায়ে একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি গড়ে তোলেন এবং সি.পি.আই.(এম)-এর মাদুরাই কমিটির গৃহীত মতাদর্শগত খসড়া যা বর্ধমান প্লেনামে তোলার জন্য তৈরী হয়েছিল —সেটি আলোচনা করেন। আলোচনা বৈঠকে চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত, কানু সান্যাল, শিউ কুমার মিশ্র, শ্রী আপ্পু, সত্যনারায়ণ সিং প্রমুখ নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী কমিউনিস্টরা উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকেই ঘোষিত হয় সেই বহুপ্রচারিত এবং বিতর্কিত তত্ত্ব —"আমাদের দেশে একটি চমৎকার বিপ্লবী পরিস্থিতি বিদ্যমান। কমরেড লেনিনের মতে যে সব সুনির্দিষ্ট লক্ষণ থাকলে বিপ্লবী পরিস্থিতি হয়, সবগুলিই এই পরিস্থিতিতে বিদ্যমান। কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট (মার্কসবাদী) পার্টির 'নয়া সংশোধনবাদী' নেতৃত্ব জনগণ ও পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা ভারতীয় বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।"[৭১]

এই ঘোষণাতে কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রধান কর্তব্য হিসাবে যেগুলি চিহ্নিত হল সেগুলি হল এই—

(ক) সর্বত্র ও সর্বস্তরের জঙ্গী এবং বিপ্লবী সংগ্রামগুলিকে বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে, নকশালবাড়ি ধাঁচের কৃষক-সংগ্রামগুলিকে গড়ে তোলা ও সমন্বিত করা,

(খ) অর্থনীতিবাদকে রোখার জন্য শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী মানুষদের মধ্যে

জঙ্গী সংগ্রাম গড়ে তোলা এবং এই সংগ্রামগুলিকে কৃষি বিপ্লবের পক্ষে নিয়ে যাওয়া,

(গ) আপোষহীন ভাবে সংশোধনবাদ ও নয়া সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াই চালানো এবং আধুনিক মার্কসবাদ-লেনিনবাদ রূপে মাও সে তুং-এর চিন্তাধারাকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং এই ভিত্তিতে পার্টির ভেতরের ও বাইরের বিপ্লবী শক্তিকে সুসংহত করা, এবং

(ঘ) মাও সে তুং চিন্তাধারার আলোয় ভারতীয় পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের ভিত্তিতে একটি বিপ্লবী কর্মসূচী ও নীতি গ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়া।

এই ঘোষণার ফলে ভারতের বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠী, ব্যক্তি ও উপাদানগুলিকে একত্রিত করার কাজ সহজ হল। 'This was beyond doubt a positive step towards the fulfilment of the organizational requirements of India's impending revolution'[৭২] তখনও অব্দি অসিত সেন —যিনি কলকাতার বাম-বিপ্লবী-গোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন এরকমই মত পোষণ করতেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে কো-অর্ডিনেশনের নেতাদের যে একটা প্রধান বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত ছিল অথচ তখন সেটা তাঁদের পক্ষে হওয়া সম্ভব হয়নি, সে কথাও স্বীকার করেছেন — "The bare fact that the overwhelming majority of the revolutionary force coming forward in support of the Naxalbari movement was quite new, young and inexperienced, should not have escaped the eyes of the veterans. these young cadres mostly belonging the petty bourgeois class were not adequately well versed in revolutionary theory either."[৭৩] বাস্তবিকই আটষট্টির শুরুতেই জেলায় জেলায় ছাত্র-যুবরা নতুন আন্দোলনের পক্ষে দল বাঁধে, উৎসাহের ঢল নামে, আবেগের ঢেউ ওঠে, প্রত্যাশার বান ডাকে। এই তরুণ প্রজন্মের কাছে সে সময়ের প্রথাগত রাজনীতির মুখ কেমন ছিল? অসিত সেনের ভাষায় —(ক) ".....they realised the futility and reformist nature of the parliamentary path being pursued by the leadership of both CPI & CPI(M)" —অর্থাৎ বামদলগুলির একঘেয়ে নির্বাচনের জন্য সংগ্রামের বুলি আর তাদের টানছিল না। তারা কি চাইছিল বা ভাবছিল? (খ) "They were fully convinced of the indispensability of adopting the path of armed struggle....." বাস্তবিকই 'সশস্ত্র বিপ্লব' কথাটা সেই বয়সকে আকর্ষণ করারই মত, (গ) তারা কোথায় ফাঁদে পা দিল? "....their earnest revolutionary zeal and exuberance was to a great extent vulnerable to revolutionary impetuosity and adventurism."[৭৪] প্রকৃতপক্ষে তখনও অব্দি 'নকশাল'বাদ ছাত্র-যুব ছাড়া সমাজের সাধারণ লোক, অথবা শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়ায় নি। এমনকি একই জেলায় বিপ্লবী চিন্তাভাবনা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন এমন দল বা ব্যক্তিরাও ছিলেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বিক্ষিপ্ত ভাবে ছাত্ররা —প্রায় ব্যক্তিগত কারণেই নকশালবাড়ির আদলে কৃষকদের নিয়ে কাজ করার কথা ভাবছিলেন, রেড-গার্ড স্কোয়াড গড়ে বিভিন্ন জায়গায় গ্রামে যাওয়াও হচ্ছিল, জেলা শহরগুলিতে ছাত্ররা কলকাতার সঙ্গে

যোগাযোগ রাখছিলেন এবং সেই ভিত্তিতেই গড়ে উঠছিল জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে কো-অর্ডিনেশন। নদীয়াতে তখনও (৬৭-র শেষ, ৬৮-র সূচনাপূর্বে) নতুন রাজনীতির ভ্যানগার্ড হয়ে ছিল ছাত্ররা। পুরোনো কমিউনিস্ট নেতারা কেউ তখন কট্টর 'মধ্যপন্থী' তকমা-আঁটা, কেউ নতুন রাজনীতি সম্পর্কে গোপনে আগ্রহী, কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্বে দীর্ন সুতরাং পুলিশ ও পার্টির কাছে 'উগ্রপন্থী' হিসাবে চিহ্নিত, ব্যতিক্রমী ভূমিকায় কৃষ্ণনগরের সি.পি.আই.(এম) শহর কমিটি, যারা দলবেঁধে 'মাওবাদী'। সবচেষ্টাই তখনও চলছিল ব্যক্তিগত স্তরে — একদিকে সুশীতল রায়চৌধুরীর প্রায় একক ও ব্যক্তিগত প্রয়াসে গোটা ভারত জুড়ে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলার ও কো-অর্ডিনেশনের পতাকার তলায় আনার চেষ্টা চলছিল, অন্যদিকে জেলা স্তরে, বিভিন্ন জায়গায়, কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রভাবে নতুন রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে ছেলেরা আসছিল, স্টাডি সার্কেলে নাম লেখাচ্ছিল, গ্রামে যাচ্ছিল, মশাল মিছিল বার করছিল, 'দেশব্রতী' আনাচ্ছিল ও পড়ছিল, নকশালবাড়ির স্বপক্ষে দেওয়ালে লিখছিল এবং 'রেডবুক' মুখস্থ করছিল।

এই পর্বে উনসত্তর অব্দি, নদীয়া জেলায় বিপ্লবী কমিউনিস্টদের মধ্যে মূল অংশ ছিল ছাত্ররা। কমিউনিস্ট পার্টিতে আকর্ষণের ব্যাপারে ব্যক্তিব ভূমিকা থাকে প্রধান —এ জেলায ছিলেন নাদু চ্যাটার্জী। প্রেসিডেন্সী কনসোলিডেশন-এর সঙ্গে নদীয়ার ছাত্রদের যোগাযোগ ছিল গাঢ়। গ্রামে এলাকাভিত্তিক মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার কাজে মেদিনীপুরে ডেবরা-গোপীবল্লভপুর এলাকায় প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশনের সহযোগিতায় অসীম চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে কৃষ্ণনগর থেকে যায় তাপস চক্রবর্তী, অমল সান্যাল ও মণি অধিকারী। পরের দিকে নদীয়ার করিমপুর অঞ্চলে মুকুল চ্যাটার্জীর সূত্র ধরে গ্রামে যাওয়া আরম্ভ হয. অন্যদিকে আড়ংঘাটা এলাকায় গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে কৃষকদেব মধ্যে কাজ শুরু হয়, নদীয়ার পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে মুড়াগাছা, ভেবোডাঙ্গা, দাদুপুর অর্থাৎ নাকাশীপাড়া থানাকে কেন্দ্র করে এবং গঙ্গার অপরদিকে পূর্বস্থলী থানাকে ঘিরে একটা ব্যাপক এলাকাতেও কাজ শুরু হয়েছিল। চাপরা থানার শিবপুর —চাঁদেরঘাট এলাকাতেও কৃষকদের নিয়ে ভাল কাজ হয়।

খড়্গাপুরের এক বিপ্লবী ছাত্র-কর্মী কমল লাহিড়ী —যিনি ডেবরা-গোপীবল্লভপুরে কাজ করতে যান, তৎকালীন নদীয়ার বিপ্লবী রাজনীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন যে, নদীয়া জেলায় পাশাপাশি দুটো লাইন কাজ করত —প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশন ও কো-অর্ডিনেশন। প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশন 'গ্রামে চলো' ডাকের ওপর জোর দেয় এবং কো-অর্ডিনেশন তখনও অব্দি বিপ্লবী গণসগংঠন তৈরী ও প্রচার করার ওপর জোর দেয়। নাদু চ্যাটার্জী যদিও কো-অর্ডিনেশন লাইন-এর পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু বিশেষ করে কৃষ্ণনগর পলিটেকনিক ও অন্যান্য অঞ্চলের কিছু ছাত্ররা গ্রামে যাওয়ার ওপরে জোর দেন।

তাঁর মন্তব্য —আটষট্টিতে গণসংগঠন গড়ে তোলার রাজনীতি সবচেয়ে শক্তিশালী হয় গোপীবল্লভপুরে সন্তোষ রাণার নেতৃত্বে মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন ও ধানকাটার আন্দোলন নিয়ে। একটা গণভিত্তি ও গণ আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু এর থেকে সরে

যাওয়া শুরু হল ঊনসত্তরে সি.পি.আই.(এম) তৈরী হওয়ার পর। কার্যতঃ প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশনই অ্যাকশন স্কোয়াড তৈরীতে নেতৃত্ব দেয়। ১৯৬৯-এর ২রা সেপ্টেম্বর গোপীবল্লভপুরে খতম নীতি চালু হয়ে গেল। নদীয়াতে এর প্রভাব পড়ল ছাত্র-যুবদের ওপর।

নদীয়াতে ছাত্র-ফেডারেশন কর্মীরাই ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসে নকশালবাড়ির সমর্থনে। সতীশ দেবনাথ ও মদন সাহার (পূর্বতন জেলা এস.এফ-এর সম্পাদক) নেতৃত্বে একটি গোষ্ঠী আটষট্টি নাগাদ অফিসিয়াল পার্টিকেই বেছে নেয়। যে গোষ্ঠী নতুন বিপ্লবী শিবিরে চলে এল, তাদের মধ্যে কৃষ্ণনগর পলিটেকনিকের ছাত্রনেতা মহিমময় চন্দ, দেবপ্রিয় বাগচী, অঞ্জন মজুমদার, অরুণ মুখার্জী, পঙ্কজ জোয়ার্দার, বিপ্লব ব্যানার্জী, বিপুল পরামাণিক, কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র সমীর বিশ্বাস, দীপক বিশ্বাস, দেবব্রত মুখার্জী, রবীন মোদক, বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও চাকদহের ছেলে নিতাই সরকার, অরুণ ব্যানার্জী, অমল গুহ, নবদ্বীপে প্রতুল ব্যানার্জী, সুমিত সাহা (এঁরা প্রগতি পরিষদ কেন্দ্রিক কর্মী ছিলেন না), ধুবুলিয়া-মুড়াগাছার শংকর বাগচী, নিত্য কুণ্ডু, গৌরাঙ্গ শিকদার, দিলীপ চুনারী, তপন দালাল আরও বহু ছাত্র কো-অর্ডিনেশনের সঙ্গে থাকে।[৭৫] ব্যতিক্রম হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকে রাণাঘাট —যেখানে বিপ্লবী রাজনীতিতে ছাত্রের সংখ্যা ছিল কম এবং শান্তিপুর —যেখানে মূল বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের বাহক ছিল পুরোনো কমিউনিস্ট নেতৃত্বের একাংশ, ছাত্ররা ছিল সহযোগী অংশ। এছাড়া বিপ্লবী রাজনীতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি ছিল কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়। এখানকার বহু ছাত্রনেতা নদীয়ার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে, বিশেষতঃ চাপরা থানা এলাকায় ও হরিণঘাটা এলাকায় কাজ করতে গিয়েছিল যেমন অমল লাহিড়ী, তুষার সিনহা, ভাস্কর মুখার্জী প্রমুখ —এঁরা কেউই নদীয়ার ছেলে ছিলেন না, কেবল বিপ্লব গড়ে তোলার জন্যই কল্যানীতে আসেন। বিপ্লবী রাজনীতির কাজ করার জন্য কৃষ্ণনগরের ছাত্র দিলীপ বাগচী যান উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজের ছাত্র ও আড়ংঘাটার ছেলে কুমুদ সরকার নদীয়ার বগুলা কলেজে 'কোনো ইউনিট না থাকায় গড়ে তোলার জন্য' ভর্ত্তি হন, কলকাতার সুবোধ মজুমদার —যিনি যুক্তফ্রন্টের আমলে কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় গড়ে ওঠা 'গণকমিটি'র সেক্রেটারী হিসাবে সি.পি.আই.(এম)-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, 'ঊনসত্তরে সুশীতল রায়চৌধুরীর পরামর্শে চলে আসেন মামাবাড়ি ভেবোডাঙ্গায় এবং এখানেই পাকাপাকি ভাবে থাকতে শুরু করেন।

'সাতষট্টির পর থেকেই পাড়ার যুবক ছেলেদের বিপ্লবী রাজনীতিতে দীক্ষিত করার কাজে ঘনঘন মিটিং করা হত। কৃষ্ণনগরের ষষ্ঠীতলায় (নকশালযুগে প্রায় একটি পকেট-এ পরিণত হয়েছিল যেখানে নকশালপন্থী যুবকরাই শেষ কথা বলত) ছাত্রকর্মী পঙ্কজ জোয়ার্দার — যিনি পরে নতুন পার্টির শহর কমিটির সেক্রেটারী হন —পাড়ার ছেলেদের ধরে ধরে স্টাডি সার্কেল করতেন। 'চেয়ারম্যানের তিনটি লেখা' ও রেড বুক সবাই পড়ত। 'রেড বুক'-এর কোটেশনগুলি প্রবলভাগে আবেগতাড়িত করে তুলেছিল ছাত্রদের। তখনও কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি

সম্বন্ধে বাস্তব কোনো ধারণা তৈরী হয়নি। উনসত্তরের পরপর সচেতনতা হয় যে তারা আগুন নিয়ে খেলা করছে। এ নয় যে আশপাশের পাড়ার বা এলাকার সমস্যাগুলি নিয়ে মাথা ঘামানো হচ্ছে না, বা involvement ছিল না, তবু সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ থেকে উত্তরণ দরকার —এই বোধ তৈরী হচ্ছিল। প্রথমদিকে পাড়ার লোকদের সহানুভূতি ছিল, ভালবাসা ছিল। কিন্তু একবার পুলিশী নিপীড়ন শুরু হলে এই দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটাই পাল্টে গেল —সবাই যেন কুঁকড়ে গেল।'

বক্তা নিজে কৃষ্ণনগর পলিটেকনিক-এর ছাত্র ও ষষ্ঠীতলার [৭৬] ছেলে। গ্রামে প্রথম কাজ করতে যান চাপরা এলাকায়। গ্রামের কাজ নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা —'গ্রামের নিপীড়ন ও দারিদ্র্য সম্পর্কে প্রথমদিকে খুব একটা উত্তেজনাকর ধারণা তৈরী করাই ছিল মনের মধ্যে। ছাত্রদের বোঝানো হত যে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের নিজেদের রাজ কায়েম হওয়া দরকার। যেসব গ্রামে নকশালবাড়ির নামটুকুও পৌঁছায়নি, সেখানে অন্ততঃ এটুকু প্রচার করা গিয়েছিল যে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে। অতএব গ্রামে মহাজন, সুদখোর, জোতদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।'

'গ্রামে নিজেদের কন্ট্যাকট তৈরী করতে বলা হল। গ্রামে গিয়ে base তৈরী করতে হবে। কিন্তু দু-তিনদিনের জন্যে গ্রামে গিয়ে ইনফর্মেশন আনা ছাড়া কিছু হত না। এই ইনফর্মেশন আরও পরে কাজে আসত, যখন শহরে কেউ 'wanted' হয়ে যেত, সে তখন সেই গ্রামে গিয়ে 'শেলটার' নিত।'

নকশালবাড়ি রাজনীতিতে দীক্ষিত কৃষ্ণনগর পলিটেকনিকের আরেক ছাত্রনেতা —বিপুল পরামাণিকের কথায় —'আটষট্টিতে, কলেজে ঢুকে দেখা গেল যথেষ্ট উত্তেজনাময় ও বিতর্কে ভরা পরিবেশ। কলেজে বিপ্লব ব্যানার্জী, অঞ্জন মজুমদার, প্রিয়তোষ মুখার্জী, পরিমল দে, অভিজিৎ বোস —এরা সবাই সহপাঠী বা অল্প সিনিয়ার। শুভ্র সান্যাল, দেবপ্রিয় বাগচী, মহিম চন্দ প্রমুখ তখন কৃষ্ণনগরে ছাত্র আন্দোলনের নেতা। কৃষ্ণনগর শহরের পোস্ট অফিসের মোড়ে 'স্বাধীন বিড়ি ফ্যাকটরী' নামে একটি বিড়ির দোকানে ঘূর্ণীর বিজয় সাহা, সুব্রত সাহা (দেওয়াল লিখন ভাল পারতেন) মহিম চন্দ, রমা সাহা, তাপস চক্রবর্তী, নাড়ু বিশ্বাস (বিড়ি শ্রমিক), শক্তিনগরের বেণী সরকার, নাদু চ্যাটার্জী, অরুণ মুখার্জী (এই সময় কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীতে চাকরী করতেন, পলিটেকনিককে বক্তৃতা করতেন, স্ট্রীট লেকচারিং করতেন, পরে পুলিশের হেফাজতে মারা যান) —সবাই আসতেন। হাতারপাড়া অঞ্চলের বেশ কিছু শ্রমিক আসতেন, যেমন বিশ্বনাথ বিশ্বাস —ইনিই 'দেশব্রতী' আনার কাজটা করতেন।'

আটষট্টিতে কৃষ্ণনগর টাউন হল-এ বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলন হয়। শুভ্র সান্যাল-[৭৭] এর সেক্রেটারী ছিলেন। পরবর্তীকালে সি.পি.আই.(এম)-এর প্রাক্তন বিধায়ক সাধন চ্যাটার্জী-এর সেক্রেটারী হন। এই বছরেই 'বিপ্লবী' গ্রুপ এই ইউনিয়ন ত্যাগ করে। বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন কেষ্ট বিশ্বাস, রবি, মণি অধিকারী —এঁরা গ্রামে গিয়েছিলেন

কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে।

ফিরে যাওয়া যাক বিপুল পরামাণিকের বিবরণীতে —'আটষট্টিতে একদিকে কলেজে অটোমেশন, মেকানাইজেশন নিয়ে বিতর্ক চলছে, অন্যদিকে শ্লোগান পড়ছে —বাঁচতে গেলে লড়তে হবে, লড়তে গেলে ঐক্য চাই, সেই ঐক্য দেখিয়েছে নকশাল নকশাল।' শহরে ব্যাপক যুব-ছাত্রের দল নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমর্থনে ছিল। এই সময় কৃষ্ণনগর জজ কোর্টে, পাড়ায় পাড়ায় —ছেলেরা মিটিং করতেন। বাজারে, চায়ের দোকানে যেখানেই হোক বিতর্ক তোলা হত। তর্ক হত ভিয়েতনাম নিয়ে, ম্যাকনামারা নিয়ে, [৭৮] খাদ্যের প্রশ্নে, চাকরীর প্রশ্নে, শিল্পনীতির প্রশ্নে। ছাত্রদের হাতে হাতে তখন ঘুরছে —হুনান রিপোর্ট, চেয়ারম্যানের তিনটি লেখা, চিং কাং পাহাড়ের সংগ্রাম, পত্রিকার দুনিয়ায় —এসব লেখা। শশাঙ্কর লেখা পড়ে খুবই অনুপ্রাণিত লাগত। প্রায় তিনশ কপির ওপর দেশব্রতী আসত শহরে। বড় বড় ব্যানার লেখা হত। দেওয়াল লিখন খুব বেশী শুরু হল ঊনসত্তর-এর পর থেকে 'জোতদার খতম চলছে চলবে, জনগণকে সশস্ত্র ও সংগঠিত করার একমাত্র পথ হল গেরিলা যুদ্ধ, (চীনা পার্টির নবম কংগ্রেসের পর লিন পিয়াও-এর রিপোর্ট থেকে একটা বিচ্ছিন্ন লাইন তুলে ধরা হতে থাকল) বন্দুকের নল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস।'

গ্রামে যাওয়া প্রসঙ্গে —'কলেজের ছাত্র থাকাকালীন রেড গার্ড স্কোয়াড তৈরী হত। গ্রামের খবরাখবর নেওয়া, গ্রামে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ অর্থাৎ মহাজনী ও জোতদারী শোষণের স্বরূপ এসব খবর নিতে ঘূর্ণী-রাধানগর এলাকায় (ঘূর্ণী-রাধানগর কৃষ্ণনগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী এলাকায় অবস্থিত) যেমন হরনগর, বা অন্যদিকে কুলগাছি, গলাকাটা ভাতজংলা, পোড়াগাছা গ্রামে কাজ করতে যেতেন। যেখানেই একটু ইতিবাচক source পাওয়া যেত, সেখানেই চলে যাওয়া হত, এত উৎসাহ ছিল। কৃষকদের বোঝা ও বোঝানোর চেষ্টা করা হত শ্রেণীসংগ্রাম কাকে বলে, শ্রেণীবিশ্লেষণ কিভাবে করতে হয় ইত্যাদি।'

কৃষ্ণনগর-এর বিপ্লবী ছাত্র নেতা মহিমময় চন্দ (ইনিও পলিটেকনিক-এর ছাত্র) জানিয়েছেন —'সে সময়ের শহরে যে ছাত্ররা নকশালবাড়ি রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের মূলতঃ দুটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে গ্রামে গ্রামে গিয়ে রেড গার্ড এ্যাকশন, দ্বিতীয় শহর বা গ্রামের স্কুলে স্কুলে গিয়ে 'লাল পতাকা' তোলা। শহরাঞ্চল বা গ্রামের স্কুলগুলিতে (সাতষট্টি থেকে ঊনসত্তর পর্ব অব্দি) গিয়ে ছাত্রদের বোঝানো বা টিফিন পিরিয়ডে গেট লেকচারিং করা নকশালবাড়ি কি ও কেন? কৃষ্ণনগরে বিশ্বনাথ নন্দী, অঞ্জন মজুমদার, তপন সান্যাল—প্রমুখ ছাত্ররা স্কুলে স্কুলে গিয়ে প্রচার চালাতেন।'

নদীয়ায় যুব-ছাত্রদের মধ্যেই নকশালবাড়ি রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সবচেয়ে বেশী। ঊনসত্তর সালে নেওয়া একটি পবিসংখ্যান তথ্যে এই দিকটা পরিষ্কার বোঝা যায়। এখানে নদীয়া জেলার বিভিন্ন কলেজের সামগ্রিক চেহারাটা ফুটে উঠেছে। যদিও স্কুলগুলি এই তালিকায় নেই —কিন্তু পরবর্ত্তীকালের বিভিন্ন রিপোর্টে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদের অংশগ্রহণের সংবাদও পাওয়া যায় (প্রসঙ্গক্রমে এই তথ্যগুলি পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে)।

সারণী - ৩-২

ক্রমিক নম্বর	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম	মোট ছাত্রসংখ্যা	মাওবাদী রাজনীতিতে প্রভাবিত ছাত্রের শতকরা হিসাব
১।	নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর	১১৫০	৩০%
২।	কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ	৭৫০	৫%
৩।	কৃষ্ণনগর কমার্স কলেজ	২০০	৭০%
৪।	বিপ্রদাস পালচৌধুরী ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কৃষ্ণনগর	৩০০	৮০%
৫।	রাণাঘাট কলেজ	১২০০	১৫%
৬।	শান্তিপুর কলেজ	৮০০	১০%
৭।	করিমপুর কলেজ	৬২২	৫%
৮।	মাজদিয়া কলেজ	৩০০	উল্লেখযোগ্য নয়
৯।	বগুলা কলেজ	১২০০	১২%
১০।	কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	২২০০	৪০%

Amiya Samanta : Emerging Profile; A Secret Police Document, pp.23.

তালিকাটি খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, একেবারে গ্রাম এলাকার কলেজগুলি তৎকালীন বিপ্লবী রাজনীতিতে খুব কমই প্রভাবিত হয়েছিল। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে —(ক) গ্রামের কলেজ-পড়ুয়া ছেলেরা সাধারণভাবে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ঘরের ছেলে হওয়ার সুবাদে শোষকশ্রেণীর অংশীদার ছিল, এবং (খ) শহরাগত মাওবাদী বিপ্লবী ছাত্ররা আধা গ্রামীণ এলাকার কলেজগুলিতে প্রচারের চেয়ে গ্রামের ভূমিহীন চাষী বা ক্ষেতমজুরদের অধিকতর উপযোগী 'বিপ্লবী উপাদান' হিসাবে চিহ্নিত করে অথবা (গ) জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চলের গলাগলি অবস্থান, কলকাতা ও গ্রামের চেহারায় যেরকম অবিশ্বাস্য বৈপরীত্য দেখা যায়, মফস্বল ও গ্রামের অবস্থানগত নৈকট্য তা হতে দেয় না। জেলা শহরের ছাত্ররা গ্রামে গিয়ে, মাটি কামড়ে থাকা, দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে যায়নি। সাধারণতঃ মফস্বল শহরের ছেলেরা গ্রামে যেত, আবার শহরে ফিরে আসত। নদীয়ার ক্ষেত্রে এটা একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে গ্রাম এলাকায় যেসব 'লাল এলাকা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই এলাকায় শহরের ছেলেদের অংশগ্রহণ ছিল আংশিক—প্রয়োজনমত গিয়ে কোনো একটি বিশেষ কর্মসূচীতে— প্রায়শই শ্রেণীশত্রু খতম অথবা পুলিশের অস্ত্র ছিনতাই করার ঘটনায় নেতৃত্ব দেওয়া। অথবা শেল্টার নেওয়ার সময়ও এইসব নির্দিষ্ট এলাকাকে ব্যবহার করা হত। কিন্তু যে সমস্ত ঘাঁটি এলাকা সত্তর-একাত্তর নাগাদ নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠেছিল—যেমন

মুড়াগাছা, ভেবোডাঙ্গা, পূর্বস্থলী বেল্ট, অথবা আড়ংঘাটা-রাণাঘাট, চাকদা, বনগাঁ অথবা তেহট্ট এলাকার শিবপুর-চাঁদের ঘাট এলাকা বা আরও পরবর্ত্তীতে গড়ে ওঠা চাপরা থানার কালিনগর গ্রাম—এইসব ঘাঁটি এলাকার রূপকাররা ছিলেন সেইসব গ্রামাঞ্চলেরই বাসিন্দা। শহরের যেসব কর্মীরা গ্রামে গিয়ে কাজ করেছিলেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই হয় ব্যক্তিগত কারণে অথবা পুলিশী গ্রেপ্তার এড়াতে গ্রামে যান ও অল্প কিছুদিন বাদেই শহরে ফিরে আসেন। অর্থাৎ শহরের ছেলেরা মূলতঃ শহরকেন্দ্রিক কাজকর্মেই আবদ্ধ থাকে। 'শ্রমিক এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের সাথে' ছাত্রদের একাত্ম হওয়ার জন্য চারু মজুমদারের আহ্বান কতখানি বাস্তবে পালন করা গিয়েছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রনেতার[৭৯] কথায়। 'গ্রামে ডিক্লাসড্ হতে গিয়ে যথার্থভাবে সফল হওয়া যায়নি। চাকদহ থেকে বনগাঁর দিকে রসুলপুর গ্রামে প্রথম যাওয়া হয়। যদিও গ্রামবাসীরা এই বিপ্লবী ছাত্রদের আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিল, তারা এদের শুতে দিয়েছে, খেতে দিয়েছে, পুলিশী রেইড-এর সময় বাঁচিয়েছে। কিন্তু কোন জায়গাতেই স্থায়ীভাবে টেঁকা যায়নি। ভূমিহীন মজুরের সঙ্গে ছাত্ররা নিড়ানি ধরেছে কিন্তু চেহারা আর চরিত্রটা রয়ে গেছে শিক্ষিত মাস্টারবাবুর।' এর পরবর্ত্তী সময়ে 'কৃষকদের খতমের লাইন নেওয়াতে খুবই কষ্ট করতে হয়েছে। খতম লাইন নিয়েছিল কিছু লুম্পেন কৃষক - সাধারণ গৃহস্থ কৃষক খতম করতে ভয় পেতো'। এই ছাত্রনেতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন ছাত্র ফেডারেশনের বিপ্লবী অংশকে সংহত ও প্রসাহিত করতে। উনিশশো ছেষট্টি থেকেই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংসদ আন্দোলন চালাচ্ছিল একে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিণত করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। এছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়কে পুরোপুরি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার চেষ্টার বিরুদ্ধেও আন্দোলন চলছিল কারণ ছাত্রদের ধারণায় তা ছিল বর্হিবিশ্ব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার চক্রান্ত।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দিকে কলকাতা থেকে সর্বক্ষণের পার্টি কর্মী (তখনও সি.পি.আই-এম) নিয়ে গিয়ে প্রচারের কাজ করতে হত—কারণ অমল লাহিড়ীর ভাষা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-মানসিকতাই ছিল প্রচণ্ড কেরিয়ারিস্ট। আটষট্টিতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা আন্দোলন গড়ে তোলা হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যখন কল্যাণীর উপাচার্য হয়ে এলেন। উত্তরবঙ্গে বিপ্লবী ছাত্রদের গ্রেপ্তাব-এর প্রতিবাদে তাঁকে দুই রাত ঘেরাও করে রাখে ছাত্ররা। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে এই নতুন বিপ্লবী রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে সাতষট্টির পর থেকেই। সাতষট্টিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ মিছিল করে যায় ও শ্লোগান তোলে 'শিক্ষাক্ষেত্রে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনেব এর অনুপ্রবেশ বন্ধ কর', 'মার্কিন দালাল নিপাত যাক' ইত্যাদি।[৮০] তখনও KUSF তৈরী হয়নি—'সংগ্রামী' ছাত্ররা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় Students' Action Committee (Arts and Science) নাম দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল। আটষট্টিতে এসে এই নতুন ধারার ছাত্ররা BPSF-এর পাল্টা সংগঠন হিসাবে KUSF গড়ে তোলেন। এই প্রসঙ্গে অমল লাহিড়ীর বক্তব্য অনুযায়ী কল্যাণী

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রভাব কাজ করেছে খুব। বি.পি.এস.এফ-এর গতানুগতিক ছাত্র-রাজনীতির গড্ডলিকা প্রবাহ থেকে একটা নতুন দিশার খোঁজে KUSF-কে অনেক অধ্যাপকও সমর্থন করছিলেন। কিছু মেধাবী ছাত্র—রাজনীতির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল না, তারাও সমর্থন করেছিল এই 'বিপ্লবী' সতীর্থদের। যেমন পরিতোষ বসু নামে একজন ছাত্র, যিনি পদার্থবিদ্যার শিক্ষান্তের পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে মঞ্চে দাঁড়িয়ে পূর্ব পরিকল্পনামাফিক হঠাৎ আওয়াজ তোলেন; ডিগ্রী নয়—চাকরী চাই।[৮১] বিশাল প্রতিক্রিয়া হয় এই ঘটনায়। কিছু অধ্যাপকও সে সময় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে চীন বিপ্লব, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে পড়াশুনা, লেখাপড়া করতেন, এমনকি অন্তরালে মাওবাদী ছাত্রদের সংগঠনে সাহায্য করতেন, যেমন রসায়নের অধ্যাপক মণি মজুমদার, অর্থনীতির অধ্যাপক রতন খাসনবিশ বা পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ অশোক বসু[৮২]। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু গবেষক-রাও নকশালবাড়ি রাজনীতির সমর্থক হিসাবে পুলিশের রেকর্ডে পরিচিত হন। তাঁদেরই একজনের একটি লিখিত বিবৃতি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল ঃ—

"In 1967, after the Naxalbari incident, I started reading books on Marxism. The idea that the Naxalites had been struggling against the oppression on the peasantry, inspired me...Towards the end of 1967 I went to Haldibari (for job in Haldibari High School). As I was afraid of village politics I kept myself aloof from politics during my stay at Haldibari. While in Haldibari I hardly had read books on politics."

"After my joining Kalyani University, I came in contact with Prof. Ashoke Bose...I invited discussions with Prof. Bose on 'anti-imperialism' when I became convinced that Prof. Bose was also against imperialism and nurtured 'pro-chinese' ideals. At the same time he was not in favour of the politics of the CPI-ML. Thus we agreed on these two points viz. anti-imperialism and anti-CPI(ML) politics. But I could not support the 'pro-chinese ideals' and on this scope we had some discussions. ...As such we did not read the organs and journal of the CPI (ML). It is because of my support for 'anti-imperialism' I read a few books on Marxism which were :

1. On Art and Literature–Marx
2. A portion of Poverty of Philosophy–Marx.
3. What is to be done–Lenin.
4. Dialectical Materialism–Maaurice Corn Forth.
5. On Contradiction, on Practice-Mao Tse Tung
6. Cultural Revolution in China–Joan Robinson.
7. Anti-Duhring–Engels.

By reading these books, I got the idea that Marxist Philosophy is more or less correct. I developed an idea that politics of the CPI(ML) was not soundly based on Marxist-Leninist theories. It was very inconsistent and it sometime propagated politics which was anathema to Marxism."[৮৩]

এই বক্তব্যের প্রথমদিকে নকশালবাড়ি রাজনীতি সম্পর্কে কিছু সতর্ক পদচারণা থাকলেও পরের দিকে লেখক খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করেছেন যে মাও-বাদী রাজনীতিতে তাঁর আস্থা জন্মায়নি। অবশ্যই মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে পড়াশুনো করে আসা অর্থাৎ তাত্ত্বিক জ্ঞানসম্পন্ন ছাত্র নকশালবাড়ি তাত্ত্বিকদের দলে খুব কমই ছিল। অমল সান্যাল-এর মতো মেধাবী ছাত্র যিনি তাঁর প্রেসিডেন্সি পর্বের পরে বসিরহাট কলেজের ছাত্র হিসাবে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশুনা করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন, তিনি কবুল করেছেন যে মার্কসীয় তত্ত্ব গভীর নিবেশে পড়াশুনা করার পর তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, যে জ্ঞান বা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি মাওবাদী রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন, তা খুবই অসম্পূর্ণ ছিল। ফলতঃ ওপরে উদ্ধৃত বিবরণের লেখকই হোন বা প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশনের অন্যতম কর্মী অমল সান্যালই হোন, তাঁদের স্ব স্ব অভিজ্ঞতা থেকে চূড়ান্ত পর্বে যে সিদ্ধান্ত আসেন তার ভাষা পৃথক হলেও বক্তব্য থাকে অভিন্ন যে, তাঁরা কেউই সক্রিয় রাজনীতি সম্পর্কে আর আগ্রহী নন—বরং একটি জুতসই চাকরিই অধিকতর কাম্য।[৮৪]

পশ্চিমবঙ্গে সি.পি.আই (এম-এল) পার্টির অন্যতম প্রধান অংশ ছাত্র-যুব শক্তি যে তাত্ত্বিক সংগ্রামের দিক থেকে কতখানি দুর্বল ছিল, সে প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর-এর একটি মন্তব্য স্মরণীয় যে—"...তাঁরা শুধু মাও সে তুঙ-এর লাল বইকেই সর্বজ্ঞানের আধার বলে ধরে নিয়ে সেটাই মুখস্থ করার ঝোঁক সৃষ্টি করলেন, হেগেল এবং মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন, স্টালিনও মাও-এর রচনাগুলি অধ্যয়নের উপর গুরুত্ব আরোপে কোন প্রয়োজনীয়তাই বোধ করলেন না। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই 'জনে জনে চক্রান্ত' ও শ্রেণীশত্রুদের খতমের উদ্দেশ্যে ফুসফুস আলাপের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং মুখে অধ্যয়নের কথা বলা হলেও তার প্রতি চরম ঔদাসীন্য এমনকি অবজ্ঞাই তাঁরা প্রদর্শন করেন।" বদরুদ্দীন উমর আরও জানিয়েছেন যে চারু মজুমদার স্বয়ং এক বিপ্লবী কর্মীর হাতে লেনিনের What is to be done নামক পুস্তকটি দেখে মন্তব্য করেন 'Read the Red Book and that is to be done.'[৮৫]

অমল লাহিড়ী—কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লিখিত ছাত্রনেতার মতে কে.ইউ.এস.এফ-এর সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দুর্বল ছিল। তারা মিটিং করত, মিছিল করত কিন্তু পড়াশুনোর ক্ষেত্রে বড়জোর পার্টির সি.পি.আই (এম-এল) লিফলেট পড়ত। প্রথমদিকে সাধন সরকারের লেখা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ওপর বইটি পড়ানো হত—এছাড়া মাও সে তুঙ-এর কিছু কিছু লেখা। ঊনসত্তরের পর থেকে এই পড়াশুনা কেবল 'রেড বুক'-এ এসে ঠেকে। কাজ বাড়ে, পড়াশুনো কমে।

সুতরাং চারু মজুমদার যেন এটাই চেয়েছিলেন, কারণ তাঁর আশঙ্কা কিছু ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯৬৮-র ২রা মে 'যুব ও ছাত্র সমাজের প্রতি' লেখায় তিনি বলেছেন—'মহান চীনের কেন্দ্রীয় কমিটি'-কৃত 'Quotations of Peoples' War' এবং তার বাংলা অনুবাদটিই 'বিপ্লবী' বামশক্তির 'propaganda' ও 'agitation material'। তার ওই বইটি নিয়ে কত সংখ্যক শ্রমিক ও কৃষক জনসাধারণকে শোনানো হল বা বোঝানো হল, সেটাই নির্ধারিত করবে একজন কর্মী বিপ্লবী কিনা। 'আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি ছাত্র আন্দোলনের ভাল বক্তা এবং এমনকি ছাত্র দাবি বা কোনো রাজনৈতিক দাবিতে ব্যারিকেড করা ছেলেও পরে IAS পরীক্ষা দিয়ে হাকিম হয়েছে অর্থাৎ সোজাসুজি প্রতিবিপ্লবী ক্যাম্পে যোগ দিয়েছে। তাই চেয়ারম্যান বলেছেন—যে ছাত্র-যুবক কৃষক ও শ্রমিক জনতার সাথে মিশে যেতে পারবে তারাই বিপ্লবী এবং যারা পারবে না, তারা প্রথমে অবিপ্লবী এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লবী ক্যাম্পে যোগ দেবে।'

মেধা এবং 'কেরিয়ারিজম্'-এর প্রতি স্পষ্টতঃ বিদ্বেষপুষ্ট মানসিকতায় চারু মজুমদার এর পর পরই ছাত্র যুবকদের কলেজ ইউনিয়ন পরিত্যাগ করার ডাক দেন (২১ আগস্ট '৬৯) কারণ এগুলো মূলতঃ বিপ্লবী ছাত্র সমাজের সামনে একটা অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলে। শ্রমিক কৃষকের সাথে একাত্ম হওয়ার পথে এগুলো হল বিরাট বাধা।

ঘটনা হল তখনও ছাত্ররা ইউনিয়নভিত্তিক রাজনীতিকে অতখানি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করতে শুরু করেনি। ব্যাপক আর্থ-সামাজিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের দাবিদাওয়ার অন্যতম ছিল ছাত্র-ভর্তি সমস্যার মোকাবিলা করা এবং শিক্ষান্তে চাকুরী। উনসত্তরে প্রথমদিকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ট্রামে-বাসে উচ্চহারে ভাড়াবৃদ্ধির সক্রিয় প্রতিবাদে কে.ইউ.এস.এফ-এর ব্যানারে ছাত্র ধর্মঘট করে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণরূপে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবির বিরোধিতা করে কলা ও বিজ্ঞান শাখার ছাত্ররা। তাদের বক্তব্য ছিল যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত কমিশনের রায়ে যা আবার মার্কিন লবির পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী হয়েছে—কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণরূপে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার অর্থ দাঁড়ায় যে ছাত্রভর্তির কঠিন সমস্যার দিনে কলা ও বিজ্ঞানের ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আর কোন সুযোগ থাকবে না। এই কমিশনের সুপারিশে—ছাত্রদের বক্তব্য অনুযায়ী—ইংরাজী, সমাজবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও অংক পাঠ্যবিষয় হিসাবে তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সমাবর্তন মণ্ডপে রাজ্যপাল ধরমবীরের সামনে এই 'বিপ্লবী' ছাত্ররা যে শ্লোগান তুলেছিল, তাতে অবশ্য 'শিক্ষান্তে চাকুরী চাই', 'শিক্ষা নিয়ে ফাটকাবাজি চলবে না', 'কলা ও বিজ্ঞান বিভাগকে কৃষি দপ্তরে হস্তান্তরিত করা চলবে না'—এর পাশাপাশি 'উত্তরবঙ্গের সংগ্রামী ছাত্রদের ওপর পুলিশী জুলুম ও কংগ্রেসী গুণ্ডাদের হামলা বন্ধ কর', 'চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ-এর চিন্তাধারায় ছাত্রসমাজ জেগে ওঠ', 'বিশ্বে এনেছে নতুন দিন—মাও সে তুঙ, হো-চি-মিন', নকশালবাড়ি জিন্দাবাদ'—শ্লোগানও ওঠে।

শুধু তাই নয়, উনসত্তর সালে (২৬.৩.৬৯) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন নির্বাচনকে

কেন্দ্র করে বি.পি.এস.এফ বনাম কে.ইউ.এস.এফ-এর লড়াই তুঙ্গে ওঠে। এর আগে চাকদহে নদীয়া জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সপ্তম সম্মেলনে নকশালবাড়ির রাজনীতি নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়। গোপাল চ্যাটার্জী যিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তিনি এই সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট হন। এই সম্মেলনে কলকাতা থেকে আগত অফিসিয়াল গোষ্ঠীর ছাত্রনেতা সুভাষ চক্রবর্তী এলে তাঁকে ফেরার ট্রেনে টিকিট কেটে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু গোপাল চ্যাটার্জী সম্মেলনে নকশালপন্থী শিবির-কে সমর্থন করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে অফিসিয়াল গোষ্ঠীর হয়ে দাঁড়ান।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেনিয়ান হোস্টেলে, পিজি-ওয়ান, এবং পিজি-টু হোস্টেলগুলিতে আবাসিকদের মধ্যে নকশালবাড়ি রাজনীতির ব্যাপক সমর্থন ছিল। নির্বাচনের আগের দিন ইনজাংশন জারী হয়। ফলে নির্বাচনের দিন ব্যাপক গণ্ডগোল বাধে দুই তরফের ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যে। এর মধ্যে কল্যাণী শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক নেতা সুভাষ বসু বিশাল শ্রমিকবাহিনী নিয়ে এসে বেনিয়ান হোস্টেল ঘেরাও করেন। ছাত্রদের সঙ্গে শ্রমিকদের খণ্ডযুদ্ধ হয়। শেষে পুলিশ এসে 'বিপ্লবী' ছাত্রদের মধ্যে চার জন 'বহিরাগত' ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে, যারা হলেন— দিলীপ কুমার গাঙ্গুলী, মানস চৌধুরী, চাকদহের নিতাই সরকার, অরুণ ব্যানার্জী।

মনে রাখতে হবে নকশালবাড়ির এক বছর পূর্তিতে 'দেশব্রতী' পত্রিকায় নির্বাচন বয়কটের আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারপরও ছাত্ররা বামবিপ্লবী রাজনীতি প্রচার ও প্রসারের হাতিয়ার হিসাবে ইউনিয়ন নির্বাচনকে ব্যবহার করছিল।

আটষট্টির শেষাশেষি কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট কলেজের 'বিপ্লবী' ছাত্রকর্মীরা ছাত্র ফেডারেশনের পতাকা নিয়েই কলেজ ইউনিয়ন দখল করে। 'দেশব্রতী'-র খবর অনুযায়ী 'নকশালবাড়ির রাজনীতির বক্তব্য হাজির করে বিপ্লবী ছাত্ররা মোট ৩৬টি আসনের মধ্যে ২৮টি আসন দখল করেছে। প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসী ছাত্র পরিষদ পেয়েছে ৮টি।' এর আগে কলেজের ছাত্ররা (২২ আগস্ট '৬৮) 'নবীনবরণের বরাদ্দ টাকার ওপর অধ্যক্ষের অযৌক্তিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অধ্যক্ষকে ঘেরাও করেন এবং আন্দোলন করতে থাকেন।' কারণ হিসাবে যে ঘটনাকে দর্শানো হয় সেটি হল—'কিছুদিন আগে ইয়াংকি কালচারের একটি শাখা এই কলেজে একটি সিনেমা প্রদর্শনের জন্য আসে। কিন্তু ছাত্রদের বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ...এরপর প্রথম সুযোগেই অধ্যক্ষ 'নবীনবরণের' টাকার ন্যায্য পাওনা থেকে ছাত্রদের বঞ্চিত করেন বলে ছাত্ররা অভিযোগ করেন। এতে স্বভাবতই ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয় এবং আন্দোলন শুরু করে।'[৮৩]

সরকারী কলেজের আন্দোলনকারী ছাত্রদের সমর্থনে স্থানীয় পলিটেকনিক ও উইমেন্স কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এমনকি স্কুলের 'সংগ্রামী' ছাত্ররাও এগিয়ে আসে। এই উপলক্ষ্যে কৃষ্ণনগরে একটি ছাত্র-ধর্মঘটও পালিত হয়।

মনে রাখতে হবে পুরোপুরি কলেজভিত্তিক এই আন্দোলনের খবরগুলি সবই 'দেশব্রতী' পত্রিকা থেকে নেওয়া এবং 'দেশব্রতী' পত্রিকা গুরুত্ব দিয়েই বিপ্লবী ছাত্রদের এই 'ইউনিয়ন'

কেন্দ্রিক কাজকর্মের তথ্য ঊনসত্তরের প্রথমদিকেও ছাপছিল। সাতষট্টি-আটষট্টিতে 'দেশব্রতী' পত্রিকায় কলকাতা ও কলকাতার উপকণ্ঠের বিভিন্ন কলেজে কোন্ বাম গোষ্ঠী ইউনিয়ন দখল করল বা করতে পারল সেই সব খবর যত্ন সহকারে প্রকাশিত হত। ঊনসত্তর-এর মাঝামাঝি থেকে এই ঝোঁক পাল্টালো কারণ সহজবোধ্য, চারু মজুমদারের রণকৌশলগত লাইনের পরিবর্তন যা ১৯৬৯-এর শেষার্ধ থেকে ক্রমশ পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় তাঁর বিভিন্ন লেখায়।

চারু মজুমদারের অন্যতম সহযোগী কলকাতার 'বাম' বুদ্ধিজীবী তাত্ত্বিকদের একজন এবং তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুনীতি কুমার ঘোষ-এর লেখায় পাওয়া যায়—'৬৯ ফেব্রুয়ারীতে এ.আই.সি.সি.আর-এর বৈঠকের পর চারু মজুমদার অন্ধ্রের শ্রীকাকুলমে যান। সেখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কৃষক গেরিলা বাহিনী সংগঠন ও 'লাল এলাকা তৈরীর' প্রস্তুতি দেখে ফিরে এসে তিনি আবেগবিহ্বল হয়ে লেখেন—'শ্রীকাকুলাম কি ভারতের ইয়েনান হতে চলেছে?' —"হঠাৎ চোখের সামনে দেখলাম অন্ধকার ভারতবর্ষ যেন দূর হয়ে গেল, উজ্জ্বল সূর্যালোকে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে আমার দেশ ভারতবর্ষ, জনগণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ, সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ। শ্রীকাকুলাম লড়ছে, সারা অন্ধ্র কাল লড়বে, তারই প্রতিশ্রুতি পেলাম যেদিন ফিরে আসছি সেই দিনের সকালে খবরের কাগজে, একজন শ্রেণীশত্রু কৃষক গেরিলাদের আক্রমণের শিকার হয়েছে। শ্রীকাকুলাম এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে।"[৮৭]

এরপর পরই সুনীতি ঘোষ শিলিগুড়িতে যান। সেখানে চারু মজুমদার তাঁকে লিন পিয়াও-এর 'Long Live the victory of People's War'-এর কয়েকটা লাইন পড়ে শোনান—'Guerrilla warfare is the only way to mobilize and apply the whole strength of the people...'। এরপর সুনীতি ঘোষ মন্তব্য করছেন যে "আমি শুধু শুনলাম। সামান্য পুঁথি পড়া বিদ্যা ছিল, তাকে আমাদের দেশের অবস্থায় কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে তা আমার বুদ্ধির অগম্য ছিল। চারুবাবুও ঐ লাইনগুলোর মধ্যে যে বিশেষ অর্থ খুঁজে পেয়েছেন সে সম্পর্কে কিছু বললেন না।"[৮৮]

অর্থাৎ ঊনসত্তর এর মাঝামাঝি থেকেই চারু মজুমদারের তাত্ত্বিক মতামত গঠনে আবেগের কর্তৃত্ব নতুন ধারার কমিউনিস্ট কর্মীরা মেনে নিতে শুরু করেছিলেন। এই প্রসঙ্গেই সুনীতি ঘোষ লিখেছেন—"তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, কিন্তু তার থেকেও প্রবল ছিল তাঁর হৃদয়ের আবেগ, যার বন্যা তাঁকে অনেক সময় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে (এবং আমাদেরও)।"[৮৯] অসিত সেনের মন্তব্যও এখানে স্মরণীয়—"Here it should be clearly understood that the dictatorial authority Charu Mazumdar wanted to exercise later, was not his own creation; it was rather created by persons around him...Since the very inception of co-ordination each and every responsible person in and around the co-ordination committee contributed more of less towards creating an extraordinary image of Charu Majumdar."[৯০]

সূত্র নির্দেশ

এই পরিচ্ছেদে বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বেশকিছু আঞ্চলিক তথ্য দেওয়া হয়েছে। মূল প্রবন্ধের যেসব স্থানে আলাদাভাবে সূত্র নির্দেশ করা নেই, সেগুলি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। অমল সান্যাল ও অসীম চ্যাটার্জীর উদ্ধৃত করা দীর্ঘ বক্তব্য বিশেষ পুলিশ ফাইল থেকে প্রাপ্ত, গোপনীয়তার কারণে আলাদা করে তার নম্বর উল্লিখিত হল না।

১ *হরিনারায়ণ অধিকারী ঃ ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও কিছু ঘটনাবলী,* 'মার্কসবাদী ফোরাম', হুগলী, অক্টোবর, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৮৬;

২ *তদেব,* পৃষ্ঠা-৮৬;

৩ *তদেব,* পৃষ্ঠা-৮৯;

৪ *Amiya Samanta : The Emerging Profile* (Unpublished Secret Document of Special Branch), Vol. III, pp. 6;

৫ *'খোকনের কথা' ঃ* (খোকন ওরফে আব্দুল হামিদ) ঃ *'অন্তরঙ্গ চারু মজুমদার',* সংকলক—অমিত রায়, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৩৩;

৬ *তদেব,* পৃষ্ঠা-৩৫,

৭ *চারু মজুমদার ঃ* 'সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই কৃষক-সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে'—অষ্টম দলিল, *চারু মজুমদার রচনাসংগ্রহ,* রেড টাইডিংস, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২৬;

৮ *দেশব্রতী ঃ 'নকশালবাড়ি বনাম সোনারপুর'*—২৪ আগস্ট, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা-১২;

৯ *নবদ্বীপ বার্তা* ঃ ৩০ জুলাই, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা-৩;

১০ *প্রমোদ সেনগুপ্ত ঃ 'বিপ্লব কোন্ পথে? মার্কসবাদ না সন্ত্রাসবাদ?'* প্রথম সংস্করণ, ১লা মে, ১৯৭০, পৃষ্ঠা-২;

১১ *দেশব্রতী*-৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা-৫;

১২ ভাষান্তর ঃ *'সৈন্য',* নকশালবাড়ি সংখ্যা, ১৯৮৭, Vol. XIII/No. 1.

১৩ *Asish K. Roy : The Spring Thunder and After*'; Minerva Associate (Pub.) Pvt. Ltd., 1975; pp. 125-126; 'Divergent Views between Our party and the CPC on Certain Fundamental Issues of Programme and Policy'–Resolution adopted by the Central Committee of CPI(M) at its Madurai Session from August 18 to 27, 1967; People's Democracy Supplement, Sept. 10, 1967, pp. 22.

১৪ 'আবাদ' পত্রিকায় ভাষান্তর করা এই লেখাটি পুনর্মুদ্রিত পাওয়া গেছে *'সৈন্য'* পত্রিকার *'নকশালবাড়ি সংখ্যায়'* ১৯৮৭, Vol. XIII/No. 1, পৃষ্ঠা-৩১-৩২;

১৫ সংবাদটি অমিয় সামন্ত'র দলিল *'The Emerging Profile'*—থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা—২৭-২৮;

১৬ *'খোকনের কথা'*, ঐ, পৃষ্ঠা-৩৭;

মনোরঞ্জন মহান্তি তাঁর *'Revolutionary Violence : A study of Maoist Movement in India'* (Steering Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1977)—এ মন্তব্য করেছেন (পৃষ্ঠা-১৯) যে, ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যখন নকশালবাদী আন্দোলনকে 'সংগ্রামী' সমর্থন জানায়, তখন চীনের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে বাম-উপদলের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু চৌ-এন-লাই এবং চেন-ঈ যখন তাঁদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, তখনও সেই একই নীতি অনুসৃত হয়, কারণ ওই নীতি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে চীনের নতুন বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু চীনের এই সমর্থন যা সংবাদপত্র ও বেতারের মাধ্যমে প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা সি.পি.আই (এম-এল)-এর নেতৃত্বের পরীক্ষামূলক নীতিগুলিকে তড়িঘড়ি বৈধ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। চারু মজুমদার মনে করতেন যে, তাঁর কর্মপদ্ধতিকে চীনের সমর্থনের অর্থ হল যে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ সঠিক। পরবর্তী ঘটনাসমূহ কিন্তু প্রমাণ করে যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি শুধুমাত্র নিয়মমাফিক প্রচার করতেন ও এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাস থেকে তাঁরা সম্ভবত এটা ধরতে পারেন এবং সেই কারণেই তারপর থেকে তাঁরা নকশালপন্থী আন্দোলনের প্রচার কম করতে শুরু করেন।

মূল লেখায় উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যের অংশটি লেখার প্রয়োজনে ব্যবহার করেছি, যা আসলে চারু মজুমদার প্রসঙ্গে প্রমোদ দাশগুপ্তের উক্তি।

১৭ *তদেব*, পৃষ্ঠা-৩৭;

১৮ *Mao Tse Tung : On Practice;* Selected Writings, NBA Pvt. Ltd., Calcutta, Dec. 1967, pp. 645;

১৯ গ্রেপ্তার হওয়ার পর পুলিশের কাছে *অমল সান্যালের* দেওয়া বিবৃতি থেকে উদ্ধৃত। অমল সান্যাল কৃষ্ণনগরের মেধাবী সন্তান, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ও প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশন-এর অন্যতম সদস্য, বিবৃতিটি দেওয়া হয় ৪.৭.৭১ তারিখে:

২০ *তদেব;*

২১ গ্রেপ্তার হওয়ার পর পুলিশের কাছে *অসীম চ্যাটার্জীর* দেওয়া বিবৃতি থেকে উদ্ধৃত, বিবৃতিটি দেওয়া হয় ৫.১১.৭১ তারিখে;

২২ *তদেব;*

২৩ *অমল সান্যালের* উপরিউক্ত বিবৃতি;

২৪ ঐ;

২৫ ঐ;

২৬ *চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ*, পৃষ্ঠা-২৮;

২৭ *Rabindra Ray : The Naxalities and their Ideology, OUP,* Delhi, 1988, pp. 210.

২৮ এর সঠিক কোন কারণ নিশ্চিতভাবে দর্শানো না গেলেও সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই হ'তে পারে যে প্রথম যুক্তফ্রন্টের শাসন-পর্বে সি.পি.আই(এম), আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবে না দেখে নকশালবাড়ি উত্থানকে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা চালিয়েছে। মূল আলোচনায় দেখানো হয়েছে এই আন্দোলনকে ঘিরে যুক্তফ্রন্টে সি.পি.আই (এম) যথেষ্ট কোণঠাসা অবস্থায় ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে পশ্চিমবঙ্গে এই পর্বে ঘন ঘন সরকারের উত্থান-পতনও বিধানসভাকে নিষ্ক্রিয় রাখার জন্য দায়ী ছিল।

২৯ Copy of Originator No. 27/157/67-Poll. I (A) dated 16.11.67 from Home, New Delhi, to the Chief Secretary, Calcutta.

Following questions were raised in Rajya Sabha. Quote : (A) Whether Home Minister's attention has been invited to an allegation made by the Chief Minister of West Bengal, that a section of one of the Constituent Parties of the UF Govt., had tried to bring about an armed rebellion in West Bengal, with the help of the Chinese;

(B) If so, whether any inquiry has been made in the matter;

(C) If so, the result of the inquiry;

(D) Whether the Govt. have captured any documents or seized any other material from any section of people in the state which may lend support to the allegation and if so the nature of the document and the material.

And,

(E) Whether the Govt. sees any connection betwen the timing of the Chinese intrusion at Nathu La in September-October 1967 and the internal developments in West Bengal at about that time to which the Chief Minister made a reference. Unquote.

Answers :

(A) A copy of the Statement as published in the Press was sent by this Govt. with letter No. 8669P. dated 10.11.67 to the Ministry of Home Affairs.

(B) & (C) Activities of the extremist wing of the CPI(M) known as the Naxalbari group have been kept under watch. this group contemplating to secure arms help from China and also to seize arms locally in furtherance of their objective of bringing about an

armed peasants revolution in the country.
The principal active leaders of this group have since been detained under the PD Act for their anti-national, anti-state activities.
(D) Documents have been captured which lend support to the above facts. Details of the Document cannot, however, be divulged in Public interest.

Reply to Lok Sabha Questions

(a) Whether Govt's attention has been drawn to the fact that of late the activities of the Pro-Chinese elements in the country are on the increase. (Question)
It is a fact that of late the activities of the Pro-China elements, i.e. the CPI(M) extremists commonly known as the Naxalbari group, are on the increase in West Bengal. (Reply)
(b) If so, what steps have been taken by Govt. to check those activities. (Question)
A close watch is being maintained on the activities of these elements and already some principal active leaders of this Group have been detained under the P.D. Act to curb their activities. (Reply)
[Copies from SB, Cal. Police Records]

৩০ *১০.৯.৬৭ তারিখে কোচবিহারে প্রদত্ত উৎপল দত্তের বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত*

৩১ আশ্বিন ১৩৭৪, সংখ্যায় *'আবাদ'* পত্রিকায় প্রকাশিত *'নকশালবাড়ি দীর্ঘজীবী হোক'* থেকে উদ্ধৃত; লেখাটি *'সৈন্য'* পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশিত হয়, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা—২৮-৩৫

৩২ হুগলী নদী তার নিম্নপ্রবাহে হুগলী জেলা ও নদীয়া জেলার মধ্যে সীমারেখা হয়ে বয়ে গেছে। এই নদীর গভীর স্রোত প্রায়ই গতিপথ বদলায়, কখনো বাঁয়ে কখনো ডাইনে। ফলে নদীর বুকে গজিয়ে ওঠে ছোট ছোট দ্বীপভূমি, বন্যার ফলে সেগুলিতে পলি জমে জমে ক্রমশঃ সেগুলি বড় চর-এর আকার নেয়, যা উঁচু হয়ে বন্যার জলসীমাকে পেরিয়ে যায়। নদীয়ার দিকে গঙ্গার বুকে এরকম অনেকগুলি চর সৃষ্টি হয়েছে। এই চরভূমি নিয়ে প্রায়ই আইনীবিবাদ উপস্থিত হয়। চরজমি কার দখলে থাকবে, বিবাদ হলে কোন জেলার কর্তৃপক্ষের কাছে সালিশী চাইবে, এই নিয়ে চরবাসীদের মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকত।
পরবর্ত্তীকালে নকশালবাড়ি আন্দোলনের শীর্ষপর্বে নদীয়ার কিছু কিছু এলাকায় এই চরভূমিগুলি বিপ্লবীকর্মীদের আত্মরক্ষার্থে লুকিয়ে থাকার পক্ষে আদর্শ স্থানে পরিণত হয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ম্যাপ এঁকে এরকম কিছু এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
সূত্র : *District Census Report 1961, Dist. Nadia, General Description.*

৩৩ এছাড়াও শান্তিপুরের চারপাশের গ্রাম এলাকায়, যেমন, চরমালতীপুর, মেদিয়া মৌজা,

কন্দখোলা মৌজা, আড়বল্‌দা মৌজা, বল্লভপুর, বোয়ালিয়া, বরজিয়াকুর মৌজা, আড়বাঁদী ইত্যাদি গ্রামে, যেখানে খাসজমি বেশী ছিল সেখানে লালঝাণ্ডা পুঁতে এক বিঘা করে জমি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিলি করা হয়।

৩৪ **দ্রষ্টব্য ঃ** ১৯৬৬ সালের *'দেশহিতৈষী'*-তে প্রকাশিত বিভিন্ন খবর যেগুলিতে নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে সি.পি.আই (এম) নেতৃত্বে বিভিন্ন খাদ্য আন্দোলনের কথা বেরিয়েছিল। যেমন—১৯শে আগস্ট '৬৬-তে প্রকাশিত *'চাকদহে খাদ্যের দাবীতে ঘেরাও'*, পৃষ্ঠা-১৪; ৯ সেপ্টেম্বর '৬৬-তে প্রকাশিত *'হরিণঘাটায় শহীদ দিবস পালন'*, পৃষ্ঠা-১; ৭ অক্টোবর '৬৬-তে প্রকাশিত *'জেলায় জেলায় ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল'*, পৃষ্ঠা-৪; ৫;

৩৫ *দেশব্রতী*, ৩১ আগস্ট, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা-২;

৩৬ *'দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তির পথ'—তদেব*, পৃষ্ঠা-২;

৩৭ *'নবদ্বীপ বার্তা'*, ৬ই জুলাই, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা-১;

৩৮ *'নবদ্বীপ বার্তা*, ১৩ আগস্ট, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা-১;

৩৯ *'বাড়াবাড়ির অভিযোগ'* ঃ সম্পাদকীয়—*বসুমতী পত্রিকা*, ১৭ আগস্ট ১৯৬৭;

৪০ *দেশব্রতী*, ১৯ আগস্ট, '৬৭;

৪১ *তদেব*, ২৪ আগস্ট, '৬৭, পৃষ্ঠা-৯;

৪২ *নবদ্বীপ বার্তা*, ১ অক্টোবর, '৬৭, পৃষ্ঠা-৩, আগের নির্বাচনী পরিসংখ্যানটিও একই সংবাদপত্র থেকে গৃহীত;

৪৩ তদেব, ২৩ জুন, '৬৮, পৃষ্ঠা-২; উল্লেখ্য যে এই সময়ে সি.পি.আই (এম) জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেন—অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর), গৌর কুণ্ডু (রাণাঘাট), ননী মালাকার (হরিণঘাটা), সুভাষ বসু (কল্যাণী), মাধবেন্দু মোহান্ত (তেহট্ট), সাহাবুদ্দিন (চাপরা)।

৪৪ শংকরী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের এই বিবৃতি প্রচারিত হওয়ার অনেক আগেই ১৬.৯.৬৭ তারিখের গোয়েন্দা পুলিশের এক গোপন নোট-এ লেখা হয়েছিল—

"...Incidentally Debi Basu Ex–M.L.A. (CPI-M) does not weild much influence among the Communist members at present. A faction under the leadership of Sankari Chattopadhyay. Pratul Banerjee are working their own way. Debi Basu is earnestly trying to exert his influence among the rank and file of the party." (origin 7-2370-67 (12) Nadia). এই রিপোর্ট আগের তথ্যগুলিকেই সমর্থন করে।

৪৫ সূত্র ঃ স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ রিপোর্ট,

৪৬ ডি.আই.বি; নদীয়া থেকে *সাতষট্টির সেপ্টেম্বর মাসেই* এই 'উগ্রপন্থী'দের নামের একটি তালিকা কলকাতায় স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে পাঠান হয়। লক্ষ্যণীয় যে যাঁদের নাম

প্রাথমিক ভাবে পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা অনেকেই (*চিহ্নিত) কো-অর্ডিনেশন পর্বের পর, কিংবা তার আগেই 'নকশালবাড়ি' রাজনীতি থেকে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেন, অথবা কেউ সি.পি.আই বা সি.পি.আই (এম)-এ ফিরে যান। কেউ কেউ এই ফিরে যাওয়ার কাজটা সত্তরের পরে করেছেন কারণ সহজবোধ্য;আবার অনেকেই সি.পি.আই (এম-এল)-এর কর্মী হিসাবেই রয়ে যান। এখানে নদীয়ার চারটি শহরের তালিকা আছে।

কৃষ্ণনগর — উগ্রপন্থীদের মোট সংখ্যা—১১
উল্লেখযোগ্য সদস্য—নাদু চ্যাটার্জী, দিলীপ বাগচী*, ইন্দু ভৌমিক *, দেবু গুপ্ত *, অমল সান্যাল *, শুভ্র সান্যাল * (২১.১০.৬৭)

শান্তিপুর — উগ্রপন্থীদের মোট সংখ্যা—১৯
অজয় ভট্টাচার্য, তিনকড়ি প্রামাণিক, বুলু চ্যাটার্জী, কেষ্ট ঘোষ, মান্তু ভট্টাচার্য *, বিমল পাল (চাষী), চিন্তাহরণ গোস্বামী—জমি আছে, কাপড়ের ব্যবসা আছে, কার্ত্তিক নাগ—মিষ্টির দোকান, হাজু ঘোষ—রিক্সাচালক (১৫.১০.৬৭)

নবদ্বীপ — উগ্রপন্থীদের মোট সংখ্যা—৯
শংকরী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় *, গোপী মোহন রাঢ়ি, প্রতুল ব্যানার্জী *. শম্ভু ব্যানার্জী, রবি ভট্টাচার্য *, বাদল সাহা (দেশব্রতীর এজেন্ট) (১৯.১০.৬৭)

চাকদহ — উগ্রপন্থীদের মোট সংখ্যা—১২
সৌরেন পাল *, অরুণ ভট্টাচার্য *, গোপাল চ্যাটার্জী, দীপক গোস্বামী, রামানন্দ দেবনাথ, ভবতোষ দাস, অমল গুহ *, পতিতপাবন দে * (২১.১০.৬৭)

৪৭ মনে রাখা দরকার যে তাঁত ও বিড়ি এই দুই শ্রমিক ফ্রন্টই নবদ্বীপে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল। চিরকালই এই শ্রেণীকে Mobilize না করানো গেলে শহরে কোন কাজই হত না। বস্তুতঃ তখনও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে হতাশা আসেনি। এ প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য ঃ *১৮ জুলাই, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা - ২, 'দেশব্রতী'-তে* প্রকাশিত আর একটি খবর ঃ "নয়া সংশোধনবাদীদের আরেক অপকীর্ত্তি"—নিজস্ব সংবাদদাতা/নবদ্বীপ ঃ ১৪ই জুলাই—"কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেওয়ার পর এখানকার নয়াসংশোধনবাদীদের আরও অপকীর্ত্তি দেখে মানুষ অবাক হয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় 'নয়াসংশোধনবাদী' একজন 'জবরদস্ত' জমিদার নেতা ছোট ছোট বিড়ি ও তাঁত কারখানার মালিকদের কিছু আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দিয়ে, কিংবা অন্যভাবে

চাপ সৃষ্টি করে তাদের কারখানা থেকে নকশালবাড়ি রাজনীতির কর্মীদের ছাঁটাই করাচ্ছে। 'আলো বিড়ি ফ্যাক্টরীর' শ্রমিক বসন্ত ভৌমিক ও সন্তোষ পোদ্দার এইভাবে ছাঁটাই হয়েছেন। তাঁদের অপরাধ তাঁরা নয়াসংশোধনবাদী ইউনিয়নের সভ্য হতে অস্বীকার করেন। কারণ ইউনিয়নের টাকা পয়সা কয়েকজন নয়াসংশোধনবাদীর পকেটে চলে যাওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ থাকায় তাঁরা ইউনিয়নে সভ্য হতে রাজী হন না। ফলে মালিক তাঁদের ছাঁটাই করে, এবং বলে অমুকবাবু (নয়াসংশোধনবাদী নেতা) বললে তবে রাখতে পারি। একই পদ্ধতিতে রাণীরঘাট অঞ্চলের বিড়ি শ্রমিক অঞ্জন রায়কে ছাঁটাই করা হয়েছে।

মণিপুর অঞ্চলের এক তাঁত কারখানার মালিককে নয়াসংশোধনবাদীরা এই বলে ভীতিপ্রদর্শন করে যে, নকশালপন্থীদের ছাঁটাই না করলে তাঁর কারখানার শ্রমিকরা অর্থাৎ নয়সংশোধনবাদীদের পেটোয়ারা হামলা করতে পারে, এমনকি পুলিশও ধরতে পারে। ফলে মালিক তাঁত শ্রমিক মনোরঞ্জন দেবনাথকে ছাঁটাই করে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, এতদিন ইউনিয়ন করার জন্য তাঁত ও বিড়ি শ্রমিকদের মালিকরা নানাভাবে হয়রান ও অসুবিধা সৃষ্টি করত। আর এখন সেই মালিকরা নয়া-সংশোধনবাদীদের ইউনিয়ন-এর সভ্য হওয়ার জন্যে চাপ দিচ্ছে। এবং না হলে ছাঁটাই করছে।"...

৪৮ কৃষ্ণনগর পলিটেকনিকের ছাত্র, ষষ্ঠীতলা পাড়ার বাসিন্দা তপন সান্যাল-এর সাক্ষাৎকার ভিত্তিক;

৪৯ সাতষট্টি সালের জুন মাসে কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরী হলে আয়োজিত এক বিশেষ সমাবেশে এই সহায়ক কমিটি তৈরী হয়। সভাপতি হন প্রমোদ সেনগুপ্ত, সুশীতল রায়চৌধুরী ও সত্যানন্দ ভট্টাচার্য হন সহ-সভাপতি এবং পরিমল দাশগুপ্ত হন সম্পাদক। *'স্মৃতি সত্তা সরোজ দত্ত'—"জলার্ক"* পত্রিকার এই সংখ্যায় *'কমরেড সরোজ দত্ত স্মরণে'* শীর্ষক প্রবন্ধে *সৌরেন বসু* লিখেছেন—"এদেশের কৃষক আন্দোলনে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল নকশালবাড়ির কৃষকসংগ্রাম সহায়ক কমিটি গঠিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে। কৃষকসংগ্রামের সঙ্গে কলকাতার বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-যুবক রাজনৈতিক কর্মী সরবে সংহতি গড়ে তুললেন, ভারতের সংগ্রামী ইতিহাসে নতুন এক পৃষ্ঠা সংযুক্ত করে...।" (পৃষ্ঠা-১৬৭)।

৫০ ১.৯.৬৭ তারিখে নদীয়া *ডি.আই.বি* অফিস থেকে পাঠানো রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত;

৫১ উল্লিখিত দুটি প্রচারপত্রই গোয়েন্দা দপ্তর থেকে উদ্ধৃত যা নদীয়া ডি.আই.বি থেকে ৭ জুলাই, ১৯৬৭ তারিখে পাঠানো হয়েছিল।

৫২ সূত্র ঃ গোয়েন্দা রিপোর্ট, তারিখ ২৭.১১.৬৭;

৫৩ শক্তিনগর কলোনীর জমি কৃষ্ণনগরের তৎকালীন মহারাজকুমার সৌরিশ চন্দ্রের দেওয়া ১০০ বিঘা জমি ও বদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়ার ৫০ বিঘা জমির ওপর গড়ে

উঠেছিল।
দ্রষ্টব্য ঃ *'বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ সরকার'—মঞ্জুবাণী সেন সরকার,* প্রকাশক ঃ অসীম সেন, কলিকাতা, কালীপূজা, ১৩৯৯, পৃষ্ঠা-৯৪;

৫৪ গোয়েন্দা রিপোর্টে সাতষট্টিতেই নদীয়া জেলার অন্য কোথাও গেরিলা পদ্ধতিতে সশস্ত্র লড়াই-এর ট্রেনিং দেওয়ার রিপোর্ট মেলেনি।

৫৫ *২৫.৫.৭০ তারিখে স্বরাষ্ট্র সচিবকে লেখা তৎকালীন আই.জি—আই.বি রঞ্জিত গুপ্তের একটি চিঠি থেকে উপরোক্ত অংশটি উদ্ধৃত।*
এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, পশ্চিমবঙ্গে নকশালবাড়ি রাজনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নতুন বামপন্থী মতাদর্শকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে মোকাবিলা করার চেষ্টা আটষট্টির পর থেকে সি.পি.আই (এম) আর করে নি।

৫৬ 'শহীদ স্মরণে'— *'আমরণ জাগরণ'—রুবি* (জয়শ্রী ভট্টাচার্য), *সৈন্য*—নকশালবাড়ি সংখ্যা, ভল্যুম-১৩, নম্বর ১, পৃষ্ঠা—১৫-২৩;

৫৭ *অমৃতবাজার পত্রিকা,* ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ১,৭। এছাড়াও দ্রষ্টব্য *'সৈন্য* পত্রিকার পূর্বোল্লিখিত সংখ্যা এবং *'প্রতিবাদী চেতনা'* পত্রিকার নভেম্বর বিপ্লব, বিশেষ সংখ্যার (৭ নভেম্বর, ১৯৮৩) প্রবন্ধ— *'অভিমন্যুর মৃত্যু'* লেখক *জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায়* (পৃষ্ঠা ২১-২৩);

৫৮ উদ্ধৃতিচিহ্নের অংশটি শান্তিপুর কাশ্যপ পাড়ার বাসিন্দা ও প্রাক্তন নকশালপন্থী কর্মী *পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জীর* সাক্ষাৎকার থেকে নেওয়া, যা তাঁদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত;

৫৯ *"এক আপোষহীন জীবনের নাম কালাচাঁদ দালাল"—প্রতিবাদী চেতনা,* ৭ নভেম্বর, ১৯৮১, পৃষ্ঠা-৩;

৬০ খবরটি *নদীয়া জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের* অফিস থেকে *ডেপুটি আই.জি* (প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ)-র কাছে পাঠানো বার্তার অংশবিশেষ;

৬১ ১৯৬৭ সালের ১৪ই জুন তারিখে নকশালবাড়ি এলাকার কোন এক সংগঠক কর্মীকে লেখা *চারু মজুমদারের* একটি চিঠির অংশবিশেষ থেকে উদ্ধৃত ঃ সূত্র— *'সি.পি.আই (এম-এল) মূল্যায়ন প্রসঙ্গে'—শংকর মিত্র, মার্কসীয় দিশা,* তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৬ জুলাই, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-১০;

৬২ *ডি. আই. বি নদীয়া থেকে, আই. বি দপ্তরে* ৯.৮.৬৭ তারিখে লেখা ও পাঠানো একটি গোপন রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত;

৬৩ *তদেব,*

৬৪ *তদেব,*

৬৫ গ্রেপ্তার হওয়ার পর পুলিশের কাছে দেওয়া *অসীম চ্যাটার্জীর* বিবৃতি উদ্ধৃত;বিবৃতিটি গৃহীত হয়েছিল ৫.১১.৭১ তারিখে।

৬৬ হরিনারায়ণ অধিকারী, তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৫;

৬৭ তদেব, পৃষ্ঠা-১৫০;

৬৮ তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৫;

৬৯ যদিও এই রিপোর্টে *পশ্চিমবঙ্গের পার্টি সদস্য* সংখ্যা দেখানো হয় *সাতষট্টিতে ১৬,৩৯৩ এবং আটষট্টিতে ১৬,০৬৬ জন*। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৬৮-র জুন মাসে *সি.পি.আই (এম)-এর সাধারণ সম্পাদক পি. সুন্দরাইয়ার* দেওয়া একটি তালিকা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের মোট সদস্যসংখ্যা *১৬,৩০০* দেখানো হয় ও দলত্যাগী হিসাবে *৫০০* জনকে দেখানো হয়। বাস্তবিকই এই পরিসংখ্যানগুলি সঠিক হিসাব কখনোই দেয় না।
সুন্দরাইয়ার পরিসংখ্যানের সূত্র ঃ *তরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নকশালবাদী রাজনীতির বিবিধ ধারা,* প্রত্যয়, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, জুলাই, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা-৪;

৭০ ১৯৬৭ সালের গোয়েন্দা পুলিশ রিপোর্ট;

৭১ *Naxalbari and After : a Frontier Anthology,* vol. 2, Kathasilpa, Calcutta, December, 1978, pp. 192.
এখানেই সি.পি.আই (এম) নেতৃত্বকে প্রথম 'নয়া-সংশোধনবাদী' আখ্যা দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নকেও 'নয়া ঔপনিবেশিক' দেশ হিসাবেও প্রথম ঘোষণা করা হয় এই প্রস্তাবে। সূত্র ঃ *The Historic Turning-point, A Liberation Anthology,* Vol. 1, First Edition, May 1992. Calcutta, Introduction, pp. 18.

৭২ *Asit Sen : An Approach to Naxalbari*, Institute of Scientific Thoughts; Calcutta, first edition, October, 1980, pp. 43.

৭৩ *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৪৪;

৭৪ *তদেব,* পৃষ্ঠা-৪৫;

৭৫ তবে তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের আগেই ওপরের তালিকায় বহু ছাত্রই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন;

৭৬ পূর্বোল্লিখিত *তপন সান্যাল;*

৭৭ ১৯৬৯ সালের পর নকশালবাড়ি রাজনীতি থেকে *শুভ্র সান্যাল* নিজেকে গুটিয়ে নেন;

৭৮ বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি রবার্ট ম্যাকনামারার কলকাতা আগমন উপলক্ষ্যে '৬৮-র ২১ নভেম্বর কলকাতার বিদ্রোহী ছাত্ররা তুমুল বিক্ষোভ দেখান। ওইদিনের দেশব্রতীতে প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল ম্যাকনামারা-বিরোধী কলকাতায় প্রস্তাবিত মিছিলে "যোগ দিন"। এই উদ্দেশ্যে ছাত্র ফৌজ পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী 'বিপ্লবী ছাত্র-যুব সমাজের' প্রতি ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে সংগঠিত বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানায়।

১১ই নভেম্বর, '৬৮-তে 'দেশব্রতী'তে নদীয়া জেলা এস.এফ-এর পক্ষে ভাস্কর মুখার্জী পরবর্ত্তী ২০ নভেম্বর তারিখে কৃষ্ণনগরে প্রস্তাবিত 'কেন্দ্রিয় মিছিলে' যোগ দিয়ে 'কানু সান্যাল—জঙ্গল সাঁওতাল-সহ সমস্ত রাজবন্দীর ও ছাত্রবন্দীদের মুক্তির দাবীতে, শান্তিপুর কলেজের ছাত্র-আন্দোলনের সমর্থনে এবং ভিয়েতনামের লাখো লাখো মানুষ হত্যাকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভু ম্যাকনামারা 'ভারত ছাড়ো' আওয়াজ তোলার আহ্বান জানান। পরবর্ত্তী ১৯শে ডিসেম্বর '৫৮-তে 'দেশব্রতী' পত্রিকায় আবার প্রকাশিত হল কৃষ্ণনগর শহরে ম্যাকনামারা বিরোধী মিছিলের খবর (পৃষ্ঠা-৮—"রুশ ও চীন বিপ্লব স্মরণে নানাস্থানে জনসভা")—'গত ২০ নভেম্বর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্তব্ধ করার চক্রান্ত করতে ভারতে আগমনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা বাংলা যে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে তার অংশরূপে নদীয়া জেলা এস.এফ-এর আহ্বানে কৃষ্ণনগরে বিপ্লবী ছাত্ররা এক বিরাট মিছিলে সামিল হন। মিছিলে ধ্বনি ওঠে—লাল তরাইয়ের লাল আগুনে জল্লাদ ম্যাকনামারাকে পুড়িয়ে মারো, লাল দুনিয়ার মহান নেতা মাও সে তুঙ লাল সেলাম, ভিয়েতনাম দিচ্ছে ডাক নয়া-সংশোধনবাদ নিপাত যাক—ইত্যাদি। মিছিলে কৃষ্ণনগর, আড়ংঘাটা, বগুলা, চাকদা, কল্যাণী, শক্তিনগর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ এসে সমবেত হন। বিপ্লবী আওয়াজে মুখরিত এই মিছিলে সারা কৃষ্ণনগর শহর পরিক্রমা করে।" —সংবাদদাতা।

দেশব্রতী ও দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় একই সংবাদকে বিশ্লেষণ করার ফারাকটা এখানে চোখে পড়ার মত। অপ্রাসঙ্গিক হলেও কলকাতার ছাত্রদের ম্যাকনামারা বিরোধী অভিধানকে নিন্দা করে ২১শে নভেম্বর-এর দি স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়—"Slighting a Guest"–'Calcutta is not a city always cordial to its guests even when they come bringing gifts. The leaders of the leftist parties knew perfectly well that the world Bank and the International Development Association at the moment represented in the distinguished person of Mr. Robert McNamara, were the best–indeed almost the only present resource for the urgent needs of a city in grave danger of civic collapse. They preferred to make political capital out of his former position as U.S. Secretary of Defence; his alleged responsibility for the war in Vietnam (over which he was not in fact "a hawk"); and a generally and vaguely imputed charge of representing "U.S. imperialism."

৭৯ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা *অমল লাহিড়ী*, যিনি পরবর্ত্তীকালে সি.পি.আই (এম-এল) নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য হন;

৮০ *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২ আগস্ট, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা-৫;

৮১ বর্তমানে ইনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক;

৮২ *ডঃ অশোক বসু*, যিনি 'পূর্বদিগন্ত' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন;

৮৩ পুলিশের কাছে গ্রেপ্তারের পর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের রিসার্চ স্কলার *মিহির কুমার চক্রবর্তীর* দেওয়া বিবৃতি থেকে; বিবৃতিটি গৃহীত হয় ১.৪.৬৯ তারিখে;

৮৪ "I do not like to be a politician in my future life. I wish to complete my research work and to procure a suitable joy"–M. Chakravorty. "Since my departure from Gopiballavpur I am completely aloof from political activities ...On the Analogy of the adage once beaten twice shy I always kept myself aloof from politics. I want to build my career. My aim is after passing B.A., I would appear to IES Exam. and I am confident of my success in that exam."–Amal Sanyal.

৮৫ *বদরুদ্দিন উমর ঃ সত্তর দশকের কৃষক আন্দোলন*, সত্তর দশক, *অনুষ্টুপ*, দ্বিতীয় সংস্করণ কলকাতা, বইমেলা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৪৭;

৮৬ *দেশব্রতী*, ১৪ নভেম্বর, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা-১২;

৮৭ *দেশব্রতী*, ১৩ মার্চ, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-৫;

৮৮ *সুনীতি কুমার ঘোষ ঃ চারু মজুমদার ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিপ্লবী ধারা; অনীক*, সেপ্টে ম্বর-অক্টোবর, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৮২;

৮৯ *তদেব*, পৃষ্ঠা-৮২;

৯০ *Asit Sen : An Approach to Naxalbari; pp. 51.*

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উনিশশো উনসত্তর ঃ সি.পি.আই (এম-এল) ও অন্যান্যরা

বর্ধমান প্লেনাম (১৯৬৮ সালের ৬ই এপ্রিল) শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস আবার একটি ভাঙনের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। ১৯৬৪ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির বত্রিশ জন জাতীয়-পরিষদ-সদস্যের জাতীয় পরিষদ বর্জন এবং তেনালী কনভেনশন আহ্বান যেমন ছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনে একটি বাঁক, তেমনি ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে সি.পি.আই.(এম)-এর কেন্দ্রিয় প্লেনাম বর্জনকারীরা আরেকটি ঐতিহাসিক বাঁকের মুখে এসে দাঁড়ালেন।

বর্ধমান প্লেনামকে একটি 'ডিবেটিং সোসাইটি' আখ্যা দিয়ে চারু মজুমদার সরাসবি ভারতবর্ষে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দিলেন —যে বিপ্লব একদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সংশোধনবাদ এবং অন্যদিকে দেশীয় আমলাতন্ত্র ও মুৎসুদ্দি পুঁজি ও ব্যাপক গ্রামাঞ্চলের সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে লড়বে। এই লড়াই-এর প্রয়োজনে পুরোনো কো-অর্ডিনেশন-কে আরও সুসংহত এবং সুনির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্লেনামের পরপরই সারা ভারত বিপ্লবীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে আরও ব্যাপক একটি মঞ্চে রূপায়িত করা হল 'সারা ভারত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি' নামে। ঐ দিনই এই 'বিপ্লবীকমিউনিস্ট'-দের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয় ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ঘোষণাপত্রে স্পষ্ট করে 'আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক' ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে চিহ্নিত করা হল —(ক) সাম্রাজ্যবাদী নয়া উপনিবেশবাদী শক্তিগুলির ও জনগণের দ্বন্দ্ব, (খ) সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীগুলি ও কৃষকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব, (গ) মুৎসুদ্দী আমলাতান্ত্রিক পুঁজি ও শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব হিসাবে।

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করতে গেলে যা যা অবশ্য করণীয়, সেগুলিকে চারু মজুমদার ভারতবর্ষের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রবন্ধে চিহ্নিত করলেন (*দেশব্রতী* ১৬ই মে, ১৯৬৮) এইভাবে, (ক) শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষকশ্রেণীকে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল (Revolutionary Base) তৈরী করতে হবে, (খ) দীর্ঘকালীন সশস্ত্র লড়াই চালাতে হবে, (গ) গ্রামাঞ্চলের থেকে শহরগুলিকে ঘিরে ফেলে এবং শেষে সেগুলিকে দখলের মাধ্যমে দেশব্যাপী চূড়ান্ত জয় অর্জন করতে হবে, (ঘ) সেই জয়লাভের উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণীর ও কৃষকশ্রেণীর দৃঢ় মৈত্রীর ভিত্তিতে যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবে, তার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণী ছাড়াও পেটি বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকেও নিতে হবে, এবং (ঙ) ষড়যন্ত্রমূলক পদ্ধতির (conspiratorial Method) পরিবর্তে একমাত্র গণকর্মনীতির (Mass Line)পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

এছাড়াও উপরোক্ত ঘোষণাপত্রে, যা কো-অর্ডিনেশনের দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র হিসাবে খ্যাত,

তাতে যে সমস্ত 'মাওবাদী' গোষ্ঠী সংশোধনবাদ ও নয়াসংশোধনবাদ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে, তাদের সবাইকে কো-অর্ডিনেশনে যোগ দিয়ে ভারতীয় বিপ্লবের স্বার্থরক্ষা করার আহ্বান জানানো হয়।

পাশাপাশি '*দেশব্রতী*তে চারু মজুমদার লিখছেন ('ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব') — "যাঁরা ভাবছেন যে তথাকথিত মার্কসবাদী পার্টিগুলি থেকে ব্যাপকতম অংশকে আমাদের পক্ষে টেনে আনাই প্রধান কাজ এবং এ কাজ করতে পারলেই বিপ্লবী পার্টি গড়ে উঠবে, তাঁরা আসলে আর একটি নির্বাচনের পার্টি গড়ার কথাই ভাবছেন, সচেতনভাবে ও অচেতনভাবে। কারণ তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে এইসব তথাকথিত মার্কসবাদী পার্টিগুলির সভ্যদের হয়তো বিপ্লবী হওয়ার মতো গুণ আছে এখনও, কিন্তু যে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তাঁরা গেছেন তা হলো খাঁটি সংশোধনবাদ এবং সেই প্রয়োগের ফলে তাঁরা তাঁদের বিপ্লবী গুণগুলি অনেকাংশেই হারিয়েছেন এবং তাঁদের নতুন প্রয়োগ শিক্ষার ভিতর দিয়ে নতুন করে বিপ্লবী হতে হবে। তাই পুরাতন পার্টির সভ্যদের উপর ভরসা করে বিপ্লবী পার্টি গড়া যায় না। নতুন পার্টি তৈরী হবে সম্পূর্ণ নতুন বিপ্লবী শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্ত যুবকদের চেয়ারম্যানের চিন্তাধারায় শিক্ষিত করে, বিপ্লবী প্রয়োগ মারফৎ।"

কো-অর্ডিনেশনকে আরও ব্যাপক ও সংহত করার কাজ প্রথমেই ধাক্কা খায় যখন নাগি রেড্ডির নেতৃত্বাধীনে অন্ধ্রপ্রদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট কমিটি কো-অর্ডিনেশনে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। মূলতঃ নির্বাচন বয়কট করার প্রশ্নে ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে অবিসংবাদী মানার প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করায় নাগি রেড্ডিকে কো-অর্ডিনেশনে অনাকাঙ্খিত বলে ধরা হয়।

১৯৬৮-র শারদীয় সংখ্যা *দেশব্রতী*তে চারু মজুমদার আহ্বান জানালেন —'বিপ্লবী পার্টিগড়ার কাজে হাত দিন।' তখনও পর্যন্ত কো-অর্ডিনেশনের নেতাদের মধ্যে একটি তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার যথার্থতা সম্বন্ধে সংশয় ছিল। ২০.৭.৬৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কলকাতা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে অন্যতম বক্তা বনবিহারী চক্রবর্তী 'এখনই' যান্ত্রিক ভাবে কোনো পার্টি গঠনের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। তড়িঘড়ি একটি বিপ্লবী পার্টি তৈরী করে দেওয়া হলে বিপ্লবী চরিত্রটাকেই নষ্ট করে দেওয়া হবে। ১৯০৮ সালে লেনিনের বলশেভিক পার্টি তৈরীর প্রসঙ্গ টেনে ইনি বলেন যে বহু বলশেভিক বিপ্লবীই সংকটের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, বা মেনশেভিক বা সুবিধাবাদী বনে যায়। শ্রেণীসংগ্রামের একটা নির্দিষ্ট স্তরে অনেকেই মারাত্মক বিচ্যুতির শিকার হয়। প্রকৃত বিপ্লবী অনেক লড়াই অনেক শ্রেণীসংগ্রামের শিক্ষাগত পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে তৈরী হয়। কাজেই বর্ত্তমানে যদিও সি.পি.আই. ও সি.পি.আই.(এম) সংশোধনবাদী দলে পরিণত হয়েছে, বহু পার্টি কর্মী, যারা এখনও ততখানি সচেতন স্তরে নেই, ক্রমে প্রকৃত বিপ্লবী হয়ে উঠতে পারে।[১]

বস্তুতপক্ষে একটা তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে বহুদিন থেকেই পত্রপত্রিকা গুলিতে আলোচনা হচ্ছিল। সাতষট্টির নভেম্বর মাসেই *যুগান্তর পত্রিকায়* '*নতুন*

পার্টি গঠন নিয়ে মতভেদ" শীর্ষক সংবাদে জানানো হয় যে 'নকশালবাড়ি খ্যাত চারু মজুমদার' "বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজ ত্বরান্বিত করা হোক এই মত পোষণ করতেন, কিন্তু 'নকশালবাড়ি আন্দোলনের অপর এক সুপরিচিত সমর্থক' শ্রী সুশীতল রায়চৌধুরীর বক্তব্য হচ্ছে পার্টির মধ্যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বহু মানুষ আছেন। এখনই প্রকাশ্যে আলাদা পার্টি গড়লে তাঁদের পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। তাতে নয়া সংশোধনবাদী পার্টি নেতৃত্ব এবং পুলিশ ছাড়া আর কারোও বিশেষ সুবিধা হবে না। ...তার চেয়ে 'বিপ্লবীরা' নেতাদের গলার কাঁটা হয়ে থাক সেটাই অনেক ভাল।"[২] অবশ্য আটষট্টির মাঝামাঝি থেকে সি.পি.আই.(এম)-ই এই 'গলার কাঁটা'-গুলিকে তুলে ফেলার কাজ শুরু করে দেয়।

সাতষট্টির শেষাশেষি থেকেই দেখা যাচ্ছে কো-অর্ডিনেশন মহলে তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের অবশ্যম্ভাবিতা নিয়ে 'বিপ্লবী' নেতারা আলাপচারিতা করছিলেন। বস্তুত শ্রীকাকুলামের দৃষ্টান্তই চারু মজুমদারের সিদ্ধান্তকে প্ররোচিত করে লিখতে যে 'যদি আমরা কো-অর্ডিনেশন কমিটির মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখি, তাহলে আমরা বিপ্লবের অগ্রগতির মুখে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াব এবং ভারতের কমিউনিস্ট বিপ্লবের উপর আজ যে গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে তা পালনে ব্যর্থ হব।' এ ব্যাপারে কোনরকম সংশয়ের চিন্তাকে অগ্রাহ্য করে তিনি এর পরেই বলছেন 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ করার এবং বিপ্লবী সংগ্রামগুলি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পার হয়ে যাওয়ার পরও যদি পার্টি প্রতিষ্ঠায় দ্বিধা থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই সে দ্বিধা আসছে ভাববাদী চিন্তা থেকে।'[৩]

ঘটনাচক্রে দেখা গেল ভাববাদী চিন্তাধারা থেকে পার্টি গঠনের পরও মুক্ত হওয়া সহজ হয়নি। ১৯৭০ সালের ১লা জানয়ারী '*দেশব্রতী* পত্রিকায় একটি জনমানস উদ্বুদ্ধকারী সংবাদ প্রকাশিত হয় এমন একটি দৃষ্টান্তকে তুলে ধরে যা ভাববাদী প্রবণতাকেই প্রশ্রয় দেয়। সংবাদটি হল ---"শ্রীকাকুলাম এবং ডেবরা-গোপীবল্লভপুরে যা শ্রেণীশত্রুর চোখেও পড়েছে, তা ভারতের বুকে বিন্দুপ্রমাণ হলেও, লালশক্তির আবির্ভাব, সারা ভারতে যে বিপ্লব পেকে উঠেছে, তারই সন্দেহাতীত প্রমাণ ও প্রকাশ, আজ যেখানে সবুজ, কাল সেখানটা লাল হয়ে উঠবে।" এরপর কথামৃত-সুলভ একটি দৃষ্টান্ত —"জৈষ্ঠ্যের অসহ্য গরম। বিরাট আমগাছ ভরে অসংখ্য আম নিটোল ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যাকে বলে ডাঁসা। প্রত্যাশাভরে মানুষ সর্বক্ষণ লক্ষ্য করছে, আম পাকবে কবে? হঠাৎ নজর পড়ল ডালপাতার ফাঁকে একটি মাত্র আমে একটুমাত্র রং ধরেছে। অমনি উল্লাসের সাড়া পড়ে গেল ঃ পেকেছে পেকেছে, আম পেকেছে। কেউ বলল না, একটি মাত্র আমে একটু পাক ধরেছে —সবাই বলল, আম পেকেছে। অসংখ্য আমের একটি মাত্র আম, তাও একটুখানি মাত্র রঙ ধরেছে। ও হয়ত টিকবে না, হয়ত কাকে বাদুড়ে ঠুকরে খাবে, হয়ত বা শিলাবৃষ্টির শিলাঘাতে নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আম পেকেছে.....এবং যদিও এখনও সুবিপুল অধিকাংশ আম বাইরে থেকে "কাঁচাই" রয়ে গেছে এবং তাদের গায়ে এখনও রঙ ধরেনি, তবু মানুষ বুঝতে পেরেছে এবার আম পেকেছে।"

বদরুদ্দিন উমর কার্যত এই সাবজেকটিভ সর্ত পূরণের প্রসঙ্গেই বলেছেন[৪] বিপ্লবের পরিস্থিতির পরিপক্বতার —লেনিন কথিত শর্তানুযায়ী (এবং চারু মজুমদার তাঁর প্রথম দিকের রচনায় যার ওপর জোর দিয়েছেন) —উপাদানগুলি আংশিকভাবে বিদ্যমান থাকলেও অন্যগুলির অস্তিত্ব এত ক্ষীণ অথবা সেগুলি এমনভাবে অনুপস্থিত যে তার ফলে সামগ্রিক পরিস্থিতির চরিত্র সত্য অর্থে বিপ্লবী না হয়ে অন্যরকম দাঁড়ায়। এবং যা দাঁড়ায় তাকে বিপ্লবী পরিস্থিতি না বলে নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি বলা অধিকতর সঠিক ও সঙ্গত।

মনে রাখতে হবে শ্রী উমর ১৯৭৫ সালেই এই বিশ্লেষণ করেছিলেন। ১৯৯৭ সালের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নদীয়া জেলার বহু প্রাক্তন নকশালপন্থী কর্মী একইভাবে মনে করেন যে 'এখানে প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা গেল অবজেকটিভ শর্ত তৈরী থাকলেও বৈপ্লবিক প্রস্তুতি সেই স্তরে যেতে পারেনি।'[৫] এঁদের মতে নদীয়া জেলায় ছাত্ররা শহর থেকে গ্রামে গিয়েছিল শ্রেণীদ্বন্দ্বের বোধকে মানবিক অধিকারের বক্তৃতা দিয়ে তীব্র করতে যা কিনা পুরোপুরি মধ্যবিত্ত সুলভ আচরণ। তাছাড়া মেদিনীপুরে বা বীরভূমে বিশেষ করে শেষোক্ত স্থানে শ্রেণীসংগ্রাম ও ঘৃণা তীব্র হতে পেরেছিল শ্রেণীবিন্যাসের কারণে। সাঁওতাল, কোল-ভীল-আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এই শ্রেণীঘৃণা জানানো সহজ। নদীয়ায় জঙ্গী কৃষক আন্দোলনের ঐতিহ্যই নেই। এখানে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা উল্লেখযোগ্য ভাবে নেই —তার ওপর সি.পি.আই.(এম) নেতৃত্ব চিরকালই গান্ধীবাদী নীতিতে আন্দোলন চালিয়ে এসেছে ("আগের খাদ্য আন্দোলনের বছরগুলিতে এমন হত যে ভালকো থেকে জনা পঞ্চাশেক মুসলমান চাষী এসে বলল—আমাদের সত্যাগ্রহ করতে পাঠিয়ে দিল")।[৬] যদিও এই অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ শর্তপূরণের ব্যাপারটা যে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, আদৌ বিচ্ছিন্ন নয়, তা বদরুদ্দীন উমর ঐ একই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন (*পৃষ্ঠা ৪১-৪২*)। চারু মজুমদারের তত্ত্ব অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক কৃষক শ্রেণীর চেতনার বিকাশ ও সচেতনভাবে বিপ্লবকরার আদর্শগত প্রস্তুতি এবং এ ক্ষেত্রে ব্যাপক জনগণের সচেতন সমর্থনকে যদি একটা সাবজেকটিভ শর্ত হিসাবে ধরা যায় এবং জনগণ থেকে শোষক শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতা ও পুরানো কায়দায় শাসন চালানোর ক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতাকে যদি একটা অবজেকটিভ শর্ত হিসাবে ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, প্রথম ধরণের শর্ত পূরণের ওপর দ্বিতীয় ধরণের শর্তপূরণ নির্ভরশীল থাকছে।

চারু মজুমদারের নির্দেশিত পথেই নদীয়ায় শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় নকশালবাড়ির ধাঁচে কৃষক অভ্যুত্থানের সমর্থনে। ঊনসত্তরের শুরুতেই নির্বাচন আসে। নির্বাচন বয়কট-এর ডাক নিয়ে ছাত্র যুবকরা শহর ছাড়িয়ে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েন। স্ট্রীট লেকচারিং হয়, 'কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে জনতার মধ্যে ভোট বয়কটের লাইন বিন্দুমাত্র ছাপ ফেলতে পারেনি' —চাকদহের তৎকালীন নকশালবাদী ছাত্রনেতা অরুণ ব্যানার্জীর এই বক্তব্য যথার্থ বলেই মনে হয়।

বস্তুতপক্ষে সংসদীয় রাজনীতির কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা কিন্তু ফুরায় নি, এবং সেই সময়ের প্রেক্ষিতে বামপন্থী রাজনীতির কাছে এই প্রত্যাশা ছিল আরও বেশী। কেন

নির্বাচন বয়কটের আহ্বান, কিংবা সশস্ত্র গ্রামীণ বিপ্লবের ডাক তখনও সাধারণ মানুষকে স্পর্শই করেনি, যদিও মধ্যবিত্ত যুবসমাজ এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তখন ব্যাপকভাবে গ্রামমুখীন। এর একটা সম্ভাব্য উত্তর হরিনারায়ণ অধিকারীর বইতে দেওয়া হয়েছে এইভাবে যে, 'অন্ধ্রের মতো রাজ্যের যে সব জেলায় কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা ১৯৬৮-৬৯ সাল থেকে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিলেন সে সব অঞ্চলে গণসংগ্রাম, গণ আন্দোলনের ভিত্তিভূমি, অস্তিত্ব ও ছাপ আগে থেকেই ছিল এবং এর সাথে যুক্ত ছিলেন সংগ্রামের অভিজ্ঞতালব্ধ কমিউনিস্টরা। অন্ধ্রের ক্ষেত্রে তেলেঙ্গানা সশস্ত্র সংগ্রামের অভিজ্ঞতা গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গড়ার ক্ষেত্রে ছিল মূল্যবান পথ নির্দেশ। ....পশ্চিমবাংলায় কিন্তু তেলেঙ্গানার মত দীর্ঘ তিন-চার বৎসর ধরে দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিক সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম বা বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা নেই। ...নকশালবাড়ি সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম অনেকটা প্রতীকী, অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া নয়। পশ্চিমবাংলায় তাই, যেসব গ্রামাঞ্চলে নকশালবাড়ি ঘটনার পর সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি শুরু হলো —তা অনেকটা পূর্ব অভিজ্ঞতাহীন নতুন পার্টির নতুন গৃহীত লাইন অনুসারে।'[৭] একই ভাবে জনগণও কৃষক অভ্যুত্থান বলতে সি.পি.আই.(এম) পরিচালিত ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট আমলে অনুসৃত জমি দখল ও ফসল তোলার অর্থনৈতিক আন্দোলনকেই বুঝত। নির্বাচন ও আইনসভা তখনও অনেক সচেতন নাগরিকের কাছে কংগ্রেসের 'জোতদার মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া' চক্রকে প্রত্যাঘাত করার হাতিয়ার —চারু মজুমদারের মত করে তারা ভাবতে চায়নি যে, জনতার বিক্ষোভকে শান্ত করার জন্য ইউনিয়ন বোর্ড ও আইনসভা সাম্রাজ্যবাদেরই অবদান।

ঊনসত্তরের নির্বাচনে প্রায় সাতষট্টির ফলাফলেরই পুনরাবৃত্তি। কংগ্রেস নদীয়া জেলায় এইবার পায় কালীগঞ্জ, নাকাশীপাড়া, তেহট্ট, করিমপুর ও নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্র এবং অপরদিকে কৃষ্ণনগর পূর্ব ও পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হিসাবে জেতেন যথাক্রমে এস.এস.পি.-র কাশীকান্ত মৈত্র এবং সি.পি.আই.(এম) এর অমৃতেন্দু মুখার্জী, রাণাঘাট পূর্ব ও পশ্চিমে জেতেন যথাক্রমে সি.পি.আই.-এর নিতাইপদ সরকার এবং সি.পি.আই.(এম)-এর গৌর কুণ্ডু। শান্তিপুর বিধানসভা আসনটি যায় আর.সি.পি.আই.-এর মোকসদ আলির দখলে।[৮]

সি.পি.আই.(এম) পার্টি এই বার দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারেও প্রধান শক্তি। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী, তথা পুলিশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সি.পি.আই.(এম) নেতা জ্যোতি বসু। সি.পি.আই.(এম) এই পর্বে সিদ্ধান্ত নেয় পার্টির অভ্যন্তরে শুদ্ধিকরণ অভিযানের। নকশালবাড়ির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনের কারণে বিপুল সংখ্যক সি.পি.আই.(এম) কর্মী তখন বিভ্রান্ত ও দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলেন। এই অবস্থায় পার্টি একদিকে তার বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে (*গণশক্তি* সান্ধ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক বাংলা মুখপত্র *দেশহিতৈষী*, কেন্দ্রীয় ইংরাজী সাপ্তাহিক মুখপত্র *পিপলস ডেমোক্রেসি* প্রভৃতিতে) তত্ত্বগত সংগ্রাম পরিচালনা শুরু করে। বাস্তবিকই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নকশালপন্থী মঞ্চ তাদের নিজস্ব প্রকাশন কেন্দ্র ও প্রচার অভিযান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। প্রধান কমিউনিস্ট কর্মী সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত, বুদ্ধিজীবী তাত্ত্বিক প্রমোদ সেনগুপ্ত,

অসিত সেন এঁদের রাজনৈতিক প্রচার অভিযান সে সময় 'নকশালবাদ'-কে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় ও ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি করছিল।

নদীয়া জেলাতেও প্রবীণ কমিউনিস্ট কর্মীদের একাংশ ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন নতুন ধারার বিপ্লবী রাজনীতির আহ্বানে। কল্যাণী এলাকার ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং সি.পি.আই.(এম)-এর কল্যাণী জোনাল কমিটির প্রাক্তন সেক্রেটারী সুবোধ গাঙ্গুলী একসময়ে নকশালবাড়ি রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সাতচল্লিশে উদ্বাস্তু হয়ে আসার পর প্রথমে কল্যাণী চাঁদমারী ক্যাম্প ও পরে গয়েশপুর কলোনীর বাসিন্দা সুবোধ গাঙ্গুলী দীর্ঘদিন ধরেই কল্যাণীর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ও এখনও আছেন। চাকদহর পুরোনো কমিউনিস্ট নেতা সৌরেন পাল-এর মত সুবোধ গাঙ্গুলীও কৌতূহলবশতঃ নকশালবাড়ি ঘটনার পর সেখানে যান। যদিও এঁরা পরে সি.পি.আই.(এম) পার্টিতেই আনুগত্য পুনঃস্থাপন করেন, এবং নকশালবাড়ি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত, কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে, সুবোধ গাঙ্গুলী নকশাল হয়ে যাওয়ার গুজব যে ভালভাবেই ছড়িয়ে গিয়েছিল তা তিনি নিজেই মৌখিকভাবে স্বীকার করেন। অপরদিকে সৌরেন পাল বর্তমানে বিক্ষুব্ধ সি.পি.আই.(এম) হিসাবে পরিচিত। চাকদহের অপর কমিউনিস্ট নেতা অরুণ ভট্টাচার্যের নামও সন্দেহভাজন উগ্রপন্থী হিসাবে পুলিশের রেকর্ডে পাওয়া গিয়েছে। অভিজ্ঞ সি.পি.আই.(এম) কর্মীদের নতুন রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ পার্টি নেতৃত্বের অজ্ঞাত ছিল না। সেই সুবাদে এই বিভ্রান্ত কর্মীদের প্রতি সরাসরি না হলেও, পরোক্ষভাবে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

যেমন শান্তিপুরের ধীরেন বসাক-এর ক্ষেত্রে হয়েছিল। নির্বাচনে প্রথমে শান্তিপুর লোকাল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক বিমল পালকে প্রার্থী হিসাবে সি.পি.আই.(এম) জেলা কমিটি মনোনীত করে। শান্তিপুর লোকাল কমিটি তৎকালীন সম্পাদক ধীরেন বসাকের নাম প্রস্তাবাকারে পাঠালেও নকশালবাড়ি ঘটনার পর প্রমোদ সেনগুপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে। সে সময়ের যুক্তফ্রন্টের আহ্বায়ক সুধীনকুমার ধীরেন বসাকের বাড়িতে এসে প্রস্তাব রাখেন যাতে শান্তিপুর বিধানসভা আসনটি এবারও আর.সি.পি.আই-কে দেওয়া হয়। এর আগে শান্তিপুরে কানাই পাল দীর্ঘদিন ধরে আর.সি.পি.আই.-এর প্রার্থী হিসাবে বিধানসভা সদস্য ছিলেন এবং শান্তিপুরের রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। কানাই পালও নকশালপন্থী যুবকদের প্রতি 'দুর্বলতার' কারণে (১লা মে কলিকাতা শহীদ মিনারে সি.পি.আই.(এম-এল) ঘোষণার দিন কানাই পাল মিটিং-এ গিয়েছিলেন জনগণতন্ত্র কাগজ বিলি করতে) সি.পি.আই.(এম)-র সমর্থন হারান ও বিধানসভার পদ হারান। ঘটনা দাঁড়ায় এই যে কেবল ধীরেন বসাক-এর প্রার্থীপদ নাকচ করার জন্যই মকসদ আলীকে প্রার্থী করে আর.সি.পি.আই.কে শান্তিপুর দিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্র-ফেডারেশনে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরী হয় জেলা কমিটি ও রাজ্য কমিটির এই সিদ্ধান্তে এবং মকসদ আলী নির্বাচনে জয়ী হন অনেক বিরোধিতা পার হয়ে।

একই রকমভাবে চাকদহতেও সৌরেন পাল '৬৮তে জেলে থাকা অবস্থাতেই চাকদহ কল্যাণী আঞ্চলিক পরিষদের সম্পাদক নির্বাচিত হন জেলা কমিটির প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও।

এইভাবে ১৯৬৮-র শেষ থেকেই পশ্চিমবঙ্গে সি.পি.আই.(এম) এক কঠিন রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও নকশালপন্থার অভাবনীয় প্রসার ঠেকাতে মতাদর্শগত প্রচারে মন দেয় সি.পি.আই.(এম)। শুধু মতাদর্শগত সংগ্রাম দিয়ে না চললে, '*দেশব্রতী*-র খবর অনুযায়ী, "কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) বিপ্লবী অংশ স্থানীয় শ্রমিক আন্দোলনে নয়াসংশোধনবাদীদের প্রকৃত স্বরূপ যখন আন্দোলনের মারফৎ শ্রমিকদের কাছে তুলে ধরেছেন, তখনই তারা বেসামাল হয়ে পড়ায় ঠিক কংগ্রেসী কায়দায় বিপ্লবী কর্মীদের নামে মিথ্যা কেস দায়ের করে, গ্রেপ্তার করিয়ে এবং পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে ঘর সামলাতে চেষ্টা করছে।"

"ইতিমধ্যেই তারা তিনজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে পি.ডি.অ্যাকটে ধরিয়ে দিয়েছে। এঁরা হলেন বিড়ি শ্রমিক কমরেড হরদাস পাল, তাঁত শ্রমিক কমঃ নিত্যানন্দ পাল এবং অপর একজন তাঁত শ্রমিক কমরেড ভজন কুণ্ডু।"[৯] ঊনসত্তরের নির্বাচনের প্রাককালে শান্তিপুর, নবদ্বীপ ও নদীয়ার অন্যান্য জায়গা থেকে বহু বিপ্লবী কর্মীদের পি.ডি.এ্যাক্টে গ্রেপ্তার করা হয়। '৬৯-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত একটি খবরে জানা যায় যে, নদীয়া জেলার মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা যা পাওয়া গেছে তা হল বাইশ। এর মধ্যে নয় জন কৃষ্ণনগরে, দশ জন শান্তিপুরে, দুই জন নবদ্বীপে ও একজন চাকদার বিপ্লবী কর্মী আছেন।[১০] অবশ্য তখন রাজ্যপাল শাসিত পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের প্রাককালে বিপ্লবী রাজনীতিকদের প্রতি এই গ্রেপ্তারী পরোয়ানাগুলি তুলে নেওয়া হয় জ্যোতি বসু তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্যোগে। এপ্রিল মাসেই নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের নায়ক কানু সান্যালের মুক্তির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর কানু সান্যাল বিবৃতি দেন যে এর দ্বারা দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বিন্দুমাত্র পাল্টাবে না, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে সরকার জনগণের প্রবল দাবী ও চাপের কাছে নতি স্বীকার করেই এবং কিছুটা জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কারণেও —এই মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে।[১১]

এই এপ্রিলেই কো-অর্ডিনেশন (AICCCR) কমিটি একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ১৯ এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিল. ১৯৬৯ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এক বর্ধিত অধিবেশনের পর কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটি ঘোষণা করে যে '২২ এপ্রিল, ১৯৬৯-এ মহান লেনিনের শততম জন্মদিবসে মাও সে তুঙ-এর চিন্তাধারার ভিত্তিতে বিপ্লবী পার্টি —"ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যে কাজ সম্পন্ন করার ভার আঠার মাস আগে, ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে তারা গ্রহণ করেছিলেন।' কমিটি আরও ঘোষণা করে যে, 'উপযুক্ত সময়ে কংগ্রেস অনুষ্ঠানের জন্য কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটি স্থাপন করে কমিটি নিজেদের ভেঙে দিয়েছে।' ২২ এপ্রিল সি.পি.আই.(এম-এল) একটি রাজনৈতিক প্রস্তাবও গ্রহণ করে।

অতঃপর ১লা মে তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতার শহীদ মিনারে আহুত এক সভায় কানু সান্যাল সি.পি.আই.(এম-এল)-এর জন্মের কথা ঘোষণা করেন। প্রবল প্রতিক্রিয়া তোলে এই ঘোষণা —পক্ষে, বিপক্ষে। জেলায় জেলায় নকশালবাড়ির সমর্থনে জড়ো হচ্ছিলেন যে বিপ্লবী কর্মীরা, তাঁদের কাছে পার্টি গঠনের ঘোষণা আকস্মিক হলেও উৎসাহজনক মনে হয়েছিল।

নদীয়ার শহর ও গ্রাম থেকে বহু বিপ্লবী ক্যাডার ১লা মের মিটিং-এ যান। রাণাঘাটের মতো বিপ্লবী রাজনীতিতে পিছিয়ে পড়া এলাকা থেকেও শ'খানেক কর্মী কলকাতায় যোগ দিতে যান। নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুর থেকেও বহু কর্মী কলকাতা যান। শান্তিপুর থেকে সেদিনের মিছিলে যোগদানকারী এক গণনাট্যকর্মীর[১২] স্মৃতিতে 'শান্তিপুরের তাঁতী বাড়ির সুতো শুকোতে দেওয়া বাঁশ খুলে নিয়ে তাতে পতাকা ওড়াতে ওড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কলকাতায়। এস.এন. ব্যানার্জী রোড ধরে নকশালদের মিছিল এগোচ্ছে —হাতে রেড বুক, আর লেনিন সরণী দিয়ে সি.পি.আই.(এম)-এর মিছিল। এক অসম্ভব উত্তেজনাকর মুহূর্ত।'

পয়লা মে, উনসত্তরে শহীদ মিনারে তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাক।

সি.পি.আই.(এম) —"নতুন পার্টি গঠন বামপন্থী দলগুলির ভাঙনকেই প্রকট করবে। ভারতের জনগণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে পৃথক অন্য কোন ধারা অনুসরণে এখনও প্রস্তুত নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে নকশালপন্থীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য।"

[......The formation of the new party would only create the impression that the Leftist forces are disunited. .....The people of India were not yet in a mood to take steps other than those of the usual democratic variety. In these circumstances.....the Naxalites would become isolated."][১৩]

সি.পি.আই পার্টির বক্তব্য সে সময়ের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দি স্টেটসম্যান পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী, সি.পি.আই. নকশালপন্থীদের খানিকটা সহানুভূতির দৃষ্টিতে গ্রহণ করে। সি.পি.আই.(এম) নেতাদের মত এই নকশালপন্থী বিপ্লবীদের CIA—এজেন্ট বা চর হিসাবে ভূষিত না করে সি.পি.আই. বরং তাদের 'বিপথগামী' বলেই ক্ষান্ত থেকেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীগত ফারাকের পিছনে গভীর রাজনৈতিক পরিকল্পনা বা চাল ছিল।

নদীয়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় সি.পি.আই.(এম) সদ্যগঠিত সি.পি.আই.(এম-এল)-এর সঙ্গে মুখোমুখি বৈরিতার সম্পর্ক নিয়ে দাঁড়ায়, তখন সি.পি.আই নকশালপন্থীদের প্রকাশ্য সমর্থনে এগিয়ে আসে। অপরপক্ষে সে সময়ের কমিউনিস্ট পার্টির এই ভ্রাতৃঘাতী বৈরিতা কিভাবে জাতীয় কংগ্রেসকে পশ্চিমবঙ্গে হারানো 'ক্ষমতার অলিন্দে' ফিরে আসতে উৎসাহিত করে তার এক বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাক নদীয়ার চাকদহর বিক্ষুব্ধ সি.পি.আই.(এম) নেতা অরুণ ভট্টাচার্য-এর লিখিত বিশ্লেষণ থেকে—

"১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় সি.পি.আই.(এম-এল) পার্টি গঠিত হয়। দিকে দিকে এই পার্টির সংগঠন গড়ে তোলার সময় দলীয় রেষারেষি বাড়তে থাকে (যদিও

নদীয়া জেলার অধিকাংশ শহরেই সত্তর-একাত্তরেও সি.পি.আই.(এম) ও সি.পি.আই.(এম-এল) বৈরিতা পরস্পর হানাহানির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়নি — সত্তরে এর একমাত্র ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়ায় চাকদহঃ মন্তব্য লেখকের)। ক্ষমতার রাজনীতিতে যুগ যুগ ধরে অভ্যস্ত কংগ্রেস দলের কাছে সি.পি.আই.(এম) ছিল রাজ্য ক্ষমতা হারানোর ক্ষেত্রে প্রধান বাধাস্বরূপ। এই দলের শক্তিবৃদ্ধিতে শাসকদল ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। সি.পি.আই.(এম)-কে দুর্বল করাই ছিল সে সময় পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য। নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের ওপর পুলিশের গুলি চালনা এবং তাকে কেন্দ্র করে দলীয় অসন্তোষ ও বিভাজন কংগ্রেসের কাছে আশাতীত আর্শীবাদের কারণ হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দেবার জন্য যতপ্রকার ষড়যন্ত্র সম্ভব সবই করা হয়েছিল। সারা দেশ জুড়ে সি.পি.আই.(এম) -এর ভাঙনে সি.পি.আই উল্লসিত হয় —-উল্লসিত হয় কংগ্রেস সরকার।"

'কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে যেমন কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের সাথে সি.পি.আই.(এম-এল)-এর আন্দোলনকে সম্মুখ সংঘর্ষে যেতে হয়, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তৃতীয় পার্টিটির প্রাথমিক বিরোধ ঘটে সি.পি.আই.(এম)-এর সাথে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিশেষ রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে সি.পি.আই.(এম)-কে দুর্বল ও নির্বাচনী রাজনীতিতে কোণঠাসা করার প্রয়োজনে কংগ্রেসের বিভিন্ন এলাকার নেতৃত্ব নতুন পার্টির আন্দোলনে একটা বিষয়ে স্বার্থের সাযুজ্য দেখায়।'

'সি.পি.আই.(এম) যখন গড়ে ওঠে তার সাংগঠনিক কাঠামো ছিল ছোট। খাদ্য আন্দোলন এবং যুক্তফ্রন্ট বাতাবরণে পার্টির সদস্যসংখ্যা একটা বিরাট লাফ দেয়। নতুন সদস্য ও কর্মীবাহিনী অধিকাংশ গণজোয়ারে ভেসে আসা ছাত্র-যুব ও মধ্যবিত্ত মানুষ। শ্রমিক কৃষকের ধারাবাহিক সংগ্রামে অভিজ্ঞ মানুষের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম ছিল।'

প্রসঙ্গক্রমে জানানো যাক, নদীয় জেলা সি.পি.আই.(এম)-এর কৃষ্ণনগর শহর কমিটির যে একজনমাত্র সদস্য পার্টির প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, সেই প্রাক্তন বিধায়ক সাধন চট্টোপাধ্যায়ও নতুন পার্টিতে ব্যাপকভাবে যুবছাত্র-বাহিনীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এর মূল কারণ ছিল মধ্যবিত্তের হাতে অর্থাগম ও রাজনীততে অংশগ্রহণ। আগের যুগের রাজনীতির 'অভিজাততন্ত্র' শেষ হয়ে ক্রমে ষাটের দশকের অর্থনীতিক সংকট ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ গৃহস্থ সব শ্রেণীকেই রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। কিন্তু রাজনীতি একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া যেখানে অভিজ্ঞতা একটা প্রধান উপাদান। এই নতুন শ্রেণীর সেই ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় কোনটাই ছিল না। চটজলদি ফলাফল আকাঙ্খার তাগিদে বিপ্লবের শ্লোগানের প্রতি এরাই আকৃষ্ট হয় ও ভিড় জমায়।[১৪] পার্টিগুলির প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া ও বিশ্লেষণও দৃষ্টি আকর্ষণকারী ছিল।

সি.পি.আই.(এম-এল) গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে *বরুণ সেনগুপ্ত* রচিত এক প্রবন্ধের কতকাংশ[১৫] উল্লেখ করা গেল—

"....আসলে এই প্রথম একটি রাজনৈতিক দল, যাঁরা বললেন সশস্ত্র বিপ্লবই একমাত্র

পথ —মাঝামাঝি কোনও 'স্তর' নেই। যাঁরা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান দিলেন। যাঁরা বললেন, এখনই গ্রামে গ্রামে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে তোলো। যাঁরা বলছেন, নির্বাচন ভাঁওতা —রাইফেলই শক্তির উৎস। 'প্রতিক্রিয়াশীলদের' অর্থাৎ প্রতিপক্ষের উপর সশস্ত্র আঘাত হানা যাঁদের আশু কার্যক্রম। এ সবই নতুন কথা।"

"…..আরও একটা বিচারে এঁরা নতুন। এই প্রথম একটি রাজনৈতিক দল জন্ম নিল যারা প্রকাশ্যে ভারতের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন একটি রাষ্ট্রের নেতৃত্বকে তাঁদের পথপ্রদর্শক বলে ঘোষণা করলেন। গোপনে এর আগেও হয়ত অনেক দল শত্রু রাষ্ট্রের কাছে প্রেরণা এবং সাহায্য পেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ প্রকাশ্যে সেকথা বলার মত দুঃসাহস বা সৎসাহস দেখাতে পারেননি। এঁরা তা দেখালেন।"

"…..আইন বাঁচিয়ে কাজ করার সামান্য চেষ্টা নেই এমন রাজনৈতিক দলও বোধহয় আধুনিক ভারতে এই প্রথম। ….গোপন জিবি মিটিং-এর চার দেওয়ালের ভিতরে আটকে রাখার সামান্য চেষ্টাও নেই এদের।"

"…নতুন দলের এইসব নতুনত্ব ভারতের রাজনৈতিক জীবনে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলতে বাধ্য। ….তাছাড়া নির্দল তরুণদের উপরও পড়বে এই নতুন রাজনীতির প্রভাব। বিরোধিতা এবং উগ্রপন্থা সবদেশেই তরুণদের বেশী করে আকর্ষণ করে। বিশেষভাবে যে সব দেশে হতাশা বেশি।"

"….ভারতেব সকল রাজ্যে যে নতুন দলের প্রভাব সমান পড়বে তাও নয়। যেসব রাজ্যে কংগ্রেস বা অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দল ক্ষমতায় তার চেয়ে বেশী প্রভাব পড়বে বামপন্থী গোষ্ঠী শাসিত দুটি রাজ্যে। কারণ বিক্ষুব্ধ বামপন্থী ঘেঁষা সাধারণ মানুষের বামপন্থী দলগুলির উপর ভরসা করবার যে সুযোগ আছে —কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে তা নেই।….ক্ষমতায় থাকার ফলে তাঁদের (বাম কমিউনিস্টদের) বিরোধী ভূমিকাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"[১৬]

আনন্দবাজারের সাংবাদিকের এই বিশ্লেষণ, অন্ততঃ পার্টি ঘোষণার পরক্ষণেই —যথেষ্ট দূরদর্শী প্রমাণিত হয়েছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যান্য সংবাদপত্রগুলি বিশেষতঃ সে সময়ের ইংরাজী পত্রিকাগুলি যেমন *দি ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দি টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া বা দি স্টেটসম্যান*-এর কোনটিরই এই তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টিটিকে সুলক্ষণযুক্ত মনে করেছিল — এমন ভাবার কোন কারণ নেই। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য — (Naxalbari and After'- Frontier Anthology, Vol. I, 'Third Party Risks' -commentator, pp. 14-15)

এই তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় সরকার যে বয়ান দেয় তাতে পরিষ্কার হয় যে এদের আর পাঁচটি রাজনৈতিক দলের মতো দেখা হচ্ছে না। ৩ মে, ১৯৬৯ তারিখের *The Statesman 'The centre May Assume Special Powers To Deal with Naxalites'* —এ[১৭] বলা হচ্ছে ".....Most opposition parties (in Parliament) already view with alarm the Naxalites' efforts to organize themselves into a third communist Party." এছাড়াও "......Naxalite activity

has been noticed, in varying degrees, in seven states, according to reports with the Centre -West Bengal, Kerala, Andhra Pradesh, Bihar, Assam, Uttar Pradesh, and recently Punjab." কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই বক্তব্যের পরদিনই কলকাতায় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী সংবাদিকদের বলেন -"Naxalites no threat to law and order : No action by state now."[১৮] প্রকৃতপক্ষে তখনও অব্দি যুক্তফ্রন্ট সরকার মুখে বলছিল যে 'নকশালদের' চেয়েও গুরুতর সমস্যা যদি থাকে তবে সেটা হল সাম্প্রদায়িকতা। জ্যোতি বসুর যেসব বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল তাতে বোঝা যাচ্ছিল যে নকশাল সমস্যাকে সরকার প্রাথমিক ভাবে রাজনৈতিক দিক দিয়েই মোকাবিলা করতে চান। বাস্তবিকই তখনও সি.পি.আই.(এম) তথা যুক্তফ্রন্ট, সি.পি.আই.(এম-এল) সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত, সেই নিয়ে যে দ্বিধায় ছিল তা পরিষ্কার ছিল কিছু স্ববিরোধী বিবৃতিতে। ২রা মে পার্টি ঘোষণার পরদিন *দি স্টেটসম্যান* পত্রিকা জ্যোতি বসুর যে বিবৃতি প্রকাশ করে তাতে বলা হয় যে সরকার তার প্রশাসনিক বল দিয়ে একদিনেই নকশালদের মুছে দিতে পারে। কিন্তু তিনি সরকারী তরফে নয়, রাজনৈতিক স্তর থেকেই বিবৃতি দিয়ে নকশালপন্থীদের সাবধান করে দেন এই বলে বিপ্লবের নামে তাদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ জনগণ বরদাস্ত করবে না কারণ এই নকশালপন্থীরা তাঁর ভাষ্যে 'কংগ্রেসের দালাল।'[১৯] কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 'কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ ক্ষমতা অধিগ্রহণের' প্রশ্ন তোলায় রাজ্য সরকারের এক শরিকের এই বিবৃতির উদ্দেশ্য সহজবোধ্য, কিন্তু সংবাদপত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সি.পি.আই.(এম) পাশাপাশি এই সংশয়েও ভুগছিল যে, নকশালপন্থীদের কেবল সমাজবিরোধী বলে তুচ্ছ করলেই সমস্যার সমাধান হয় না, কারণ — "......if the CPI(M) chooses to keep itself away from the proposed talks after describing the Naxalites as anti-social elements it may find itself isolated from the other opposition parties."[২০]

কমিউনিস্টপন্থী রাজনৈতিক ভাষ্যবিদ হরিনারায়ণ অধিকারী এই পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে —(মনে রাখা দরকার হরিনারায়ণ অধিকারী ছিলেন নদীয়া জেলায় সি.পি.আই.(এম) পার্টির একজন সর্বক্ষণের কর্মী। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে তাঁকে প্রাদেশিক দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারে জ্যোতি বসুর উপ-মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময় হরিনারায়ণ অধিকারী জ্যোতি বসুর একান্ত সহকারী রূপে নিয়োজিত হন)। "পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের মধ্যে বিভেদ অন্তর্দ্বন্দ্বে সৃষ্ট জটিল পরিস্থিতি এবং নকশালবাড়িপন্থীদের ক্রিয়াকলাপে উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিমণ্ডল কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের পক্ষে ছিল অনুকূল। পশ্চিমবঙ্গের তীব্র বেকার সমস্যা,[২১] শিক্ষিত বেকার যুবক এবং তরুণ ছাত্র সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনমূলক কিছু একটা করার বেপরোয়া মনোভাবকে R.A.W-সহ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এজেন্সীগুলি মূল্যায়ণ করে। তারা আরও মূল্যায়ণ করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কারমূলক কার্যক্রমের ফলে গ্রামাঞ্চলে গরীব কৃষকসমাজ এবং জোতদার ও

ধনীকৃষকদের মধ্যে দুইটি শিবির কার্য্যতঃ সৃষ্টি হচ্ছে।...একদিকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবস্থিতিতে গ্রামের গরীবরা বা অনগ্রসর উপজাতি এলাকার মানুষেরা সচেতন হচ্ছে আবার পাশাপাশি বিভিন্ন জেলার কতগুলি এলাকাকে কেন্দ্র করে নকশালবাড়িপন্থীদের প্রভাব এবং কার্যক্রম ছড়াচ্ছে। অপরদিকে শহরাঞ্চলে শিল্প এলাকায় বাড়ছে লুমপেন প্রোলেতারিয়েত। এক সময়ে লুমপেন প্রোলেতারিয়েতরা কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় ছিল। কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর লুমপেন প্রোলেতারিয়েতরা অনেকটা ছত্রহীন বিচ্ছিন্ন। পশ্চিমবঙ্গের এই সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের ষড়যন্ত্র রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হয়েছিল। সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব ও সরকার।"[২২]

সুতরাং "পশ্চিমবঙ্গে সি.পি.আই.(এম) ও বুঝেছিল সি.পি.আই.(এম-এল) তথা নকশালবাড়িপন্থিদের সাথে তাদের শুধু রাজনৈতিক চিন্তার সংঘর্ষ নয়, সশস্ত্র সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে পড়ছে। তাই সি.পি.আই.(এম)ও তার কর্মীদলকে প্রয়োজনমাফিক সংগঠিত করে তালিম দিতে থাকে। রাজনৈতিক শুদ্ধিকরণ অভিযানই শুধু নয় যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য "স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী" বা "ভলান্টিয়ার স্কোয়াড" গঠনের নির্দেশ দেওয়া হলো পার্টির জেলা, লোকাল এবং ব্রাঞ্চ ইউনিটগুলিকে।"[২৩]

নদীয়া জেলায় সি.পি.আই.(এম-এল) ঃ
একক এবং বনাম, শহর এবং গ্রাম

বিপ্লবের নামে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দিয়েই শুরু হয়েছিল কৃষ্ণনগরের ঊনসত্তর সাল। এপ্রিল মাসের নয় তারিখে শহরের জনবহুল রাস্তায় কিছু যুবক সি.পি.আই.(এম) বিধায়ক অমৃতেন্দু মুখার্জীকে পেটে, বুকে ও চোখে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। পুলিশ পরে 'গোরা' নামে এক যুবক ও তার সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় সংবাদপত্রে লেখা হয় 'কৃষ্ণনগরের সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষ থেকে এই গুণ্ডামীর তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এভং প্রতিবাদজ্ঞাপনের জন্য গতকাল এক বিরাট মিছিল বার হয়। পরে বৈকাল চারটায় কৃষ্ণনগর টাউনহলে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।'[২৪] স্বাভাবিক ভাবেই নদীয়ার সি.পি.আই.(এম) জেলা সম্পাদকের ওপর এই আক্রমণ পার্টির মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত ১১ই এপ্রিল একটি বিবৃতিতে সরাসরি নকশালপন্থী যুবকদের এই আক্রমণের জন্য চিহ্নিত করেন এবং তাদের ক্রিমিন্যাল বলে আখ্যা দেন।[২৫] অপরদিকে 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পক্ষে শ্রী সত্যানন্দ ভট্টাচার্য' প্রমোদ দাশগুপ্তের ওই বিবৃতির বিরোধিতা করে পাল্টা বিবৃতিতে বলেন যে "ব্যক্তিগত এই খুনখারাবির পদ্ধতিকে কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা ঘৃণা করেন।" তিনি আরও বলেন যে "ঐ ঘটনার ঠিক পরেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের কর্মীরা যে সশস্ত্র হামলা চালায় তার থেকেই

তাদের পূর্ব প্রচারের তাৎপর্য প্রকাশ হয়ে যায়। তারপর অদৃশ্য ইঙ্গিতে পুলিশ নিরপরাধ জনপ্রিয় কর্মীদের গ্রেপ্তার করে ও ওদের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থেকে যায়।"[২৬]

দুই কমিউনিস্ট শিবিরের এই চাপান উতোরের মাঝখানে একটা জিনিষ প্রচ্ছন্ন ছিল যে তখনও অব্দি 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের' কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জানত না, যে জেলান্তরে কাদের নিয়ে গড়ে উঠছে 'সঠিক মাওবাদী পার্টি' (এ প্রসঙ্গে এটাও স্মরণে রাখা দরকার যে সত্যানন্দ ভট্টাচার্য বেশিদিন নতুন কমিউনিস্ট শিবিরের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেননি)।[২৭]

নদীয়ায় বিপ্লবী কমিউনিস্ট কর্মীরা যাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল সেই নাদু চ্যাটার্জীর পরবর্ত্তী ভাষ্য এই রকম যে অমৃতেন্দু মুখার্জীর ওপর আক্রমণের চেষ্টা ছিল 'বাহাদুরি দেখানোর' একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। 'গোরা ও শুভ্রাংশু স্রেফ একটা, পারবি? 'পারব' —করবার জন্য একটা কাঁচি দিয়ে গদা-দাকে (অমৃতেন্দু মুখার্জী) মারার চেষ্টা করে।'

সংগঠক এবং নেতা হিসাবে নাদু চ্যাটার্জী এই যুবকদের কো-অর্ডিনেশনে যুক্ত করেছিলেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে। 'গোরা' নামে যে যুবকটি অমৃতেন্দু মুখার্জীর ওপর আক্রমণের জন্য চিহ্নিত হন, তাঁর অতীত কিরকম ছিল তা তাঁর নিজের ভাষ্যেই জানা যাক ঃ

'In my boyhood when I was a boy of 13/14 years, I was allured by the rowdy activities of one Adhir Sharma of Petnipara who lived close by our quarters. I was addicted to wine and took some part in the rowdy activities at the instance of Adhir Sharma and his associates, viz. Sona Ray, Gopal Biswas, Bara Khoka and some others of the some locality. My father did not like it and tried to mend my habit by sending me to my uncle's house at Golapathy and he himself shifted to Chhutarpara of the town. I could not give up my habit to mix with said Adhir Sharma and his group ...Then I came out of the control of my uncle and relatives to move with Adhir Sharma who exploited me and I was known as a 'Goonda.' I was arrested on several occasions for rowdy activities from the brothels, liquor shops and also in cinema houses...'

'In the early part of 1969 some students of Krishnagar L.C.E. College at the instance of Nadu alias Soven Chatterjee of Naderpara, Krishnagar town, approached me and requested me to join a political party to which they belong.'[২৮]

এরকমই 'লুম্পেন' শ্রেণী চরিত্র নিয়ে বিপ্লবী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল কৃষ্ণনগরের বুলি (স্বপন) সিংহ রায় (পরবর্ত্তীতে যার চরিত্রবিবর্ত্তনের শংসাপত্র দিয়েছেন অমল লাহিড়ী, প্রদীপ চ্যাটার্জী, কুমুদ সরকার প্রমুখ নদীয়ার মাওবাদী কর্মীরা)। যদিও বুলি রায়ের অন্তিম পরিণতি এই বিবর্ত্তনকে অস্বীকার করে।

পুলিশ রেকর্ডে লেখা এবং প্রকৃত অর্থেই Vagabond বা শিকড়বিহীন এই যুবকদের শহরে প্রচারের কিছু কাজে লাগানো যেতে পারে—এই আশায় শহর নেতৃত্ব এদের নিয়োগ

করেন। অতএব সত্তর দশকের শুরুতে পার্টির সংগঠকদের যে 'এ্যাকশন স্কোয়াডের' কর্মীদের কাছে পিছু হঠতে হয়েছিল—শুরুতেই তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। শহর কমিটির সম্পাদক পঙ্কজ জোয়ার্দ্দার যিনি কৃষ্ণনগরের ছাত্রযুব বাহিনীর নেতা ছিলেন এবং যিনি বাস ও টেম্পো শ্রমিকদের নিয়ে প্রায় সব সময় কাজ করতেন—তিনিও একাত্তরে এ্যাকশন স্কোয়াডের কাছে হুমকি পেয়ে শহর ও সংগঠন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর যুবকরা চিরকালই গ্রাম ও গ্রামের কাজকর্মকে এড়িয়ে চলেছে। এ ব্যাপারে নাদু চ্যাটার্জীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। কৃষ্ণনগর শহরের এ্যাকশন স্কোয়াড যাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল তাদের অন্যতম ছিল এল.সি.ই কলেজের ছাত্র শুভ্রাংশু ঘোষ। নাদু চ্যাটার্জী নিজে অনেকবার শুভ্রাংশুকে গ্রামে কাজ করতে পাঠানোর চেষ্টা করেছেন। কোনো গ্রামে রেখে দিয়েও এসেছেন। '৬৯-এর শেষাশেষি থেকে নাদু চ্যাটার্জী নিজে পুরোপুরি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে, গোটা জেলায় ঘুরে ঘুরে সংগঠনের কাজ দেখছেন—হরিণঘাটা থেকে উত্তরে করিমপুর-গোপালপুরঘাট অব্দি। এই ভাসমান অবস্থায় শুনলেন পরদিনই শুভ্রাংশু কৃষ্ণনগরে ফিরে এসেছেন। তাঁরও বিশেষ কিছু করণীয় ছিল না।

নবদ্বীপের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা, যাঁরা অভিজ্ঞতা ও তাত্ত্বিক বোধ দিয়ে সি.পি.আই (এম)-এর নির্বাচন সর্বস্ব রাজনীতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে নকশালবাড়ির রাস্তাকে অনুসরণ করার প্রচারে ছিলেন পুরোভাবে, তাঁদেরকেই পার্টি গঠনের সময় পরিত্যাগ করা হয়। কো-অর্ডিনেশন পর্বে নদীয়া জেলার সম্পাদক নবদ্বীপের রবি ভট্টাচার্যও মনে করেন পার্টি গঠনের শুরু থেকেই সংগঠকদের বিচ্ছিন্ন করার একটা প্রয়াস চলে। জেলা কো-অর্ডিনেশনের সম্পাদক থাকা সত্ত্বেও তাঁর অজ্ঞাতসারে জেলায় পার্টি গঠনের মিটিং শান্তিপুরে স্থানান্তরিত হয় এবং এই নির্দেশ প্রাদেশিক কমিটি থেকেই আসে। সরোজ দত্তের উপস্থিতিতে রবি ভট্টাচার্য অপমানিত হন নবদ্বীপের ছাত্রনেতা প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়[২১] এর কাছে, পার্টির সঙ্গে তাঁর বিচ্ছিন্নতার সেই সূচনা। এরপর নবদ্বীপে প্রগতি পরিষদ ও সি.পি.আই (এম-এল) বিপ্লবের উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে হাঁটতে শুরু করে। যদিও কলকাতায় পয়লা মে'র মিটিং-এর পরপরই নবদ্বীপ রাধাবাজার পার্কে উনিশে মে তারিখে পার্টি প্রতিষ্ঠা ও মে দিবস উপলক্ষ্যে যে জমায়েত হয় সেখানে সত্যানন্দ ভট্টাচার্য, রবি ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন।

তবু শুরুতে সংগঠন গড়ে তোলার মানসিকতা নিয়ে শহরে গ্রামে ইতিবাচক কাজ হচ্ছিল। কৃষ্ণনগর শহরের দু-একটি পাড়া বা এলাকা বাদ দিয়ে প্রতিটি এলাকাতেই ভাল 'বেস' গড়ে উঠছিল। বাস শ্রমিকদের মধ্যে পঙ্কজ জোয়ার্দার নিজে কাজ করতেন। এই শ্রমিকদের মধ্যে থেকে কার্ত্তিক লাহা, উদয় রায় প্রভৃতি কিছু কিছু যুবক উঠে আসেন বিপ্লবী যুবকদের দলে। তবে সাধারণভাবে এই মটর ইউনিয়ন-এ উল্লেখযোগ্য আন্দোলন কিছু না ঘটলেও শ্রমিকদের সাধারণ সামাজিক আচরণে কিছু পরিবর্ত্তন আনা সম্ভব হয়েছিল—যেমন মদ খাওয়া বা উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ করা ইত্যাদি।

ছাত্রফ্রন্টে পলিটেকনিক ছাড়া কৃষ্ণনগরের অন্য কলেজগুলিতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পড়েনি। পড়েনি যে তার প্রমাণ, উনসত্তরে কৃষ্ণনগর কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফলাফল। মোট বত্রিশটি আসনের মধ্যে বি.পি.এস.এফ (বাম) পায় তেইশটি এবং নকশালপন্থী ছাত্র ফেডারেশন পায় নয়টি। আটষট্টিতে কৃষ্ণনগর কলেজে সদ্য ভর্ত্তি হওয়া এক গ্রামের যুবক সমীর বিশ্বাস—যিনি শিবপুর-চাঁদের ঘাট অঞ্চলে কাজ করার জন্য গিয়েছিলেন, কলেজে বা হোস্টেলে বহু মেধাবী ছাত্রের সংস্পর্শে এলেও বিপ্লবী রাজনীতির প্রসার তাদের মধ্যে ঘটেনি বলেই মনে করেন। কিছু ছেলে 'জুটেছিল' যারা 'নকশাল' নাম নিয়ে কিছুদিন মস্তানি করে এবং পরে কো-অর্ডিনেশন পর্বে সরেও যায়। সমীর বিশ্বাস নিজে এই মাওবাদী ধারায় আগ্রহী হয়েছিলেন তার মূল কারণ ছিল তাঁর পারিবারিক আবহাওয়া। ছোটবেলা থেকেই বাবা বা মামা—যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন, তাঁদের সৌজন্যে বাড়িতে মার্কসবাদী বইপত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। কলেজে পড়াকালীন হঠাৎই প্রায় আবিষ্কার করেন যে পরিবারের আর্থিক বনিয়াদ ভেঙে পড়েছে। অবস্থার এই পবিবর্ত্তন যেভাবে তাঁর মনে নিরাপত্তাহীনতার ধ্বসনামায় সেই ভাঙনের বোধ থেকেই তাঁর আসে দেশের অবস্থার প্রতিও এক ধরনের অনাস্থা। জন্মায় ক্রোধ, ঝোঁকেন সক্রিয় রাজনীতির প্রতি, আগ্রহী হন নকশালবাড়ি রাজনীতি সম্পর্কে, পড়তে শুরু করেন চারু মজুমদারের লেখা। সঙ্গী হিসাবে পান কৃষ্ণনগর কলেজেরই আর এক নকশালপন্থী ছাত্র দেবব্রত মুখার্জীকে। তবে এই নামগুলি প্রায় ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসাবেই দেখা যায়—ব্যাপকভাবে উনসত্তর ও তার পরবর্ত্তী পর্যায়ে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্ররা তৃতীয় কমিউনিস্ট শিবিরে নাম লেখায়নি।

অথচ সাতষট্টিতেও কৃষ্ণনগরের কলেজের কিছু সদ্য উত্তীর্ণ ছাত্ররা ব্যাপকভাবে শহরে নকশালবাড়ির স্বপক্ষে প্রচারে নেমেছিলেন। অসীম চক্রবর্ত্তী, দীপক বিশ্বাস, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য প্রমুখরা নকশালবাড়ি রাজনীতির সমর্থক ছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন। দীপক বিশ্বাস যিনি পরবর্ত্তীতে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কে.ইউ.এস.এফ-এর সম্পাদক হন, তিনি সমবোধসম্পন্ন কিছু যুবকের সঙ্গে সাতষট্টিতে 'সমুদ্র' নামে একটি পত্রিকা পুনঃপ্রকাশ করেন, —কাব্য বুলেটিন হিসাবে যা ঘোষিত-চরিত্র ছিল, এবং মূলতঃ নতুন ধারার রাজনৈতিক কবিতা প্রকাশই ছিল পত্রিকার বৈশিষ্ট্য। এই পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদনা বা লেখায় বা প্রকাশনায় যে যুবকরা জড়িত ছিলেন তাঁদের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল *'সর্বহারা সংস্কৃতির মহান বিজয়পতাকাকে উড্ডীন রাখতে কেন্দ্রীভূত হোক আমাদের প্রয়াস'।* এঁরা বেশীরভাগই ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজ প্রাক্তনী—যেমন দেবদাস আচার্য, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, স্বপন দত্ত (এঁরা ষাটের দশকের শুরুতে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র ছিলেন), বার্ণিক রায় (কৃষ্ণনগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক) প্রমুখ। যেসব লেখা বার করত *'সমুদ্র'*, সেগুলির শিরোনামই তাদের চরিত্রের দ্যোতক[৩০], যেমন ২৯.৮.৬৭ তারিখে রমাপ্রসন্ন বিশ্বাসের নৃশংস হত্যাকে উপলক্ষ করে 'সেলাম জানাই', 'আমরা কৃষকেরা ঃ আমাদের গান', 'চীন বিপ্লবের শিক্ষা ঃ ভারতীয় বিপ্লবের আদর্শ', 'গুয়েভারার মৃত্যু'—? 'যুক্তফ্রন্ট' ইত্যাদি। এছাড়া ভিয়েতনামে মার্কিনী বর্বরতার প্রতিবাদে

লেখা হয় কবিতা 'নেকড়ের ছায়া'।

কিন্তু তবু এই বিদ্রোহী কবিমহল থেকে কোন দ্রোণাচার্য ঘোষ কিংবা তিমিরবরণ সিংহ বেরিয়ে আসেননি। বোঝাই যাচ্ছে সাতষট্টিতে যে মেধাবী প্রত্যাশায় শুরু হয়েছিল কৃষ্ণনগর শহরের ছাত্র বিদ্রোহ, তা ধীরে ধীরে জমাট বাধল অদীক্ষিত মুখের ভিড়ে, যারা অধিকাংশই এল নাবালক বিদ্রোহী বোধের স্তর থেকে।

উনসত্তরের ২৩শে মে সি.পি.আই (এম-এল) ঘোষিত হওয়ার পরপরই কৃষ্ণনগরে নকশালপন্থীদের একটি দর্শনীয় মিছিল বের হয়। শহরের মাঝামাঝি মল্লিক মাঠ নামে একটি জায়গা থেকে পরিকল্পিতভাবে এই মিছিল শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে করতে বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে শেষ হয়। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ এই মিছিলের অভাবিত লোকসংখ্যা দেখে নিষ্ক্রিয় থাকে বলে জানা যায়। মিছিলে শ্লোগান ওঠে—জোতদার খতম চলছে চলবে (ডেবরা-গোপীবল্লভপুরে '৬৯-এর নভেম্বর মাসের মধ্যেই দশজন জোতদার খতম হয়ে গিয়েছিল—নদীয়াতে তারই সমর্থনে শ্লোগান ওঠে)। কৃষ্ণনগরে এটাই ছিল নকশালপন্থী যুবকদের প্রথম সশস্ত্র শক্তি প্রদর্শন। মূলতঃ ছাত্ররাই ছিল এই মিছিলের উপাদান।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে কৃষ্ণনগরে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী বলতে কিছু নেই। শুধু কৃষ্ণনগরে নয়, নদীয়াতেই শিল্প সেভাবে গড়ে ওঠেনি। কেবলমাত্র হোসিয়ারী শিল্প, বেকারী বা বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে এইসময় কিছু রাজনৈতিক প্রচার ও সাড়া ফেলা গিয়েছিল। ত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন এমনই একজন বিড়ি শ্রমিক যিনি দীর্ঘ সময় ধরে নকশালবাড়ি াজনীতির সপক্ষে কাজ করেন। কৃষ্ণনগরের একমাত্র কারখানা *'Taps and Dice'*-এ নকশালপন্থী রাজনীতির এতটুকু অনুপ্রবেশ ঘটানো যায়নি। সেখানে কোনো 'কনট্যাক্ট' তৈরী করা যায়নি বলে বিপ্লবী কর্মীরা ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু মূল কারণ অনুমান করা শক্ত বা অসংগত নয় যে শহরে বিপ্লবী কর্মীদের তখন গ্রামই একমাত্র গন্তব্য ছিল। কারণ সেই সময় *ঘটনাপ্রবাহ* পত্রিকায় চারু মজুমদাব লিখছেন যে ভারতবর্ষে বিপ্লবী পরিস্থিতি আছে মানলে এ কথাও মানতে হয় যে 'ভারতবর্ষে আজকের কাজ গোপন বিপ্লবী পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা, গণসংগঠন নয়।' তাছাড়া তিনি প্রশ্ন তুললেন যে সকলেই যদি গণসংগঠন গড়ার কাজে লেগে যায় তা হলে গোপন পার্টি সংগঠন গড়ার কাজ কে করবে? গণসংগঠন দিয়েই কি কৃষিবিপ্লবের সংগঠন হবে?

অতএব উনসত্তরের মে মাসের মধ্যেই নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে সবসময়ের পার্টি কর্মীরা ছড়িয়ে পড়ছেন গেরিলাযুদ্ধেব প্রস্তুতির তালিম দিতে। তখনই সব সময়ের পার্টি কর্মীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল পঁচিশে। এছাড়া নাদু চ্যাটার্জীর বিবৃতি মত আরও প্রায় হাজার পাঁচেক আংশিক সময়ের পার্টি কর্মী ও সমর্থক গ্রামে কাজ করেছিলেন।[৩১]

শান্তিপুরের অজয় ভট্টাচার্য ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা আগে থেকেই আশপাশের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম কন্দখোলা, আগপাড়া, চণ্ডী এলাকায় প্রচার ও সংগঠনের কাজ চালাচ্ছিলেন। পুলিশ রিপোর্টে পাওয়া যায়—" ...Some highly provocative posters also appeared

eulogising Santhal girls of Naxalbari and inviting the people to rise to a revolt against the established authority."[৩২]

শহর এলাকাতে তখন মোটামুটি যে সব কাজ হচ্ছিল সেগুলির বেশীরভাগই পোস্টার মারা, দেওয়াল লিখন বা বিশেষ কয়েকটি হিন্দী সিনেমার প্রদর্শনের বিরুদ্ধে পিকেটিং করা, মিছিল বার করা ইত্যাদি। উনসত্তর জুড়ে শহরকেন্দ্রিক কাজকর্মের কিছু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে দেওয়া হল সবগুলিই গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্ট থেকে পাওয়া।

(১) ২১.৪.৬৯ তারিখে চাকদহ ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর স্টেশন সুপারিনটেনডেন্টের অফিসে কালিচরণ সিংহ রায় ও অরুণ ব্যানার্জী সহ সাত জন 'নকশালপন্থী' শহরে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কৈফিয়ৎ চেয়ে অবস্থান করেন ও একটি স্মারকলিপি জমা দেন। এক সপ্তাহের মধ্যে অবস্থার উন্নতি না হলে তাঁরা ঘেরাও-এর হুমকি দেন।

(২) ১.৯.৬৯ তারিখে শান্তিপুর কলেজের জনৈক পি. ব্যানার্জীর নামে একটি ছাপানো বাংলা লিফলেট শান্তিপুর শহরে বিলি করা হয় 'নির্বাচন পথ নয়, সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হউন ও শ্রেণী সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলুন।'

(৩) ২.৯.৬৯ তাবিখে চাকদহ রেল স্টেশনের দেওয়ালে বাংলায় লেখা হয়—'আমরা গান্ধীবাদী নই। আঘাতের জবাব আঘাত/রাইফেলই শক্তির উৎস।'

(৪) ৯.৯.৬৯ তারিখে নবদ্বীপ শহরে সি.পি.আই (এম-এল)-র নামে ব্যাপক দেওয়াল লিখন হয়। —'শ্রীকাকুলামে তিনশ' গ্রাম জোতদার-জমিদারের শোষণমুক্ত। —শহীদ কমরেড কৃষ্ণমূর্তি লাল সেলাম। —জনতাই জনযুদ্ধের মূলভিত্তি, অস্ত্র আবশ্যকীয় শর্ত মাত্র—মাও সে তুঙ'।

(৫) ৫.১০.৬৯ তারিখে কৃষ্ণনগর শহরে ব্যাপক পোস্টার পড়ে, যেখানে বলা হয়— 'প্রত্যেকটি শ্রেণী সংগ্রামই রাজনৈতিক সংগ্রামের অংশ এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের লক্ষ্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল।'

(৬) ৬.১০.৬৯ তারিখে রাণাঘাট থানা এলাকার আড়ংঘাটা এলাকায় কিছু দেওয়াল লিখন দেখা যায়—'সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবই ভারতের মুক্তির পথ/দেশব্রতী পড়ুন ও পড়ান/নকশালবাড়ির লাল আগুনে শ্রীকাকুলাম জ্বলছে—নদীয়াও জ্বলবে/প্রমোদ-জ্যোতি-ইন্দিরা সব শেয়ালের এক রা।'

(৭) ১৯.১১.৬৯ তারিখে নবদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ কিছু এলাকায় কিছু পোস্টার পড়ে— 'বিশ্ববিপ্লবের চেয়ারম্যান মহান নেতা মাও যুগ যুগ জিও/জেল পলাতক কমরেডরা এখন বিপ্লবী জনতার নিরাপদ আশ্রয়ে আছে/হিংসার জবাব আমরা হিংসা দিয়েই দেবো।'

একটা জিনিষ লক্ষ্যণীয় যে উনসত্তরের মাঝামাঝি থেকেই 'গোপনসূত্রের সংবাদে' ছোটখাটো বোমা জাতীয় জিনিষ উদ্ধারের খবর স্থানীয় কাগজগুলিতে বার হচ্ছিল। নাদু চ্যাটার্জীর বিবৃতিতে ছিল অনুরূপ আভাষ—"Replying to another question he said

(N. Chatterjee) large number of arms and ammunitions lying in and around us–only few minutes required to accumulate them."[৩৩] যদিও তখনও অব্দি চারু মজুমদারের লেখায় কৃষি বিপ্লবে অস্ত্রের অপরিহার্যতার চেয়েও গণসহযোগিতার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছিল ("...এটা চে গুয়েভারার গেরিলাযুদ্ধ নয়, তার কারণ এই যুদ্ধ শুরু করা হয় অস্ত্রের ওপর নির্ভর করেই নয়, করা হয় বিনা অস্ত্রে জনতার সহযোগিতার উপর বিশ্বাস রেখেই। কাজেই এই লড়াই শুরু করা যায় একমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের রাজনীতি কৃষকের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করেই")।[৩৪]

ঊনসত্তরের শেষ থেকে অবশ্য অস্ত্রের প্রশ্ন ক্রমশঃই গুরুত্ব পেতে থাকে, বিশেষ করে যখন মাওবাদী পার্টির কাজ ক্রমশঃই গ্রামপ্রধান হতে থাকে, গেরিলা দল গঠন করাই প্রধান কর্তব্য সূচিত হতে থাকে, শ্লোগান উঠতে থাকে 'হিংসার জবাব আমরা হিংসা দিয়েই দেবো।' তখনও অস্ত্র প্রসঙ্গে চারু মজুমদারের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল—যে গেরিলা 'অ্যাকশন' স্কোয়াড তৈরী করার স্তরে 'কোনরকম আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নয়। গেরিলা ইউনিটকে সম্পূর্ণভাবে দা, বল্লম, সড়কি, কাস্তের ওপর আস্থা রাখতে হবে। দেশি বন্দুক কেনা বা তৈরী করার ওপর জোর দেওয়া অথবা শ্রেণীশত্রুর কাছ থেকে বন্দুক দখল করার ঝোঁক দেখা দিতে পারে। এই ঝোঁকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে ধৈর্য্যের সঙ্গে, এই কথা বুঝিয়ে বলতে হবে, আমরা এই পর্যায়ে যদি কিছু বন্দুকও পাই তা হলে তা রক্ষা করতে আমরা সক্ষম হব না। এগুলো প্রায় অবধারিতভাবে পুলিশের হাতে চলে যাবে'। আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয় গেরিলাযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য—"এই গেরিলা যুদ্ধ হবে চলনশীল, অর্থাৎ মোবাইল। লিন পি আও যেমন বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের কায়দায় লড়ো, আমরা আমাদের কায়দায় লড়ি। যখন জিততে পারি, তখন আমরা লড়ি, যখন জিততে পারি না, তখন আমরা সরে পড়ি। ...ভারতীয় পার্টির যে বাম ও দক্ষিণ উভয় বিচ্যুতিই হয়েছিল, তার কারণ ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি কখনও কৃষিবিপ্লবে কৃষকশ্রেণীর ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখেনি।"[৩৫] চারু মজুমদার আরও লিখলেন—'বুদ্ধিজীবী ক্যাডার এবং এই সমস্ত নেতারা, যাদের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরে বেড়াতে হয়, তাদের যদি হঠাৎ শত্রু ঘিরে ফেলে তাহলে তাদের ভয় দেখানো, ছত্রভঙ্গ করা অথবা মেরে ফেলার জন্যে, তারা সঙ্গে ছোট পিস্তল রাখতে পারেন। কিন্তু এর ওপর কখনও অযথা গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়, কারণ এটা জনগণের বদলে অস্ত্রের ওপর এক বিপজ্জনক আস্থা রাখতে উৎসাহ যোগাতে পারে।'[৩৬]

১৯৭১-এর মাঝামাঝি থেকে নকশালপন্থী যুবকেরা আর এই লেখার ওপরে আস্থা রাখেনি। খতম যখন থেকে একমাত্র রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসাবে নির্দিষ্ট হয়, তখন থেকে রাইফেল ছিনতাই-এর ঘটনাও বাড়ে।[৩৭]

ঊনসত্তরে রাণাঘাটে ধীরে ধীরে সি.পি.আই (এম-এল) গড়ে উঠতে থাকে মূলতঃ কুপার্স ক্যাম্পের কিছু ছেলে এবং রাণাঘাট কলেজের এস.এফ করা কিছু ছাত্রদের নিয়ে। এখানেও অনুঘটক হিসাবে কাজ করে ব্যক্তিগত প্রভাব। কৃষ্ণনগরের পলিটেকনিকের কিছু ছাত্রনেতার

প্রভাব, এছাড়া কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপ-এর জনৈক সূর্যদার প্রভাব—এঁদের সংস্পর্শে এসেই এবং খবরের কাগজের রিপোর্ট-এ সমস্ত কিছুই রাণাঘাটে নতুন ছেলেদের নকশালবাড়ি রাজনীতির দিকে টানে। বর্ধমান প্লেনামের পর পরই হরেকৃষ্ণ কোঙার রাণাঘাটে একটা মিটিং করেন। এর আগে সাতষট্টির পূজাসংখ্যা 'নন্দন'-এ হরেকৃষ্ণ কোঙার বলেন যে নকশালবাড়ি আন্দোলন সঠিক দিশা নিয়ে গড়ে উঠলেও তার নেতৃত্ব ছিল হঠকারি। এই উক্তির বিরোধিতা করে জিবি মিটিং-এ এই নতুন ছাত্রকর্মীদের তরফ থেকে হরেকৃষ্ণ কোঙার-এর প্রতি বেপরোয়া প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হয় যে, ভাল রাস্তায় ভাল গাড়ি পেয়েও ড্রাইভার মাতাল হলে কিভাবে গাড়ি সঠিক দিশায় চলে। সেদিন রাতেই তাদের বাড়িতে পুলিশ আসে।

উপরের বিবরণের প্রত্যক্ষদর্শী রাণাঘাটের 'বিপ্লবী' ছাত্রকর্মী প্রদীপ চ্যাটার্জীর ভাষ্য অনুযায়ী উনসত্তরের মে মাসে রাণাঘাট শহরে নকশালবাড়ির সমর্থনে একটা মিছিল বের হয়। সেই প্রথম প্রচেষ্টায় একশ বাইশ জন সমর্থককে জড়ো করা গিয়েছিল—বিশেষ করে রাণাঘাটের নিজস্ব রক্ষণশীল বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রাখলে—সেই শুরুর সময়ে এটা অনেক বড় প্রাপ্তি বলে সংগঠকরা মনে করেন। এই মিছিলও সশস্ত্র ছিল। শুরুর দিকে রাণাঘাট ও আড়ংঘাটা এলাকা নিয়ে একটাই বিপ্লবী আঞ্চলিক কমিটি ছিল যার নেতৃত্ব ছিল আড়ংঘাটার 'বিপ্লবী' ক্যাডারদের হাতে। প্রদীপ চ্যাটার্জীর মতে নদীয়ার 'লাল ফৌজ' অর্থাৎ 'গণমুক্তি বাহিনীর' মূল শক্তিস্তম্ভ ছিল আড়ংঘাটা-রাণাঘাট এবং শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর। উনসত্তরের পয়লা মে কলকাতার শহীদ মিনারে সি.পি.আই (এম) শক্তির সঙ্গে পেশীপ্রদর্শনে মূল অংশ নিয়েছিল নদীয়া, হুগলী এবং কিছুটা হাওড়ার 'বিপ্লবী' ক্যাডাররা। প্রদীপ চ্যাটার্জীর স্মৃতিভাষ্যে—'গ্রামের কাজ নিয়ে অসীম চ্যাটার্জী এই ছেলেদের কাছে এসে শেখালেন—'প্রথমেই খেয়াল করবি পাকা রাস্তা কোথায় শেষ হল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাকারাস্তা ছেড়ে মেঠো রাস্তায় নেমে পড়বি। চোখ দিয়ে দেখবি আর কান দিয়ে শুনবি। যেখানে রাস্তায় সাইকেলের চাকার দাগ আর পাওয়া যাবে না. আর কানে যেখানে রেডিও-র আওয়াজ পাবি না বুঝবি সেখানেই তোদের গন্তব্য। সেই গ্রামেই হবে তোদের সত্যিকারের কাজ। মনে রাখবি সাইকেল আর রেডিও ধরেই গ্রামে ঢোকে শহুরে লুম্পেনসি।'[৩৮]

'৬৯-এ চাকদহ শহরেও পার্টির সমর্থক ছেলেরা শহরের মধ্যেই বিভিন্ন 'বিপ্লবী' কাজকর্মে লিপ্ত হয়। যেমন পনেরোই আগস্টে জাতীয় পতাকা পোড়ানো, বিভিন্ন স্কুল ও প্রতিষ্ঠানে—যেমন চাকদহ মিউনিসিপ্যালিটিতে লাল পতাকা তোলা ইত্যাদি। চাকদহ রেলস্টেশনে লাল পতাকা তোলা হয়, রেলগেটের পাশে জে.এল.আর.ও অফিসে দলিল দস্তাবেজ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পয়লা মে কলকাতায় পার্টি ঘোষণার দিন চাকদহ থেকে প্রায় শ'তিনেক লোক যায়। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে নদীয়া জেলার সব 'বিপ্লবী কর্মী' একত্রিত হয়ে মিছিল করে শহীদ মিনারে যান। এঁদের সবার কাছে পার্টি ঘোষণা খুবই উদ্দীপনাময় মনে হয়েছিল। তবে চাকদহ থেকে বিপ্লবী ক্যাডারদের গ্রামে যাওয়ার কাজটা খুবই একটা সফল হয়নি। দু-একজন গ্রামে গিয়েছিলেন, যেমন অন্যতম ছাত্রনেতা অরুণ ব্যানার্জী (সন্টু) স্বীকার করেছেন

যে তিনি দুবার গ্রামে যান—একবার করিমপুরে, আর একবার কল্যাণীর প্রত্যন্ত এলাকায়। কিন্তু টিঁকে থাকার ব্যাপারটা হয়ে ওঠেনি।

এই প্রসঙ্গে চাকদহ-কল্যাণী এলাকার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখযোগ্য। নদীয়ার অনেক জায়গাতেই, যেমন শান্তিপুর বা কৃষ্ণনগরে নকশালবাড়ি পর্বে সি.পি.আই (এম)-এর সঙ্গে সি.পি.আই (এম-এল)-এর মুখোমুখি সংঘর্ষ প্রায় হয়ইনি। শান্তিপুরে সি.পি.আই (এম-এল) রাজনৈতিকভাবে এতখানি সুনিশ্চিত অবস্থানে ছিল যে সি.পি.আই (এম) নিধনে লিপ্ত হতে হয়নি। তাছাড়া বাহাত্তরের আগে অবধি শান্তিপুরের পার্টি নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছিলেন, তাঁরা অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সময় থেকে ছিলেন। ফলে গণসংগঠনের মধ্য দিয়ে উঠে আসা এই নেতৃত্ব এমন কোনো হঠকারি পদক্ষেপ নেয়নি, যাতে ব্যাপকভাবে ত্রাসের কারণ হয়ে উঠতে হয়। শান্তিপুরে বাহাত্তরের পরবর্ত্তী পর্যায়ে নকশালপন্থার নাম করে জোর করে চাঁদা আদায় করা বা হুমকি দেওয়ার পদ্ধতি যখন প্রধান কর্মসূচীতে দাঁড়ায় তখন পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসাবে গড়ে ওঠে 'এ্যান্টি নকশাল স্কোয়াড'। কৃষ্ণনগরেও সত্তরের এই পর্বে সি.পি.আই (এম) প্রায় অথর্ব একটি অস্তিত্বে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু চাকদহ-কল্যাণী এলাকা ছিল দুই কমিউনিস্ট শিবিরের যুযুধান রণক্ষেত্র।

চাকদহ এবং কল্যাণী—এই উভয় এলাকাই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একই আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে ছিল। এই এলাকায় সি.পি.আই (এম) কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরেই সংগঠন গড়ে তোলা এবং শক্তিশালী করার ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন। সাতষট্টি পরবর্ত্তী পর্যায়ে চাকদহ অঞ্চলে ছাত্র-যুবদের যে বিরাট অংশ নতুন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারা কেউই সি.পি.আই (এম)-র সদস্য ছিলেন না। আটষট্টি নাগাদ যখন মত ও পথ নিয়ে পার্টি কর্মী ও সমর্থকরা নিজ নিজ অবস্থান প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছেন তখন চাকদহ এলাকার সি.পি.আই (এম) পার্টি পরিচালনার যৌথ দায়িত্ব পড়ে নির্মল দাস, জগদীশ দেবনাথ, নভেন্দু পোদ্দার, কালীপদ বসু প্রভৃতি সদস্যদের উপর। উনসত্তর ও তার পরবর্ত্তী পর্যায়ে নকশালবাড়িপন্থী ছাত্র-যুবরা, যারা সি.পি.আই (এম-এল)-এ নাম লেখায়, তারা সংগঠনগত ভাবে এক জায়গায় দুর্বল ছিল, তারা গ্রামমুখী যাত্রায় উল্লেখযোগ্য ভাবে সামিল হয়নি। অপরদিকে এই পর্বে চাকদহ এলাকার সি.পি.আই (এম) অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে গ্রামাঞ্চলে উদ্বৃত্ত জমি দখলের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শহর ও গ্রাম এলাকায় বেনামী ও উদ্বৃত্ত জমি দখলের জন্য আইনী সংস্কারের ক্ষেত্রে মনোযোগী হয়েছিল।[৩৯] উনসত্তরের জুন মাসে চব্বিশ পরগণা জেলা ক্ষেতমজুর সম্মেলন উপলক্ষ্যে বারুইপুরে এক কৃষক সমাবেশে হরেকৃষ্ণ কোঙার বলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 'লুটেরা জমিদার ও জোতদারদের জমিজমা কেড়ে নিয়ে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করুন।' তিনি এও আশ্বাস দেন যে যুক্তফ্রন্ট সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় শক্তি ও সাহস যোগাবে—'যেমন ক্লান্ত সৈনিকের হাতে একঘটি জল ধরে দেওয়া হয়।'[৪০] এছাড়াও যুক্তফ্রন্ট সরকার রাজ্যের খাদ্যোৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আবাদযোগ্য পতিত জমিগুলি হুকুম দখল করার জন্য '৬৯-এ একটি

অর্ডিন্যান্স জারী করে এই মর্মে যে এক বছরের জন্য যে কোন আবাদযোগ্য পতিত জমি দখল করে রাজ্য সরকার চাষের জন্য চাষীদের ইজারা দেবেন যেখানে চাষী ফসলের শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ, জমির মালিক শতকরা পঁচিশ ভাগ, এবং সরকার শতকরা দশ ভাগ পাবেন। এ সবের পাশাপাশি যুক্তফ্রন্টের তরফে হরেকৃষ্ণ কোঙার এ সাবধানবাণীও উচ্চারণ করেন যে অন্যায়ভাবে জোর করে অপরের আইনসম্মত জমি কেউ দখল করতে গেলে সরকার তা কোন মতেই সমর্থন করতে পারেন না, কোনও বেআইনী কাজকে আইনের স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষমতাও সরকারের নেই।[৪১]

বস্তুতপক্ষে ভূমিহীন কৃষকের হয়ে জমি দখলের অত্যুৎসাহী লড়াই-এ সি.পি.আই (এম) এবং সি.পি.আই (এম-এল) উভয়েই নেমে পড়েছিল।

উনসত্তরেই নদীয়ার বাদকুল্লা থানার ভাদুরি গ্রামের কালাচাঁদ প্রামাণিক নামের জনৈক অধিবাসী ও আরও দুজন কলকাতায় পুলিশের আই.জি-র কাছে এই মর্মে চিঠি পাঠাচ্ছেন যে তাঁদের মাত্র পাঁচ-ছয় বিঘা জমি সি.পি.আই (এম-এল) কর্মীরা জোর করে কব্জা করছেন।

অনুরূপভাবে সত্তর এর গোড়ার দিকে রাণাঘাট মহকুমার চুর্ণী নদীর পূর্ব পাড়ে চর এলাকা ফাঁসিতলার ঘাট কিংবা চাকদহের পশ্চিম দিকে গঙ্গার চর গঙ্গাপ্রসাদপুর এলাকায় সি.পি.আই (এম)-এর ব্যানারে জমি দখলের আন্দোলন হয়। রাণাঘাট এলাকার প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে পাঁচ-দশ বিঘার বেশী কারুরই জমি ছিল না এবং এই চাষী পরিবারগুলি মূলতঃ পুরোপুরি জমির ফসলের ওপরই নির্ভর করে থাকত।

যাই হোক, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের ১৩ মাসের আমলে জ্যোতি বসুর হিসাবমত (২৪.৫.৭০ তারিখে কৃষ্ণনগরে এক জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে) প্রায় তিন লক্ষ একর জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়।

চাকদহ অঞ্চলে উনসত্তর পর্বে সি.পি.আই (এম)-এর ব্যানারে উত্তাল জমি দখলের লড়াই চলে। আনন্দবাজার পত্রিকায় উনসত্তরের নভেম্বর মাসের একটি খবরে দেখা যাচ্ছে চাকদহ থানার পারারি গ্রামে একটি কারিগরি সংস্থার প্রায় একশ' বিঘা জমি কয়েকশ' লোক মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের পতাকাসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ধ্বনি দিতে দিতে মিছিল করে গিয়ে দখল করে নেয়।[৪২] চাকদহের প্রাক্তন সি.পি.আই (এম) নেতা সৌরেন পালের বিবরণে চাকদহের পঞ্চায়েত এলাকার বিষ্টুপুর অঞ্চলের সহিসপুর মৌজার আড়াইশ' বিঘা জমি ও ফলের বাগান—যার মালিক ছিলেন পলতার বেঙ্গল এনামেল-এর জনৈক কর্ণেল ভট্টাচার্য—দখল করা হয় ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়। তাত্‌লা পঞ্চায়েত এলাকায় খড়ের মাঠে ঘোষাল পরিবারের দখলকরা খাস জমি উদ্ধার করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়।

এছাড়াও চাকদহ বনগাঁ লাইনে রাজারমাঠ মৌজায় রাজার গড় এলাকায় প্রায় দুশ' বিঘে জমি আশপাশের মূলতঃ তপশীল সম্প্রদায় ও জাতিভুক্ত দরিদ্রদের মধ্যে বিলি করা হয়। এই সূত্রে ওই এলাকার জোতদারদের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়, জোতদার মারা পড়ে ও দখলদারদের চার পাঁচ জন ও একজন মহিলাও মারা যায়। বর্তমান সি.পি.আই (এম)

মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস সে সময়ের একজন আন্দোলনকারী হিসাবে অনেকের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন।

এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে আটষট্টির মে মাসেই 'দেশব্রতী', চাকদহ থানায় কৃষকদের অবস্থা শিরোনামে এই চাকদহ-বনগাঁ এলাকার মধ্যবর্তী বিশাল অঞ্চলের গরীব গ্রামবাসীদের—বিশেষতঃ কৃষকদের শোচনীয় অবস্থার একটি রিপোর্ট দেয়। এই এলাকায় দীর্ঘদিনের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও অত্যাচারের স্বরূপ তুলে ধরা হয় এই রিপোর্টে। কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল ঃ "...কৃষি শ্রমিকেরা সারাদিন হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করে (সকাল ৭টা থেকে বেলা ১টা আবার বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত) পায় মাত্র ৩ টাকা। এক কিলো চালের দাম এখন এই অঞ্চলে ২ টাকা ৫০ পয়সা। গ্রামের একটি পরিবারে দিনে এককিলো চাল প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। ...কাজেরও কোন স্থিরতা নেই। সেচের কোন ব্যবস্থা না থাকায় তারা দৈনিক কোন কাজও পায় না। তাই মাঝেমাঝেই ওই একবেলার আধপেটাও জোটে না, স্রেফ উপোস। ...এর ওপরে রয়েছে বড়লোকদের নানাপ্রকার অত্যাচার। এখানকার আদিবাসীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। বিশ বছরের শোষণে আদিবাসীরা আজ সর্বস্বান্ত। এরা সকলেই আজ কৃষি শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। মদ খাইয়ে এবং নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে এদের জমি লিখিয়ে নিয়েছে বড়লোকেরা। ...এতো গেল কৃষি শ্রমিকদের কথা। খেতমজুরদের কথা। ...হালবলদ আছে অথচ জমি নেই এমন লোকেরা সাধারণত বড়লোকদের, জমিদার জোতদারদের জমি ভাগে চাষ করে। এদের অবস্থা নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো। ...যাদের সামান্য জমি তারা কঠোর শ্রম করেও তার সারা বছরের খোরাকী হয় না। ...তাই অত্যন্ত চড়াসুদে মহাজনদের কাছ থেকে তারা কর্জ করতে বাধ্য হয়। মহাজনী শোষণের ভয়াবহ স্বরূপ গ্রামে না এলে বোঝা যায় না। ৬ মাসের জন্য ১০০ টাকার সুদ ২০০ টাকা অর্থাৎ সুদে আসলে ৩০০ টাকা। অবশ্য সুদের টাকা নগদে পরিশোধ হয় না। মহাজন ১০০ টাকা দেবে, ৬ মাস পরে সেই টাকা ও ৪ মণ ধান দিতে হবে। এক মণ ধান ৫০-৬০ টাকা, অতএব ৪ মণ ধানের দাম ২০০ টাকা বা তার উপরে। এক একজন মহাজন এক বছরে ৪/৫ হাজার টাকা দাদন বা সুদে খাটায়। এই সুদ সহ ধার শোধ করতে গেলে খোরাকীর জন্য কিছুই থাকে না। কাজেই জমি বাঁধা দিতে হয়, আর লিখেও দিতে হয়। এই ভাবেই জমিদার-জোতদার ও ধনীদের সামন্ত শোষণের যাঁতাকলে চাষীরা পিষে যাচ্ছে।

...এই সব এলাকার গ্রামের মানুষদের সঙ্গে ভোট নিয়ে আলোচনা করলেই বোঝা যাবে ভোটের প্রতি তাদের কোন বিশ্বাস নেই। ভোট মারফৎ লঙ্কায় যেই যাক সে যে শোষণ ও অত্যাচারে আর এক রাবণ এটা তারা সবসময়েই বোঝে এবং বলেও। জোড়া বলদ, কাস্তে শীষ আর তারা হাতুড়ী-কাস্তে যে একই ব্যাপার সেটা তাদের জীবন দিয়ে বোঝা সত্য।" (পৃ. ৩, ১০)

এছাড়াও গঙ্গার চর এলাকাতে বিস্তীর্ণ জমি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। চর এলাকায় মাসের পর মাস ধরে কৃষকদের এই জমি দখলের আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপনের জন্য কল্যাণী শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা, বা শিমুরালী-মদনপুর এলাকার রাউতারি,

ঘেঁটুগাছি, হিংনাড়া, দরাপপুর, বিষ্ণুপুর, চুয়াডাঙা প্রভৃতি গ্রাম থেকে দলে দলে কৃষকরা দিনের পর দিন এসে চর এলাকার কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সৌরেন পালের মতে চাকদহের সি.পি.আই (এম) ব্যানারে কৃষক আন্দোলন যে ব্যাপকতা লাভ করেছিল তা পার্টির রাজ্য নেতৃত্বের কাছ থেকে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছিল। চাকদহ ডাউন প্লাটফর্মের ওপর মদন পাল নামে একজন কৃষক নেতার পানের দোকান ছিল। এই পানের দোকান আনঅফিসিয়াল পার্টি অফিসের কাজ করত। এই মদন পাল প্রায়ই গ্রামে গ্রামে কৃষক ফ্রন্টে কাজ করে বেড়াতেন। কল্যাণীর শ্রমিক বেল্টেও ইনি গেট মিটিং করতেন, সেখানে পার্টির কৃষক ফ্রন্টের কাজকর্মের কথা বলতেন।

এই কৃষক-শ্রমিক ঐক্য ও মৈত্রীর দৃষ্টান্ত কল্যাণীর শিল্পাঞ্চলে খুবই প্রকট ছিল। কল্যাণী শিল্পাঞ্চলে ১৯৫২ সালে প্রথম ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয় খাদি বোর্ড-এর অধীন হ্যাণ্ডমেড পেপার ফ্যাক্টরী, ১৯৫৮-তে সেন পণ্ডিত যা এখন সাইকেল কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড (সি.সি.আই.এল) নামে পরিচিত—স্থাপিত হয়, ১৯৬১-তে কল্যাণী স্পিনিং মিল এবং তার পরপরই ডেভিডসন কোম্পানী যা এখন এন্ড্রু ইউল নামে পরিচিত, স্থাপিত হয়। এছাড়াও ছিল কল্যাণী ব্রুয়ারিজ। কল্যাণীর এসব শিল্প এলাকায় জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনায় পথিকৃৎ সদৃশ ছিলেন চব্বিশ পরগণার শ্রমিক নেতা জগদীশ দাশ। চাঁদমারী ক্যাম্প ও পরবর্ত্তীকালে গয়েশপুর কলোনীর সুবোধ গাঙ্গুলীও আটান্ন সাল থেকেই সেন পণ্ডিত এর শ্রমিক নেতা হিসাবে কল্যাণী এলাকায় গোটা শিল্পাঞ্চলের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। একই সঙ্গে রাণাঘাটের সি.পি.আই (এম) নেতা সুভাষ বসুও (সি.পি.আই.এম-এর প্রাক্তন বিধায়ক ও নদীয়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য) একষট্টি সাল থেকেই কল্যাণীতে শ্রমিক সংগঠন করতে আসতেন। সুবোধ গাঙ্গুলী ও সুভাষ বসু দুজনেই কল্যাণীতে জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ও ষাট শেষার্ধে নকশালপন্থী ছাত্র আন্দোলন প্রতিরোধে খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

ষাটের দশকে কল্যাণীর কারখানাগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন বস্তুটি taboo বা নিষিদ্ধ বস্তু ছিল। কমিউনিস্ট শ্রমিক সংগঠন মানেই মালিক-পোষিত গুণ্ডাবাহিনী এবং সরকার পোষিত পুলিশবাহিনী উভয় তরফের আক্রমণকেই ঠেকাতে হত। ১৯৬০-'৬১-তে ডেভিডসন কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে শ্রমিক ধর্মঘট হয়, সেন পণ্ডিত এ্যাণ্ড এ্যানসিলিয়ারী-তেও এই সময় আন্দোলন চলছিল। পরবর্তীতেও যখন এইসব কারখানায় ধর্মঘট বা আন্দোলন চলে তখন চাকদহ অঞ্চলে কৃষকরা দল বেঁধে কল্যাণী আসেন, অবস্থানরত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ান। বাস্তবিকই কল্যাণীর শিল্পাঞ্চলে সি.পি.আই (এম) একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ রেখেছিল এবং শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্র গোটা ষাটের দশক জুড়ে যথেষ্ট জঙ্গী এবং প্রাণবন্ত ছিল। চাকদহের বহু সি.পি.আই (এম) ক্যাডার কল্যাণীর বিভিন্ন কারখানায় কর্মী থাকার সুবাদে[৪৩] এই অঞ্চলে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী একদিকে যথেষ্ট ঐক্যবদ্ধ একটা সংগ্রামীরূপ নিয়েছিল, যেটা জমি দখলের আন্দোলন ও শ্রমিক ধর্মঘট পালনের সঙ্গে সঙ্গে শহরাঞ্চলে অগ্রসরমান

নকশালপন্থী যুবকদের ঠেকানোর ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিল। এটা চাকদহ শহরাঞ্চল এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় উভয় ক্ষেত্রেই সত্যি।

এই চিত্রের পাশাপাশি আর একটা চিত্রও তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ফুটে উঠেছিল—সি.পি.আই (এম) ও নকশালপন্থীদের মধ্যে পেশীপ্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিক যেমন সি.পি.আই, বাংলা কংগ্রেস, এমনকি ফরোয়ার্ড ব্লকের সি.পি.আই (এম)-বিরোধী অবস্থান ও কার্যকলাপ। বিশেষ করে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট পতনের পর নদীয়ায় সি.পি.আই (এম)-এর কৃষকসভার ব্যানারে জমি দখলের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে—একদিকে নকশালপন্থাকে ঠেকাতে অন্যদিকে রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণ ঠেকাতে।

ঊনসত্তরের শেষ থেকেই নদীয়ার বিভিন্ন এলাকায় ডান ও বাম কমিউনিস্টদের মধ্যে অর্থাৎ সি.পি.আই ও সি.পি. আই (এম)-এর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। সেপ্টেম্বরের এক সপ্তাহেই অন্তত দশটি রাজনৈতিক সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায় যেগুলি হয়েছিল রাণাঘাট, আড়ংঘাটা, পাঁচবেড়িয়া, বগুলা, মদনপুর, কল্যাণী প্রভৃতি অঞ্চলে।[৪৪] ধুবুলিয়ার কাছে রুকুনপুরেও সি.পি.আই, সি.পি.আই.(এম) সংঘর্ষ হয়।[৪৫] প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাস নাগাদই পরিষ্কার হয়ে যায় যে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাচ্ছে। চূড়ান্ত অনৈক্য, অবিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি সেই সময় যুক্তফ্রন্টের শরিকদলগুলির সম্পর্ককে চিহ্নিত করেছিল। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারও অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে 'ক্রমবর্ধমান উগ্রপন্থা'কে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে সি.পি.আই (এম)-এর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে লাগল।

একাত্ম হওয়ার প্রথম পাঠ—গ্রামের পথে

"...সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার আগে অবশ্য প্রতিটি এলাকায় নকশালপন্থীরা নিঃস্ব ও প্রায় নিঃস্ব কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচার চালাতে চান। বোঝাতে চান ঃ লড়াই শুধু জমিদখলের নয়, লড়াই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলেরও। নবগঠিত দলের নেতারা মনে করেন (মাও সে তুঙ-এর শিক্ষা অনুসারেই) রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত না করে কোথাও সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করা ভুল। এরা চে গুয়েভারার 'hit and run' কৌশলে আস্থাবান নন।" ১৯৬৯-এর মে মাসে সি.পি.আই (এম-এল) ঘোষিত হওয়ার পর নতুন পার্টির রাজনৈতিক প্রচারের ওপর *আনন্দবাজার পত্রিকার* মন্তব্য থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল (পৃষ্ঠা-৫, ৯ মে, ১৯৬৯)।

নদীয়া জেলার গ্রামাঞ্চলের যে যে এলাকায় নকশালবাড়ির আদলে মাওবাদী ঘাঁটি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় সেগুলি ছিল নাকাশীপাড়া থানার ধর্মদা, মুড়াগাছা, মাঝের গ্রাম, দোগাছি, বীরপুর ১ নম্বর ব্লক, ধনঞ্জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবপুর—চাঁদেরঘাট, কৃষ্ণনগর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের ধুবুলিয়ার পূর্বদিকে ন'পাড়া ১ ও ২ ব্লক, বেলপুকুর অঞ্চল, সাধনপাড়া, তেহট্ট থানার পলাশীপাড়া, বেতাই, হাঁসপুকুর অঞ্চল, রাণাঘাট থানার আড়ংঘাটা এলাকা এবং গোটা শান্তিপুর শহর। নাকাশীপাড়া থানার ধনঞ্জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত

শিবপুর—চাঁদেরঘাট এলাকায় কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র সমীর বিশ্বাস কাজ করতে যান। এই এলাকায় তাঁর বাবার মামাবাড়ি থাকায় ও নিজের জন্মস্থান হওয়ায় পূর্ব-পরিচিতি ছিল। কলেজে পড়াকালীনই চারু মজুমদারের লেখা তিনি পড়তেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে 'যত বড় বিপ্লবী সম্ভাবনাই থাকুক না কেন, যদি দরিদ্র ভূমিহীন কৃষককে নেতৃত্বে উন্নীত করা না যায়, তবে কৃষিবিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য। এ শিক্ষা বহু রক্তের বিনিময়ে শিক্ষা। এ শিক্ষা থেকে বিচ্যুতি ঘটলে আরও রক্ত দিতে হবে।' তাঁর অভিজ্ঞতা হল এই যে খুব সাধারণভাবে গ্রামের কোন কৃষককে স্থানীয় জোতদার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে দায়সারা উত্তর দেয়—লোক তো ভালই। পরবর্তীতে সেই কৃষকের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার পর দেখা যায় যে সে ওই জোতদারদের প্রতি তীব্র শ্রেণীঘৃণা পোষণ করে।

*'বিপ্লবী যুব-ছাত্রদের প্রতি কয়েকটি কথা'*য় চারু মজুমদার ছাত্র যুবদের যা যা করার নির্দেশ দেন *(৫ই মার্চ, ১৯৭০)* উনসত্তর-এর শেষাশেষি থেকেই নদীয়ার বহু যুব ছাত্ররা তা পালন করতে শুরু করেছেন। চারু মজুমদার লিখলেন 'এবার ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে দাও, বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়'—এই বিপ্লবী যুব-ছাত্ররাও গ্রামে যাওয়ার তাগিদে প্রথাগত পড়াশুনো ছেড়ে দেন। সমীর বিশ্বাসও কৃষ্ণনগর কলেজে প্রি-ইউনির্ভাসিটি পড়তে পড়তেই গ্রামে যেতে শুরু করেন। শেষমেষ পরীক্ষাও দেওয়া হয়নি। উনসত্তর থেকেই একদম দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের কাছে একাই যাওয়া, খাওয়া, থাকা শুরু করেন। এই একাত্মতার মুহূর্তগুলিতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হল কৃষকদের খুব আবেগপূর্ণ ভাষায় বোঝালে তারা ক্রোধে মাথার চুলও ছেঁড়ে।

সত্তর-একাত্তরে এই শিবপুর-চাঁদেরঘাট এলাকা মাওবাদীদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি এলাকা বলে চিহ্নিত হয়। এই শিবপুর গ্রামের মূল বাসিন্দাদের মধ্যে মাহিষ্য, ঘোষ, মুচি ও বাগদী গোত্রীয় লোকরাই ছিল প্রধান। গ্রামের সম্পন্ন অধিবাসী বলতে যাদের হাতে কিছু জমি ছিল—তারা ছিল মাহিষ্য সম্প্রদায়ের। ভূমিহীন ক্ষেতমজুর শ্রেণী এসেছিল, বলাই বাহুল্য—মুচি ও বাগদী শ্রেণী থেকে। এই শ্রেণী দরিদ্র ছিল ও সম্পন্ন চাষীদের ঘরে জন মজুরের কাজ করে খেত।

ভৌগোলিক দিক থেকেও এই এলাকা নকশালপন্থীদের কাজকর্ম ও চলাফেরা আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগী ছিল। নাকাশীপাড়া থানা এলাকার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও থানার সঙ্গে শিবপুর এলাকার সহজ যোগাযোগের দ্রুত কোন রাস্তাই ছিল না। জলঙ্গী নদী চাপরা আর নাকাশীপাড়া অঞ্চলকে দুভাগে চিরে প্রবাহিত হয়েছে। কাজেই শিবপুর থেকে নাকাশীপাড়া যোগাযোগের রাস্তা ছিল হয় চাপরা দিয়ে, নয় কৃষ্ণনগর হয়ে। ফলে জলঙ্গীর ধারে শিবপুর প্রায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত অস্তিত্ব নিয়ে নকশালবাড়ি ধাঁচের কৃষক বিপ্লবের আদর্শ গর্ভগৃহ ছিল। প্রয়োজন পড়লে চিহ্নিত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করাও পুলিশের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। সমীর বিশ্বাস ছাড়াও অন্য যারা এই এলাকায় মাওবাদী রাজনীতির কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম ছিল গণপতি মণ্ডল, শৌমিক বিশ্বাস (২৪), শিশির

মণ্ডল (২৭), করুণাময় বিশ্বাস, প্রশান্ত মণ্ডল, পঞ্চানন সরকার প্রমুখ।

শিবপুর এলাকায় যে নিম্নবর্গীয় ক্ষেতমজুরদের নিয়ে বিপ্লবের পক্ষে উৎকৃষ্ট উপাদান পাওয়া গিয়েছিল, তা জানা যায় কিছু অভাবনীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে। সরস্বতী পুজোয় গ্রামের স্কুলের সাধারণ ছেলেরা একবার মুর্তিপুজোয় বিরোধিতা করে। সম্পন্ন কৃষক পরিবারের কয়েকটি ছেলে জোর করে পুজোর ব্যবস্থা করলে রাত্রিবেলা কিছু ছেলে মুর্ত্তির মাথা কেটে পুকুরের জলে ফেলে দেয়। পরদিন সেই মুর্তি নিয়ে গ্রামে তোলপাড়। ছেলেরা ভাঙা মুর্তি নিয়ে মিছিল বার করে এবং শ্লোগান তোলে 'মুর্তিপূজা চলবে না।' এই স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনার কোন পাল্টা প্রতিক্রিয়া হয়নি। শিবপুর এলাকার গ্রামের স্কুলের ছেলেরাও দেশব্রতী কিংবা রেড বুক বা 'চেয়ারম্যানের তিনটি লেখা' পড়ত। ছুটির দিনেও বাড়িতে ছেলেরা মাওবাদী রাজনীতি নিয়ে পড়ার ক্লাস খুলত। শহরের ছেলেরা ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে ক্ষেত নিড়ানো, পাট ছাড়ানো এসব কাজই করেছেন। এই খেটে খাওয়ার এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীনদের সঙ্গে 'একাত্ম হওয়ার' কাজটা নদীয়ার বহু এলাকার ছাত্র-যুবকরাই করেছেন। কৃষ্ণনগরের ছাত্র মহিম চন্দ, তাপস চক্রবর্তী, তপন সান্যাল চাপরা, করিমপুর, শিবপুর ও আড়ংঘাটা এলাকায় কাজ করতে এসেছিলেন, তবে আগেই বলা হয়েছে মাটি কামড়ে পড়ে থাকার লড়াই-এ গ্রামের 'বাড়ী-ফিরে-আসা' শিক্ষিত যুবকদের থেকে শহরের শিক্ষিত যুবকরা অনেক পিছিয়ে ছিলেন।

নদীয়ার আর এক উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি অঞ্চল তৈরী হয়েছিল ভেবোডাঙ্গা-দাদুপুর-মুড়াগাছা-ধর্মদা ও পূর্বস্থলী ঘিরে। এখানেও গঙ্গা একটা উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিক পরিমণ্ডল তৈরী করে দিয়েছিল—যেখানে গঙ্গার বুকে জেগে ওঠা চরগুলিতে ইচ্ছামত শেলটার নেওয়া যেত। ধর্মদা-মুড়াগাছা এলাকা চিরকালই কংগ্রেসী এলাকা হিসাবে পরিচিত ছিল। জনকয়েক সি.পি.আই (এম) কর্মী এই এলাকায় কাজ করতেন ঠিকই (যেমন বর্হিগাছির মোহন মুখার্জী, যাঁর ধর্মদায় শ্বশুরবাড়ি থাকার সূত্রে যাতায়াত ছিল, কিংবা মুড়াগাছার পাঁচুগোপাল ব্যানার্জী) কিন্তু উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেনি।

মুড়াগাছা-সড়ক-সাধনপাড়া এলাকা ও ধর্মদা-দাদুপুর-কাশিয়াডাঙা-ভেবোডাঙা এলাকা প্রথমদিকে প্রায় ছাড়াছাড়া ও বিচ্ছিন্নভাবে কৃষক আন্দোলন ও নকশালবাড়ি রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিল। মধ্য ষাটে মুড়াগাছা সি.পি.আই (এম)-র অন্যতম সাংগঠনিক নেতা হিসাবে যে তরুণ প্রজন্মের আত্মপ্রকাশ ঘটছিল তাদের মধ্যে দিলীপ চুনারি, অরুণ মিত্র, রেণুপদ দাস উল্লেখযোগ্য (রেণুপদ দাস '৬৭ সালে পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হন)। এছাড়া অরুণ মুখার্জী নামে আর এক যুবক, যিনি মুড়াগাছারই ছেলে, ছেষট্টি সালে কৃষ্ণনগর বিপ্রদাস পালচৌধুরী পলিটেকনিক থেকে পাশ করে সক্রিয় রাজনীতিতে লিপ্ত হন। নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত অরুণ মুখার্জী সি.পি.আই (এম)-এর একজন পর্যবেক্ষক সদস্য ও একজন সম্ভাবনাময় কর্মী ছিলেন। অরুণ মুখার্জী কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটিতে শ্রমিক নেতা হিসাবেও পরিচিত ছিলেন।

নতুন কমিউনিস্ট পার্টি শুরু হওয়ার পর ইনি মুড়াগাছা অঞ্চলে ব্যাপক প্রচারে নামেন। উনসত্তরে মুড়াগাছার সি.পি.আই (এম)-র সাতজন পার্টি সদস্যদের মধ্যে চারজন বৃন্দাবন বিশ্বাস, দুখু চুনারি, অরুণ মুখার্জী ও নারায়ণ বিশ্বাস সদস্যপদ ত্যাগ করেন। শুরু থেকেই অর্থাৎ নক্সসস পর্ব থেকেই মুড়াগাছার 'বিপ্লবী' ধারার যুবকদের কাজকর্মের সঙ্গে জেলান্তরের নেতৃত্বের যোগাযোগের কাজটি করিয়ে দিতেন অরুণ মুখার্জী। মুড়াগাছার সঙ্গে সঙ্গে ধুবুলিয়ার গ্রামাঞ্চলেও এই যুবকরা নকশালবাড়ির সপক্ষে প্রচার চালান। ধুবুলিয়ার স্থানীয় শঙ্কর বাগচী, নিত্য কুণ্ডু, গৌরাঙ্গ শিকদার—এইসব যুবকরাও নতুন ধারার রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন।

উনসত্তরের পয়লা মে শহীদ মিনারের মিটিং এ মুড়াগাছা থেকেই প্রায় শ'খানেক লোক যায়। পার্টি ঘোষণা এঁদের কাছে আকস্মিক অথচ স্বাগত ছিল, কারণ সেই সময় তাঁরা মনে করছিলেন বিপ্লবী পার্টি ছাড়া বিপ্লব হয় না।

মুড়াগাছা অঞ্চলে এরপর নকশালবাড়ি ও সি.পি.আই (এম-এল)-এর সমর্থনে জোর প্রচার শুরু হয়। মূলতঃ সি.পি.আই (এম)-এর সংশোধনবাদী চরিত্রকে চেনানোর কাজটাই বেশী জোর দিয়ে প্রচার করা হত শ্লোগান-এর মাধ্যমে 'নকশালবাড়ি খড়িবাড়ি—যুক্তফ্রন্টের যমের বাড়ি' ইত্যাদি। গ্রামগুলিতে গোপন বৈঠক হত, কৃষকরা অংশগ্রহণও করত (যদিও মুড়াগাছা, সাধনপাড়া, বহির্গাছি, কাঁদোয়া—এইসব পল্লী মূলতঃ ছিল কাঁসাশিল্পের ওপর নির্ভরশীল, কৃষিজীবীও ছিল)। এদের চেনানো হত যে নকশালবাড়ি ছিল মূলতঃ একটি প্রতীক—ভারতীয় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মেরুদণ্ড। তবে এই বিপ্লবী কর্মীরা এখন স্বীকার করেন যে বিপ্লবের চেতনা বা চিন্তা এই গ্রামীণ খেটে খাওয়া মানুষদের ততটা প্রভাবিত করেনি, যতটা করেছিল—'ভাল ছেলেদের দ্বারা তাদের লাভ বৈ ক্ষতি হবে না'—এই ভরসা। মুড়াগাছা এলাকায় ভূমিহীন কৃষকের অংশগ্রহণের চেয়ে বেশী সংখ্যায় এসেছিল ছাত্র-যুবশক্তি।

অপরদিকে ভেবোডাঙ্গা এলাকায় কৃষকদের অংশগ্রহণ অনেক বেশী ছিল। সুবোধ মজুমদার (মামু) এই এলাকায় একজন উল্লেখযোগ্য কর্মী ছিলেন। কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চল থেকে সুশীতল রায়চৌধুরীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে নকশালপন্থী রাজনীতি করতেন সুবোধ মজুমদার। উনসত্তরে ওই এলাকার ষাট জন যুবকের সঙ্গে ইনিও সি.পি.আই (এম) ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং পার্টি ঘোষণার আগেই গ্রামে যাওয়ার তাগিদে ভেবোডাঙ্গায় মামার বাড়ি এসে স্থিতু হন। এখানে এসে মামার জমিতে কাজ করার সূত্রে কৃষকদের সঙ্গে পরিচিত হন, মুনিষ বা ক্ষেতমজুরদের ডেকে এনে জমিতে লাগাতেন মূলতঃ কৃষি বিপ্লবের তত্ত্ব বোঝানোর জন্য। রাত্রে সেই সব চাষীদের গ্রামে গিয়ে রাজনীতির কথা বলতেন। শুধু কৃষি বিপ্লবের তত্ত্ব প্রচারই নয় গ্রামে ভাল জায়গা তৈরী করে নেওয়ার জন্য গ্রামের প্রতিটি কাজে—খেলাধুলো, দুর্গাপুজো, যাত্রা-কীর্ত্তন সব কাজেই নিজেকে জড়ান। অবসর সময়ে প্রাইভেট টিউশনি করে গ্রামের ছাত্র-যুবদেরও কাছে টানার চেষ্টা করেন (তাঁর নিজের ভাষ্যে—'সব ঝুড়িতেই ডিম রাখছি তখন')।

এইভাবে সুবোধ মজুমদার ভেবোডাঙ্গাকে 'বেস' করে আশপাশের গ্রামগুলিতে—যেমন

কর্করিয়া, কিনু পোঁতা, তেঁতুলবেড়িয়া, কাঁদোয়া, উডুমডাঙ্গা (আদিবাসী সর্দার, বুনোদের গ্রাম), রুকুনপুর, কিংবা গঙ্গার অপর তীরে কমলনগর (যেখানে সবচেয়ে বড়ো সংগঠন গড়ে ওঠে), চরকমলনগর, চণ্ডীগড়, মেড়তলা, তামাঘাটা, মাজদিয়া—বর্ধমান জেলার এই সমস্ত গ্রামগুলিতেও কৃষক সংগঠন ও সহজ যাতায়াত গড়ে তোলেন। সঙ্গে যাঁরা কর্মী হিসাবে উঠে আসছিলেন তাঁদের মধ্যে দাদুপুর-এর নিত্য সেন, ধর্ম ঘোষ, ধর্মদা বাজারের কাছে কাঁদোয়া গ্রামের তপন দালাল, ভেবোডাঙ্গায় অনাথবন্ধু ঘোষ, নির্মল মণ্ডল, প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। উনসত্তর জুড়ে এই এলাকায় কৃষকদের মধ্যে রাজনীতি প্রচারের এই কাজে সুবোধ মজুমদার জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ তৈরী করে উঠতে পারেননি—পুরোটাই প্রায় কলকাতার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ মেনেই চলছিল। কলকাতা থেকে পার্টির বইপত্র আনানো, যোগাযোগ রাখা, কলকাতার কমরেডদের নিয়ে এসে কৃষক ও গ্রামের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া, কাউকে দু-একদিন এলাকায় রেখে ঘোরানো—এসব কাজই হচ্ছিল নদীয়া জেলা সংগঠন কমিটির অজ্ঞাতসারেই। মূল যোগাযোগ ছিল বেলেঘাটা অঞ্চলের সঙ্গে।

ইতিমধ্যে এই এলাকাতেই পূর্বোল্লিখিত সাধনপাড়া, সড়ক, বহির্গাছি, মুড়াগাছায় নদীয়া কমিটির সদস্য অরুণ মুখার্জী কৃষকদের মধ্যে 'বেস' গড়ার কাজ করছেন। দুপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হল সত্তরের শুরুতে একটি 'শ্রেণীশত্রু' হত্যার ঘটনার সূত্র ধরে। সাধনপাড়ার দিলীপ চুনারি ও কৃষ্ণনগরের দুখীরাম রায় ও অরুণ মুখার্জী—যাঁরা ওই অঞ্চলে বিপ্লবী রাজনীতি প্রচারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন—তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। ফলে নদীয়া জেলা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল সুবোধ মজুমদারের—ক্রমশঃ বাইরের বহু কমরেডরা এলাকায় আসতে শুরু করলেন, কাজের পরিধি বিস্তৃততর হল।

রাণাঘাট থানার অন্তর্ভুক্ত *আড়ংঘাটা* এলাকায় ছিল নদীয়া জেলার অন্যতম ঘাঁটি এলাকা। আড়ংঘাটা ও তার আশপাশের কয়েকটি গ্রাম যেমন চূর্ণী নদী পেরিয়ে উত্তরে আনন্দনগর, পূর্বদিকে গেদে-বানপুর রেললাইন পেরিয়ে সবদলপুর, বস্তা, হোসেনপুর, কানাইপুর, বিড়া—এইসব গ্রামগুলিতে ব্যাপকভাবে নকশালপন্থীদের প্রভাব ছড়ায় (যুগলকিশোর অঞ্চল, আড়ংঘাটা অঞ্চল, আড়খিসমা অঞ্চল, বহিরগাছির দলুয়াবাড়ি অঞ্চল, আর কমলপুর অঞ্চল)।

আড়ংঘাটা গ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে চারজনকে নিয়ে বাহান্ন সাল নাগাদ, যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন আনন্দনগর গ্রামের সুধীর শিকদার। এরপর পরই '৫৪, '৫৫ সাল নাগাদ এখানে কৃষক সমিতি গড়ে ওঠে, আঞ্চলিক কৃষকসভার সম্পাদক হন মহেন্দ্র সরকার। এছাড়া ছিলেন প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক প্রমথ ভৌমিক ও ফটিক সবকার। প্রথমদিকে কৃষক সভার কাজ ছিল গ্রামে গ্রামে গিয়ে মিটিং করা, কমিউনিস্ট পার্টি কি ও কেন, কৃষকদের কিছু ঋণের ব্যবস্থা করে দেওয়া ইত্যাদি। ষাটের দশকেও এইসব অঞ্চলে কৃষকসভার মূল দাবি ছিল পাটের ন্যায্যমূল্য দিতে হবে। নির্বাচনী প্রচারেরও ওটাই শ্লোগান ছিল। কৃষকসভার মুখ্য আন্দোলন এই অঞ্চলে ছিল পাটচাষ কেন্দ্রিক। জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বা মান উন্নয়নের কোনো চেষ্টাই সে সময়ের কমিউনিস্ট পার্টি করেনি বলেই আড়ংঘাটার অন্যতম

নকশালপন্থী নেতা কুমুদ সরকার মনে করেন।

কুমুদ সরকার, প্রধানত যাঁর নেতৃত্বে এই এলাকায় যাবতীয় খতম অভিযান বা অস্ত্র ছিনতাই এর ঘটনাগুলি ঘটে, ছাত্রজীবন কাটান কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে। বাষট্টির ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট মহলে যে তীব্র বিতর্ক ওঠে তার ঢেউ আর্ট কলেজের এই 'তখনও অরাজনৈতিক' ছাত্রটিকে স্পর্শ করে। মার্কসীয় রাজনীতি নিয়ে বিন্দুমাত্র পড়াশুনো না থাকলেও, কলকাতার কলেজগুলিতে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছেন, প্রচারকার্যে অংশ নিয়েছেন। গ্রামে বাবা ফটিক সরকার যুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য থাকায় আগে থেকেই কৃষক সমিতির কাজের সঙ্গে 'কিছু না বুঝেই' যুক্ত হন। এছাড়া আড়ংঘাটায় বামপন্থী সাংস্কৃতিক চর্চার যে একটা ঐতিহ্য ছিল, ছোটবেলা থেকেই তার সংস্পর্শে আসেন (বহিরগাছির বিভা ঘোষ গোস্বামী ও তাঁর স্বামী সন্তোষ ঘোষ আই.পি.টি.এ করতেন, 'ক্ষুধা', 'আজ্‌কাল', 'নবান্ন'—প্রভৃতি নাটক অভিনীত হত)। ফলে চৌষট্টি সালে, দ্বিতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তৈরী হওয়ার পরপরই কুমুদ সরকার আর্ট কলেজ ছেড়ে দেন। এই সময় ডি.আই. এ্যাক্ট-এ ধরা পড়ে দমদম জেলের চব্বিশ নম্বর সেলে কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে উনত্রিশ দিন কাটাতে হয়। এই সময়ই রাজনৈতিক পড়াশুনোর শুরু।

নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান হওয়ার পর কলকাতায় কয়েকটি শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করেন শিল্পীবন্ধু তাপস বসু, যার মুল ভাবধারা ছিল নকশালবাড়ি। তখনও অবধি সি.পি.আই (এম)-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার ব্যাপারে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল কুমুদ সরকারের। শহীদ মিনারের মিটিং-এ সি.পি.আই (এম-এল) ঘোষণার দিন ইনি কলকাতা যাননি। *সুতরাং নকশালবাড়ির সমর্থনে যে তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি জন্মাল, তার উদ্দেশ্য ও চরিত্র নিয়ে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল যে ব্যক্তির, তিনিই অচিরে হয়ে দাঁড়ালেন আড়ংঘাটা অঞ্চলের নকশালপন্থীদের মধ্যে অন্যতম* 'Ferocious Person'।[৪৬] এই বিশেষণটি আরও যাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের নাম আলোচিত হয়েছে এর পরেই।

'৬৯-এর পার্টি ঘোষণার পর আড়ংঘাটার প্রথম আঞ্চলিক কমিটি তৈরী হল সাত জন সদস্য নিয়ে যার প্রথম সেক্রেটারী হলেন আড়ংঘাটার মহানন্দ রায়, সঙ্গে ছিলেন আনন্দনগরের ভবদেব হালদার, বিড়া গ্রামের গুরুদাস পাঁড়ে, আড়ংঘাটার কুমুদ সরকার, তাঁর দাদা ধীরেন সরকার ও আরও দুই জন। এঁদের মধ্যে একমাত্র ভবদেব হালদার ছিলেন পুরোনো দিনের কমিউনিস্ট কর্মী। এই সময় বা পরবর্ত্তীতে যাঁরা সি.পি.আই (এম-এল)-এ যোগ দেন বা কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েন—তাঁরা সবাই কলেজ ছাত্র হিসাবে আসেন। রাণাঘাট এলাকাও আড়ংঘাটা কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিল। রাণাঘাটের শ্যামা, কুপার্স ক্যাম্পের প্রবীর বা মহাদেব, কলেজ ছাত্র প্রদীপ চ্যাটার্জী—এঁরা শহরকেন্দ্রিক কাজকর্মেই বেশী মনোযোগী ছিলেন। আড়ংঘাটা এলাকার বিড়া ও কানাইপুর গ্রাম দুটি ছিল মুসলমান অধ্যুষিত। এই এলাকার মুসলমান রমনীরা নকশালপন্থী কর্মীদের আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য দায়িত্ব পালন করেছেন। কানাইপুর গ্রামের বাসিন্দা তাহের (৪০) বা মুসলিম (১৭)—এরা বহু

নকশালপন্থী কর্মীদের আশ্রয় দিয়েছিল। কৃষ্ণনগরের শিপ্রা সরকার নামে জনৈক নকশালপন্থী কর্মী দীর্ঘদিন এই গ্রামের মুসলমান পরিবারের নিরাপদ আশ্রয়ে ছিলেন। উপরোক্ত তাহের যে 'রেড বুক' পড়ত এর উল্লেখ শিপ্রা সরকারের জবানবন্দীতে পাওয়া যায়। সত্তর-একাত্তরে আড়ংঘাটা এলাকার যে সব কর্মীরা সি.পি.আই (এম-এল)-এর ব্যানারে বিভিন্ন এ্যাকশনে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে গ্রামের কিশোর ও যুবকরাই ছিলেন সংখ্যাগুরু। যেসব নাম পাওয়া গিয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল চাষী পরিবারের, যেমন—

গৌর খান—আনন্দনগর, বয়স ৩৫-৩৬, কৃষক,

রণজিৎ সরকার—আনন্দনগর, বয়স-২২, কৃষক, (ইনি রাণাঘাট পূর্ব কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক নিতাইপদ সরকারের ভাগ্নে)

দীনু বিশ্বাস—আনন্দনগর, বয়স-২৯, কৃষক,

জীতেন ওরফে যতীন বিশ্বাস —আনন্দনগর, বয়স-৪০, কৃষক,

চিত্ত বিশ্বাস ওরফে মাস্টার—আড়খিসমা, বয়স-২৩, কৃষক,

ষষ্ঠী ঘোষ—আনন্দনগর, বয়স-২০, কৃষক,

ননী সেন—আড়ংঘাটা, বয়স-১৯,

সন্টু—আড়ংঘাটা, বয়স-২৩, প্রাক্তন এন.ডি.এফ কর্মী,

গুরুপদ বিশ্বাস—বিড়া, বয়স-৩৫,

সুষেন বিশ্বাস—সবদলপুর, বয়স-২০,

দ্বিজেন রায়—সবদলপুর, বয়স-২৩,

রতন বিশ্বাস—সবদলপুর, বয়স-১৯,

গুরুপদ খান—সবদলপুর, বয়স-২১,

আদম মণ্ডল—বস্‌তা, বয়স-২০,

সুনীল বিশ্বাস—হোসেনপুর, বয়স-২৩,

আশরফ—কানাইপুর, বয়স-২৬,

দ্বিজদাস রায়—সবদলপুর—প্রমুখ।

ওপরের তালিকাটিতে যেসব নাম পাওয়া গেছে, তাদের বয়স ও জীবিকা লক্ষ্যণীয়। এই সদ্য যুবক কৃষক পরিবারের ছেলেরা, বিশেষতঃ সত্তর-একাত্তরে, এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ত্রাসের সৃষ্টি করে। আড়ংঘাটা থেকে এরোলিআসমানি ও গাংনাপুর জুড়ে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মাওবাদী কর্মীদের বিরাট ঘাঁটি তৈরী হয় (এরোলি উত্তর-চব্বিশ পরগণায় পড়ে, আসমানি পড়ে নদীয়ায়)। একাত্তর সালের মধ্যে নদীয়ার সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বন্দুক ছিনতাই হয় এই এলাকা থেকে। নদীয়া জেলার প্রথম শ্রেণীশত্রু 'খতম' হয় এই এলাকায়। এছাড়া নদীয়া জেলার মধ্যে একমাত্র আড়ংঘাটা এলাকাই স্থানীয় থানার পুলিশবাহিনীকে 'নিষ্ক্রিয় প্রশ্রয়দাতা'র ভূমিকায় লালন করেছিল বলে অভিযোগ ওঠে।[৪৭] রাইফেল ছিনতাই, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় ও 'শ্রেণীশত্রু' খতম ছাড়া অন্য কোন কর্মসূচী পালন করা হয়েছিল

বলে প্রমাণ নেই। অবশ্য চূর্ণী নদীর উত্তর পাড়ে খিস্‌মা অঞ্চলে 'বুনো' অধ্যুষিত এলাকায় ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জঙ্গী কৃষক আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল। ১৯৭০-এর মার্চ মাসে জনৈক নগেন্দ্রনাথ কর্মকারকে আড়খিসমা গ্রামাঞ্চলের (রাণাঘাট থানা) 'বুনো' অধিবাসীরা 'খতম' করে বলে পুলিশ রিপোর্টে মেলে। বিশেষতঃ এই অঞ্চলে 'ছমনিপোঁতা' গ্রামটি—যেটি নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার বনগাঁ মহকুমার সীমান্তে অবস্থিত ছিল সেখানকার 'বুনো' আদিবাসীরা তাদের 'জঙ্গী' কার্যকলাপের জন্য উল্লেখযোগ্য ছিল। একাত্তরে নভেম্বর মাসে এই আড়খিসমা থেকে আঁইশমালী (গাংনাপুর থেকে পূর্ব দিকে) পর্যন্ত 'বুনো' সম্প্রদায়ের ভূমিহীন কৃষকরা একটি 'লং মার্চ' করে বলে জানা যায়।[৪৮]

নদীয়া জেলার বিভিন্ন এলাকাতেই এই 'বুনো' বা সর্দার সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের বাস—যেমন হরিণঘাটা, চাকদহ, রাণাঘাট ও শান্তিপুর। এই এলাকাগুলিতে সি.পি.আই (এম-এল) কর্মীরা 'বুনো'দের নিয়ে 'গেরিলাবাহিনী' গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছিল। হরিণঘাটায় নিরক্ষর 'বুনো'দের জন্য একটি 'নৈশবিদ্যালয়' তৈরী করা হয়েছিল। গোয়েন্দা পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে চাকদহ থেকে হবিণঘাটা এলাকার মধ্যে থেকে তিনজন 'বুনো' সম্প্রদায়ের লোককে জেলার বাইরে পাঠানো হয়েছিল 'গেরিলা' কায়দায় যুদ্ধের ট্রেনিং নেওয়ার জন্য।[৪৯] শান্তিপুরের অজয় ভট্টাচার্য ও আড়ংঘাটার মহানন্দ রায়—এই দুজনকে পুলিশ বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিল, যারা 'বুনো'-দের মধ্যে মাওবাদী প্রচার চালানো ও সংগঠন গড়ে তোলার কাজে লিপ্ত ছিলেন। গোয়েন্দা রিপোর্ট এ খবরও দিয়েছিল যে, মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর ও চাখুণ্ডী এলাকা থেকে প্রায় ৬০ জন আদিবাসী যুবকের দুটি দল বনগাঁ ও নদীয়ার রাণাঘাট অঞ্চলের উল্লিখিত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় মাওবাদী প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছে।[৫০]

উনসত্তরে এইভাবে নদীয়ার শহরগুলিতে ছাত্র-যুবশক্তির উত্থানের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও মাওবাদী রাজনীতির জোরদার প্রচার ছড়াচ্ছিল। তখনও মেদিনীপুরের মত জোতদার 'খতম' করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি—যদিও ডেবরা-গোপীবল্লভপুরের সমর্থনে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচার চলেছিল চারু মজুমদারের আহ্বান অনুযায়ী—'ক্ষমতা দখলের কথা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে রাখতে হবে অর্থাৎ কৃষকদের জাগাতে হবে এবং তাদের নিজেদের গ্রামগুলোকে মুক্ত করার ওপর জোর দিতে হবে'। হরিণঘাটা পল্লীশ্রী অঞ্চলের সি.পি.আই (এম-এল) প্রচারিত একটা বুলেটিন থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করা গেল।

বুলেটিন নম্বর ৬/১লা জুন ১৯৬৯

কৃষাণ ভাই—অস্ত্র শানাও রাষ্ট্রগুলিকে আঘাত কর। কামান দাগো সদর দপ্তরে। খাস, পতিত, বেনামী, জমি দখল করো। দখল কর সুদখোর, জোতদার ও প্রতিক্রিয়াশীলদের জমি।

যুক্তফ্রন্ট নামধারী নয়া কংগ্রেসীরা কিছু রিলিফ, বোনাস, বেতনবৃদ্ধি ও জমিবিলির নামে শোষকশ্রেণীকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। জনসাধারণের জঙ্গী মেজাজকে পঙ্গু করে

শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বিপথগামী করছে। সুকৌশলে। শোষকশ্রেণী—তার শাসনকে বাড়াবার ও টিকিয়ে রাখবার জন্য গরীবদরদী সাজে, রিলিফ দেয়। বেতন বাড়ায়। ধান ও টাকা অগ্রিম দেয়। গরীব মানুষের অভাবের সুযোগ তারা পুরোপুরি ব্যবহার করে। তাদের শোষণের একটা অংশ অনেক ক্ষেত্রে বেকার ভাতা হিসাবে দিয়েও আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। ভারতবর্ষের ধনী জোতদার ও মহাজনরা এই কাজ এ যাবৎ কংগ্রেস পার্টি ও তার সরকার মারফৎ করে এসেছে। আর যুক্তফ্রন্ট নামধারীরা সেই একই কাজ করে চলেছেন। কাজেই এই ফ্রন্ট বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট নয়। ...হরিণঘাটা থানা এমনই একটা এলাকা যেখানে খাস ও পতিত জমির তুলনায় ভূমিহীন ও ক্ষেতমজুরের সংখ্যা অনেক গুণে বেশী। আর এক একর জমির মালিক থাকে নামমাত্র, ক্ষুদ্র চাষী বলা চলে তারা ক্ষেতমজুরও বটে এবং তাদের সংখ্যা আরও অনেকগুণ বেশী। কৃষকশ্রেণীকে জমি দেওয়ার অছিলায় মার্কসবাদের ভেকধারী তথাকথিত মার্কসবাদী পার্টি ও ডাঙ্গে পার্টি ফতেপুর গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন সভা ডাকেন। দুটি সভাতেই আমরা কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা, যারা নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনকে সঠিক মনে করি, এই সভায় আমরা সেই পথেব কথা ঘোষণা করি। আরও বলি এই জমি ভূমিহীন কৃষক ও ছোট চাষীদের প্রাপ্য। যেহেতু আয় কম, লোকসংখ্যা বেশী, সেইহেতু এই জমি যৌথভাবে চাষ করা উচিত ও ফসল সমানভাবে বন্টন করা উচিৎ। তা না হলে গরীব চাষীদের মধ্যে ঝগড়া ও বিবাদ, দেখা দিতে পারে। এইটাই মার্কসবাদী, লেনিনবাদ ও মাও সে তুঙ-এর চিন্তাধারা।...

ইনক্লাব জিন্দাবাদ,
কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র জোট বাঁধুন
নকশালবাড়ি লাল আগুনে রঙ-বেরঙের
শোধনবাদীদের পুড়িয়ে মারুন—লাল সেলাম।

—হরিণঘাটা যুবক সমিতির পক্ষে শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বসাক কর্তৃক সম্পাদিত ও হরিণঘাটা পল্লীশ্রী শ্রীপ্রেস হইতে মুদ্রিত।

(উপরোক্ত দলিলটি মুদ্রিত হওয়ার আগেই পুলিশের হাতে পড়ে। হাতে লেখা প্রচারপত্রটি পুলিশ ফাইল থেকে পাওয়া যায়। এরকম আরো কিছু গোপন ও অপ্রকাশিত দলিল পরিশিষ্ট ৭-১০-এ দ্রষ্টব্য)।

সূত্র নির্দেশ

১ *পুলিশ রিপোর্ট;*
২ ১৪.১১ ৬৭ তারিখে *যুগান্তর* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, যা গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে উদ্ধৃত করা হয়েছে।
৩ *চারু মজুমদার—'কেন এখনই পার্টি গঠন করতে হবে?' দেশব্রতী,* ২০ মার্চ, ১৯৬৯,

চারু মজুমদার রচনাসংগ্রহ, নয়া ইস্তাহার প্রকাশনী, উত্তর ২৪ পরগণা, প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ৬২-৬৩;

৪ *বদরুদ্দীন উমর ঃ 'বাঙলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা',* ধ্রুপদী প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৮০, প্রবন্ধ ঃ 'বাঙলাদেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা'—পৃষ্ঠা - ৩৬-৪৩;

৫ কৃষ্ণনগর পলিটেকনিকের অধ্যাপক ও নকশালপন্থী সংগঠক *শ্রী সমর ভট্টাচার্য* ও ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও প্রাক্তন নকশালপন্থী *মহিমময় চন্দ*-র সাক্ষাৎকার ভিত্তিক মতামত, যাঁরা মনে করেন—'সাবজেক্টিভ প্রিপারেশন ও অবজেক্টিভ আণ্ডারস্ট্যান্ডিং ঠিক ছিল না।'

৬ বক্তব্যটি কৃষ্ণনগরের প্রাক্তন কো-অর্ডিনেশন কর্মী *রামু (প্রাবৃট) ব্যানার্জীর মন্তব্য.* উল্লেখ্য যে ইনি পরবর্ত্তীতে সি.পি.আই (এম-এল)-এ যোগ দেননি।

৭ *হরিনারায়ণ অধিকারী ঃ 'ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও কিছু ঘটনাবলী,* দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, অক্টোবর, ১৯৮৮, মার্কসবাদী ফোরাম, পৃষ্ঠা—১৯৪-৯৫

৮ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় শুধু যে সাধারণ মানুষের আস্থা অপরিবর্তিত ছিল তাই নয়, উনসত্তরের মাঝামাঝি কৃষ্ণনগর পলিটেকনিকের (শহরের নকশালপন্থী ছাত্র রাজনীতির অগ্রনী কেন্দ্র) ছাত্ররাও ছাত্রসংসদ নির্বাচনে লড়াই করে ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ছাত্র-ফেডারেশন হিসাবে ইউনিয়নের ১৫টি আসনের মধ্যে ১০টি দখল করে। সূত্র ঃ *গোয়েন্দা পুলিশের মান্থলী রিভিউ;*

৯ সংবাদটি নবদ্বীপের ঘটনাকে বিবৃত করেছে, *দেশব্রতী,* ২৩শে মে, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা-৩

১০ *তদেব,* ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-১;

১১ *দি স্টেটসম্যান,* ১০ই এপ্রিল, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-৩;

১২ *মিন্টু মুখার্জী—ইনি শান্তিপুরে প্রথমে 'শিল্পীমহল'* এবং ১৯৭০-এর পরে 'লোকগীতি নাট্যম'—সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন যারা মূলতঃ গণনাট্য পেশ করত;

১৩ *দি স্টেটসম্যান,* মে ৪, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-৭, *বাংলা অনুবাদ লেখকের;*

১৪ এই মন্তব্যগুলি *সাধন চট্টোপাধ্যায়ের* সাক্ষাৎকার এর ওপর ভিত্তি করে লিখিত;

১৫ *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৩ মে, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-৪;

১৬ ১৯৬৯-এর ৪ ডিসেম্বর *'দেশব্রতী'* পত্রিকায় *চারু মজুমদার* লিখলেন—"আমরা নতুন কথা যা বলছি, তা হচ্ছে এই যে, চীনদেশ ও তার পার্টি, যে পার্টির নেতৃত্ব করেছেন চেয়ারম্যান মাও ও ভাইস চেয়ারম্যান লিন পিয়াও, তার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েই আমরা সারা পৃথিবীর বিপ্লবী জনতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হব।" *("ভারতের বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করে এগিয়ে চলুন")*

১৭ *The Statcsman,* May 3, 1969, pp.1;

১৮ *Ibid,* May 10, 1969, pp. 5;

১৯ *Ibid*, May 2, 1969, pp. 1;

২০ *Ibid*, May 6, 1969, pp. 4;

২১ *The State's Directorate of National Employment Service*-এর হিসাব অনুযায়ী ১৯৬৯ সালে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই বেকারের সংখ্যা ছিল ১.৭ মিলিয়ন। সূত্র ঃ *The Statesman*, May 21, 1969, pp. 1;

২২ *হরিনারায়ণ অধিকারী, তদেব*, পৃষ্ঠা-১৯১;

২৩ *তদেব*, পৃষ্ঠা-১৯২;

২৪ *নবদ্বীপ বার্তা*, ১৩ এপ্রিল, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ১ ও ৪;

২৫ *The Statesman*, 12 April, 1969, pp. 5;

২৬ *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৭ এপ্রিল, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-৫;

২৭ উনসত্তরের পয়লা অক্টোবরের আগেই অসিত সেন, সত্যানন্দ ভট্টাচার্য প্রমুখ সি.পি.আই (এম-এল) থেকে বিচ্ছিন্ন হন। কৃষিবিপ্লবে গণ আন্দোলনের ভূমিকা নিয়ে পার্টির সঙ্গে তাঁদের মতবিরোধ হয়;

২৮ কৃষ্ণনগরের সি.পি.আই (এম-এল)-এর এ্যাকশন স্কোয়াড-এর সদস্য ও পরবর্ত্তীকালে স্রেফ 'গুণ্ডা' হিসাবে চিহ্নিত *গোরা ওরফে সুজিত ভট্টাচার্য* গ্রেপ্তার হওয়ার পরে পুলিশের কাছে যে বিবৃতি দেন, তার থেকে উদ্ধৃত;

২৯ এখানে উল্লেখ করা দরকার যে নবদ্বীপের প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎকালীন নকশালপন্থী ছাত্রনেতা বর্তমানে সি.পি.আই দলভুক্ত;

৩০ পরিশিষ্ট - ৩ দ্রষ্টব্য;

৩১ *গোয়েন্দা পুলিশ রিপোর্ট*, তারিখ ১১.৫.৬৯;

৩২ *তদেব*;

৩৩ *তদেব*;

৩৪ *চারু মজুমদার—'পরিমলবাবুর রাজনীতি' দেশব্রতী*, মে ১৯৬৯, 'চারু মজুমদার রচনাসংগ্রহ', পৃষ্ঠা-৬৬;

৩৫ *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৫ মে, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-৫;

৩৬ *চারু মজুমদার ঃ গেরিলা এ্যাকশন সম্পর্কে কয়েকটি কথা', দেশব্রতী*, ১৫ জানুয়ারী, ১৯৭০, 'চারু মজুমদার রচনাসংগ্রহ', পৃষ্ঠা-৯৩;

৩৭ *পরিশিষ্ট*—৪ দ্রষ্টব্য; (আরও তালিকা পঞ্চম পরিচ্ছেদের ২৩৫ পৃষ্ঠায়)

৩৮ এই মন্তব্য *ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার প্রণীত;*

৩৯ তৎকালীন রাজ্য আইনমন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল যে এই মর্মে আইনী সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন সে খবর সংবাদপত্রে মেলে, যেমন *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১২ এপ্রিল, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-১;

৪০ *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৩০ জুন, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-১;

৪১ *তদেব,* ১২ এপ্রিল, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-১;

৪২ *তদেব,* ২০ নভেম্বর, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-৫;

৪৩ যেমন *জগদীশ দেবনাথ, প্রাণেশ দেবরায়, চন্দন মজুমদার* প্রমুখ;

৪৪ *নবদ্বীপ বার্তা,* ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-৩;

৪৫ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ অক্টোবর, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-৫, কমিউনিস্ট পার্টির শরিকি সংঘর্ষের বিভিন্ন খবর পাওয়া যাচ্ছে *'পুলিশ রিপোর্টে'* যেখানে বলা হচ্ছে উনসত্তরের কুড়ি আগস্ট নবদ্বীপের ঢাকানগর কলোনীতে (তেঘড়িপাড়া) সি.পি.আই (এম) ও সি.পি.আই (এম-এল)-এর সংঘর্ষ হয়, যার ফলে তিনজন আহত হয়। এছাড়াও ১৮ মে, ১৯৬৯-এর *আনন্দবাজার পত্রিকার* খবর হল 'চাকদহের সি.পি.আই (এম) নেতা অরুণ ভট্টাচার্য ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মী গৌরাঙ্গ বিশ্বাসের দ্বারা ছুরিকাহত' হন। (পৃষ্ঠা-৫)

৪৬ পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন *আই.জি আই.বি প্রসাদ বসুকে* উদ্দেশ্য করে প্রেরিত হয়েছিল একটি স্বাক্ষরবিহীন, ঠিকানাবিহীন ও তারিখবিহীন চিঠি। চিঠিটি আই.বি ফাইলে ১৪.১১ ৭১ তারিখে নথীভুক্ত হয়, উদ্ধৃতি চিহ্নের অংশবিশেষ চিঠিটি থেকে তুলে দেওয়া। এই চিঠিটি পুলিশের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব পায়।

৪৭ উপরিল্লিখিত পত্রটিতে আড়ংঘাটা অঞ্চলে নকশালপন্থীদের কাজকর্ম, তাদের পরিচয়, নকশালপন্থীদের কাজকর্মের এলাকা—এ সবই বিশদে প্রকাশ করা হয়েছে। আড়ংঘাটা এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ কিভাবে নকশালপন্থীদের কার্যকলাপে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন—তার একটা দর্পণ হিসাবে এই চিঠিটিকে দেখা যায়। নিচে এই চিঠির বিশেষ কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল ঃ—

I am an inhabitant of a village of Jugal Kisor Anchal, P.S. Ranaghat which may be called the 'Den of Naxalities'. Reign of terror has been established here by a group of some perverted youngmen. ...This area may be called according to them, 'Liberated Area'. The whole staff of Ranaghat Police Station and D.P.O. of Ranaghat too are related with them through the agent Mr. Biswas of Hossainpur, the commander of Home-guard of Aranghata. The naxalites are collecting money from the businessmen and they are giving a portion of that to the police through the agent. Because the inhabitant of this area are compelled to obey their orders. They have even lost the strength of shouting seeing the mishap in front of them created by the naxalites. They fear more the naxalities than the Government.

৪৮ রাণাঘাটের প্রাক্তন সি.পি.আই (এম-এল) কর্মী *প্রদীপ চ্যাটার্জীর* বক্তব্যকে ভিত্তি করে লেখা;

৪৯ *গোয়েন্দা পুলিশ ফাইল* থেকে উদ্ধৃত;

৫০ *তদেব।*

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সত্তর দশক

চারু মজুমদার আহ্বান জানালেন 'সত্তর-এর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন।' বাস্তবিকই, বিপ্লবী কমিউনিস্টদের সামনে প্রত্যাশার দিগন্তকে বাড়িয়ে দিয়েই উনসত্তর শেষ হয়েছিল। তখনকার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা চারু মজুমদারের ভাষ্য মতই ভারতবর্ষের শাসকচক্রের নিজস্ব সংকটকে ক্রমশই প্রকট করে তুলেছিল। সেই সময়ের রাজনৈতিক চিত্রটি চারু মজুমদারের লেখাতেই সুন্দর ফুটেছে। 'অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের ভেতরকার ঐক্য হয়ে উঠছে দৃঢ়। পার্টির সাধারণ সভ্যরা স্বনির্ভরতার দিকে যাচ্ছেন, আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। ...এই '৬৯ সালেই কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। কেন্দ্রে ও রাজ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারে অস্থায়িত্ব দেখা দিয়েছে। ...যুক্তফ্রন্ট কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে দাঁড়াতে পাচ্ছে না। কেরল ও পশ্চিমবাংলা—দুই জায়গায়ই যুক্তফ্রন্টের শরিকি দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে। ভারতবর্ষের বিপ্লবী অবস্থা প্রতিদিনই আরও চমৎকার হচ্ছে।'[১]

সত্তর-এর শুরু থেকেই সি.পি.আই (এম-এল) সমস্তরকমের জড়তা ঝেড়ে ফেলে কয়েকটি রণকৌশলের ওপর দৃষ্টি স্থির করল। এক, যেহেতু 'ইতিহাসের মঞ্চ থেকে কোনো শ্রেণীই স্বেচ্ছায় সরে যায় না', সেহেতু উদ্দেশ্যহীন রাজনৈতিক প্রচার আর না করে কেবলমাত্র খতম অভিযানকে সফল করার জন্যই রাজনৈতিক প্রচার চালানো উচিত আর তা-ও হবে ষড়যন্ত্রমূলক। দুই, যে কোনো সন্ত্রাসবাদী দলের মতো প্রায় 'আত্মঘাতী' দল তৈরীতে উৎসাহদান— "...আপনার আছে সেই মহান মন্ত্র, মাও সে তুঙ-এর চিন্তাধারা... —এই মহান যজ্ঞে জীবন আহুতি দেওয়ার চেয়ে পবিত্রতম কাজ তো আর কিছু নেই। এই আত্মাহুতির অগ্রাধিকার পেয়েছি বলেই তো আমরা কমিউনিস্ট, চেয়ারম্যানের শিষ্য।"[২] তিন, কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামকে মুক্তি সংগ্রামে রূপান্তরিত কবা, অর্থাৎ শ্রেণীশত্রু খতম পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির সশস্ত্র ক্ষমতার বিরুদ্ধেও আঘাত হানা। অতএব ভূমিহীন কৃষকদের আর 'হাতের কাছের' অস্ত্র দিয়েই চলবে না, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে 'গণমুক্তিফৌজ' তৈরী করতে হবে।[৩]

অতএব সত্তরের প্রায় শুরুতেই নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে জোতদার খতমের সপক্ষে পোস্টার পড়ল এবং ঘোষিত হল—'বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস।' ফেব্রুয়ারী মাসের ষোল তারিখে নদীয়াতে প্রথম 'খতম নীতি' রূপায়িত করার চেষ্টা হল করিমপুর থানার রহমতপুরে বনওয়ারীলাল সাহাকে হত্যার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে। যদিও এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়, কিন্তু তারপরের মাসেই—১২ই মার্চ রাণাঘাট থানার আড়খিস্‌মা গ্রামের নগেন বিশ্বাস 'খতম' হলেন ১০-১২ জন নকশালপন্থী যুবকের হাতে। পার্টির কৃষ্ণনগর ইউনিট চাকদহ, রাণাঘাট ও অন্যান্য বহু জায়গায় এই 'খতম'কে ব্যাপক পোস্টারিং-এর মাধ্যমে প্রচার করল—

'নকশালবাড়ির লাল আগুন আড়ংঘাটা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে'; 'বীর কৃষক গেরিলাদের হাতে' নদীয়া জেলার আড়ংঘাটা অঞ্চলে আবার জোতদার খতম! কল্যাণী শহরে ২৮শে মার্চ ষাট জনের 'নকশালপন্থী' যুবকের একটি দল মশাল মিছিল করল—'মেদিনীপুরের জোতদারের গলাকাটা চলছে চলবে। চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'—এই শ্লোগান দিয়ে।

এ সবের পাশাপাশি শুরু হয়ে গিয়েছিল বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে, —বিভিন্ন সরকারী অফিস, অথবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাল পতাকা ওঠানো, বা জাতীয় নেতাদের মূর্ত্তি লাঞ্ছনা করার কার্যসূচী। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কৃষ্ণনগর শহরের পৌরভবনে জনা দশেক নকশালযুবক মাও সে তুঙ-এর নামে শ্লোগান দিতে দিতে প্রবেশ করে ও পৌরভবনের দেওয়াল থেকে গান্ধীজীর একটি ছবি নামিয়ে ফেলে আগুন দিয়ে দেয়। একইভাবে মে মাসের বাইশ তারিখে রাত্রে শান্তিপুর রেল স্টেশনে দশ বারোজন যুবক গান্ধীজীব ছবিতে আগুন লাগায় ও স্টেশন ভবনে লাল পতাকা উত্তোলন করে। নবদ্বীপ শহরেও, ঊনসত্তর সালের চেয়ে সত্তরে, মাও সে তুঙ-এর ছবি ও বাণীসহ দেওয়াল লিখন প্রভৃতি যেমন শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি গান্ধীজীর প্রতিকৃতি অপসারণ, মাও-এর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন, লাল পতাকা উত্তোলন বোমা ফাটানো প্রভৃতিও একাধিক স্থানে বেড়েই চলেছিল। জুন মাসের ৮ তারিখে বেলা দেড়টায় নবদ্বীপ পৌরসভা নকশালপন্থী যুবকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। সংবাদপত্রের সূত্র অনুযায়ী—তিনটি যুবক পৌরসভা কক্ষের মধ্যে দিয়ে পৌরপতির ঘরে প্রবেশ করে ও কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গান্ধীজীর ছবিখানা ভেঙে ফেলে। তাছাড়া পৌরভবনের ছাদের ওপর উঠে জাতীয় পতাকাটি খুলে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং পতাকাদণ্ডের সঙ্গে একটা লাল পতাকা বেঁধে দিয়ে বোমা ফাটিয়ে পালিয়ে যায়।[৪]

কিন্তু অন্যদিকে শান্তিপুর শহরে মূর্ত্তিভাঙ্গা বা প্রতিষ্ঠানে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রায় হয়ই নি। শান্তিপুরের এক 'বিপ্লবী' কমিউনিস্ট কর্মীর (পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী) ভাষ্য অনুযায়ী শান্তিপুর শহরে সাধারণভাবে মূর্ত্তিভাঙার বিরুদ্ধে একটা জনমত ছিল, যাকে আহত করতে সেখানকার নকশালপন্থীরা সাহস পায়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শান্তিপুরের মিউনিসিপ্যাল স্কুলে একবার (সত্তর সালে) অগ্নিসংযোগ করা হয়, যার ফলে বেশ কিছু নথিপত্র পুড়ে যায়। এর ফলে স্কুলের একশ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মীর সুবিধা হয় যাদের দুষ্কর্মের সাক্ষ্যপ্রমাণও পুড়ে ছাই হয়। পরবর্ত্তীকালে 'নকশালপন্থী' যুবকরা এই ধরনের ঘটনায় গণপ্রতিক্রিয়া যে বিপ্লবের সপক্ষে যায় না, বা মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থসাধনে কাজে লাগে, সে সম্বন্ধে সচেতন হয়। এর জন্য শান্তিপুর লোকাল কমিটি রাজ্য কমিটির কাছে তিরস্কৃতও হয় বলে শোনা যায়, যদিও একাত্তর থেকে এই ছবিটা পাল্টে যাচ্ছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে আঘাত হানার পাশাপাশি, কৃষ্ণনগর শহরে আরও একটি প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা শুরু হয়—আরক্ষা বিভাগ, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সশস্ত্র

বাহিনীর প্রতিভূ হিসাবে পুলিশের ওপর আক্রমণ।[৫] সত্তর-এর প্রথম দিকেই কৃষ্ণনগর শহরে নকশালপন্থীদের এ্যাকশন স্কোয়াড' গড়ে ওঠে। মূলতঃ শুভ্রাংশু ঘোষ, বুলি (স্বপন) সিংহ রায়, রাম ঘোষ, গোরা ভট্টাচার্য—এদের নিয়ে। এখানে উল্লেখ করা দরকার শহরে যুবছাত্রদের নিয়ে যে পার্টির আঞ্চলিক সংগঠন কমিটি গড়ে উঠেছিল—যেমন নাদু চ্যাটার্জী (জেলা সংগঠন কমিটির সম্পাদক), পংকজ জোয়ার্দার (শহর সংগঠন কমিটির সম্পাদক), মহিমময় চন্দ, দেবব্রত (দেবু) মুখার্জী, দেবপ্রিয় বাগচী, অমল রায় (বনগাঁর ছেলে), বিশ্বনাথ নন্দী—এই সদস্যরা বড়জোর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা মূর্ত্তি—ইত্যাদির ওপর আক্রমণ হানার কাজেই লিপ্ত ছিলেন। এদের মধ্যে বেশীরভাগই কৃষ্ণনগর পলিটেকনিকের ছাত্র ও গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে টিকে থেকে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে অপারগ ছিলেন। কিন্তু 'এ্যাকশন স্কোয়াড' যাদের নিয়ে গড়ে উঠল, তাদের মধ্যে একমাত্র শুভ্রাংশু ঘোষ ও বিপ্লব ব্যানার্জী বাদে প্রত্যেকেই উঠে এসেছিল সমাজের 'লুম্পেন' শ্রেণী থেকে। বুলি রায়—বহু 'নকশালপন্থী কর্মীর ভাষ্যে নিরক্ষর ছিলেন। যদিও কাজে আগ্রহ ও আন্তরিকতার অভাব ছিল না, কিন্তু কেবল শ্রেণীশত্রু খতম করা ছাড়া বুলি রায় কোনোদিন সংগঠনের অন্য কাজে লেগেছেন বলে প্রমাণ মেলেনি (অবশ্য নেতৃত্বও তাঁকে ব্যবহার করার জন্যই তুলে এনেছিলেন সেটাও সত্যি)। বাহাত্তর সালের পরে বুলি রায়ের কার্যধারা ও জীবনযাপন, অবশেষে ধানবাদের কোলিয়ারি শ্রমিকদের হাতে তাঁর মৃত্যু—মাওবাদীদের কাছে 'শহীদের' মৃত্যুর স্বীকৃতি পায়নি।

শক্তিনগর এলাকায় আর একটি 'মার্ডার স্কোয়াড' গড়ে ওঠে যারা বিশেষ কয়েকটি 'খতম' কার্যকর[৬] করেছিল এবং এগুলি সবই ছিল পুলিশ হত্যা। এই 'এ্যাকশন'-গুলিতে মূলতঃ যারা অংশ নিয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল রমা সাহা, দুখীরাম রায় (কৃষ্ণনগর পলিটেকনিকের ছাত্র), বিশু ঘোষ, নারায়ণ মণ্ডল ও নির্মল চাকী (স্কুলের ছাত্র)।[৭]

৭.৬.৭০ ও ১২.৬.৭০ তারিখে কৃষ্ণনগর শহরে বাংলায় লেখা পোস্টার পড়ে যেখানে পুলিশ কর্মচারী ও ডি.আই.বি কর্মীদের উদ্দেশ্যে হুমকি দিয়ে বলা হয় সি.পি.আই (এম-এল)-এর দেওয়াল লিখনগুলি মুছে ফেললে ফল ভাল হবে না। ২৩.৬.৭০ তারিখে শান্তিপুর শহরেও এবকম শ্লোগান লেখা হয়—'আই.বি তোরা সাবধান, এবার তোদের নেব জান'। ৬.৭.৭০ তারিখে শান্তিপুর শ্যামবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে পাহারাদার সান্ত্রীদের ওপর আক্রমণ হয় তবে ক্ষতি হয়নি। কৃষ্ণনগরে পুলিশ খুন শুরু হল জজকোর্টের সামনে সাব-ইন্সপেক্টার ফণী পালকে হত্যা করে। এরপর ১১.৭.৭০ তারিখে কৃষ্ণনগরের মহীতোষ বিশ্বাস স্ট্রীটে রাত্রিবেলা পুলিশের টহলদার গাড়ির ওপর চার পাঁচটা বোমা ছোঁড়া হলে পুলিশও পাল্টা এক রাউণ্ড গুলি চালায়। ২৩.৭.৭০ তারিখে কৃষ্ণনগরের হাতার পাড়ায় প্রশান্ত বিশ্বাস নামে জনৈক পুলিশ কর্মীকে ১৭-১৮ জন নকশালপন্থী যুবক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে ও গুরুতর রূপে আহত করে। ৩১.৭.৭০ তারিখে কৃষ্ণনগরের পুলিশ লাইনে কিছু বোমা ছোঁড়া হয়। ফলে দুজন কনস্টেবল আহত হয়। ১.৮.৭০ তারিখে কৃষ্ণনগরের বেজিখালি এলাকায় একটি প্রহরারত পুলিশের গাড়ির ওপব বোমা ছোঁড়া হলে কিছু

সি.আর.পি ও একজন সাব-ইন্সপেক্টর আহত হয় ও গাড়ীটির পিছনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩.৮.৭০ তারিখে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রথমটি হয় কৃষ্ণনগরের নেদেরপাড়ায়। আই.এস চ্যাটার্জী নামে জনৈক সাব-ইন্সপেক্টর ওই অঞ্চলে গাড়ী করে টহল দেওয়ার সময় বোমা ছোঁড়া হলে আহত হন। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে কৃষ্ণনগর পুলিশ লাইনে। পুলিশ ও জনতার একাংশের মধ্যে ছোটোখাটো সংঘর্ষ বাধে। সে সময়ের নদীয়া জেলার পুলিশ সুপার (অমিয় সামন্ত—যিনি ঊনসত্তরের নভেম্বর মাসে জেলায় বদলী হয়ে আসেন) এই ঘটনার সরকারী রিপোর্টে জানান যে সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে পুলিশী যান ও পুলিশ বাহিনীর ওপর 'উগ্রপন্থী'দের বোমা ছোঁড়ার ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কোনো রাজনৈতিক দলই প্রকাশ্যে এই কাজের প্রতিবাদ জানাচ্ছে না। উপরোক্ত ঘটনার সঙ্গে কৃষ্ণনগর বাস শ্রমিক ইউনিয়নের কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তারা এই ঘটনার প্রতিবাদে পরের দিন কৃষ্ণনগরে বনধ ডেকেছে। এঁর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশসুপার আরও মন্তব্য করেছেন যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে বাস শ্রমিক ইউনিয়ন সি.পি.আই (এম)-এর নিয়ন্ত্রণে ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ শ্রমিকদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ—বিশেষতঃ টেম্পো ড্রাইভার, ক্লীনার ও বাস শ্রমিকরাও—'নকশালপন্থী' দলগুলিতে যোগ দিচ্ছে। এই রাজনৈতিক দলটির সঙ্গে তারাও 'সি.আর.পি হঠাও' অভিযানে অংশ নিচ্ছে।[৮]

৫.৮.৭০ তারিখে কৃষ্ণনগর হাতারপাড়ায় গুরু ট্রেনিং স্কুলের কাছে একজন এন.ভি.এফ কর্মীর ওপর আক্রমণ হয়। এর পর পরই আগস্ট মাসের ২৫ ও ৩০ তারিখে এবং সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখে তিনটি উল্লেখযোগ্য পুলিশ 'খতম' হয়। ২৫.৮.৭০ কৃষ্ণনগর ডি.আই.বি-র কনস্টেবল বাসন সিং ছুরিকাঘাতে মারা যায়। ৩০.৮.৭০ তারিখে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালী থানার সাব-ইন্সপেক্টার কালীপদ দাসকে শক্তিনগর অঞ্চলে ছোরার আঘাতে খতম করা হয়। ১৫.৯.৭০ তারিখে বেলা দশটায় কৃষ্ণনগর পাত্র মার্কেটের জনবহুল এলাকায় নাকাশীপাড়া থানার বীরপুর পুলিশ পেট্রোল ক্যাম্প-এর এক কনস্টেবল নিবারণ মুখার্জীকে সাইকেল থেকে নামিয়ে হত্যা করা হয়। পুলিশ রিপোর্টে এই বেপরোয়া 'খতম' সম্পর্কে লেখা হয়—"The above constable was murdered in broad daylight near a bazar even though contingents of BSF, CRP, EFR and State Armed Police have been posted in different vulnerable points."[৯]

পুলিশ বাহিনীর ওপর এই লাগাতার আক্রমণে পুলিশ কর্মীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তুলনাবিহীন এক প্রতিআক্রমণের মধ্যে দিয়ে পুলিশ কর্মীরা এর বদল নেওয়ার চেষ্টা করে। স্থানীয় সংবাদপত্র *'নবদ্বীপ বার্ত্তা'* থেকে ঘটনার বিবরণ তুলে দেওয়া গেল—

১৩ *সেপ্টেম্বর '৭০ (পৃষ্ঠা-১)*—"কৃষ্ণনগর থানার এস.আই কালিপদ দাসের ছুরিকাঘাতে মৃত্যু হওয়ায় এবং এ নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে চারজন পুলিশ ছুরিকাহত হওয়ায় পুলিশবাহিনী বিদ্রোহী হয়ে উঠে। গত ৩০ আগস্ট সন্ধ্যার পর থেকে কৃষ্ণনগর শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন লোকের বাড়িতে ঢুকে অকথ্য অত্যাচার করে, অগ্নিসংযোগ করে এবং জিনিসপত্র

ভেঙে চুরে তছনছ করে। এই অত্যাচার থেকে রেল স্টেশন ও সেখানকার কর্মী, ট্রেনযাত্রী, সিনেমাহল ও দর্শকবৃন্দ, হোটেল, দোকানপাট কিছুই বাদ যায়নি। এই নির্মম মারপিট ও অত্যাচারে কমপক্ষে বিরানব্বই জন আহত হয় ও তার মধ্যে ৩২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দমকল বাহিনী আগুন নেভাতে গেলে পুলিশবাহিনী বাধা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত বি.এস.এফ-এর সাহায্যে দমকল বাহিনী আগুন নেভাতে সমর্থ হয়। বিক্ষুব্ধ পুলিশদের হাতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডি.এস.পি ও আরও কয়েকজন অফিসার আহত হন। বিক্ষুব্ধ পুলিশবাহিনীকে আয়ত্তে আনার জন্য জেলা কর্তৃপক্ষকে শেষ পর্যন্ত সামরিক বাহিনী তলব করতে হয়েছে, সান্ধ্য আইন জারী করতে হয়েছে। অত্যাচারের পরে বিভিন্ন স্থানের চিত্র মর্মান্তিক। ...বিদ্রোহী পুলিশের তাণ্ডবলীলায় কৃষ্ণনগরে যে ক্ষতি হয়েছে তা অবর্ণনীয়। ...বিশিষ্ট নাগরিক সনৎ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে বিছানাপত্র, জামাকাপড় প্রভৃতিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়, লাঠির আঘাতে দেওয়ালের ছবি, আয়না, পাখা ইত্যাদি জিনিসপত্র ভেঙ্গে তছনছ করা হয়। সোনার গহনাপত্র, ঘড়ি ও কয়েকটি মূল্যবান জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না, যার আনুমানিক মূল্য সহস্রাধিক টাকা। বনফুল সিনেমাহলে প্রদর্শনী চলাকালে উন্মত্ত পুলিশ আকস্মিকভাবে ঢুকে বেপরোয়াভাবে লাঠি দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে প্রহার করেছে, সিনেমা হলের মূল্যবান পর্দাটি ছিঁড়ে দেওয়া হয় ও হলের মধ্যে ছড়ানো দেখা যায় বহু জুতা, কাচের ভাঙা চুড়ি, চুলের ফিতা, শাড়ী প্রভৃতি। শক্তিনগরের গেঞ্জির কারখানায় অগ্নিসংযোগের ফলে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যায়। বিশিষ্ট মিষ্টির দোকান গিরীন্দ্র সুইটস-এর ফার্ণিচারপত্র ভেঙে তছনছ এবং কয়েক হাজার টাকার মিষ্টি রাস্তায় ছড়ানো দেখা যায়।"

বস্তুতপক্ষে এই নির্বিচার পুলিশ হত্যার যথার্থতা সম্পর্কে প্রাক্তন নকশালপন্থী কর্মীরা অনেকেই একমত যে, 'পুলিশের মধ্যে সৎ বাছা খুব কঠিন ব্যাপার।' পার্টির তরফে এমন কোনো নির্দেশ ছিল না যে জোতদারের মত পুলিশের মধ্যে শ্রেণীশত্রু বাছাবাছি করার কাজটা করা যায়। তাছাড়া সত্তর সালের মাঝামাঝি থেকেই 'এ্যাকশন স্কোয়াড' ও সংগঠকদের মধ্যে পরিষ্কার সীমারেখা তৈরী হয়ে যায়। বুলি সিংহ রায়ের নেতৃত্বে এই 'মার্ডার স্কোয়াড' বা 'খতম বাহিনী' তখন জেলা কমিটির নির্দেশ ছাড়াই নদীয়া জেলায় ঘুরে ঘুরে শ্রেণীশত্রু খতমের দায়িত্ব পালন করছে।

তবে পুলিশ হত্যার সপক্ষে *সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়* একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন—"একথা ঠিকই যে আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সশস্ত্র বিপ্লবীরা একাধিক বাঘা বাঘা পুলিশকর্তা ও তদানীন্তন ইংরেজ আমলাদের হত্যা করে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিহিংসার বীরত্বপূর্ণ নজির স্থাপন করেছিলেন, সে তুলনায় সত্তর দশকে সি.পি.আই (এম-এল) পুলিশবাহিনীর চূড়ায় যে কর্মকর্তারা 'নকশাল' হত্যার পরিকল্পনা করেছিল তাদের গায়ে হাত বসাতে পারেনি। নিঃসন্দেহে এটা আন্দোলনের একটা বড় দুর্বলতা। কিন্তু এর আড়ালে পুলিশবাহিনীর সাধারণ 'গরীব' কর্মচারীরা নিজেদের নিষ্পাপ শিশু বলে পার পেয়ে

যেতে পারে না। মনে রাখা দরকার এই সাধারণ পুলিশ কর্মচারীরাই গ্রামের কৃষক ও পিছিয়ে পড়া তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' জাতির উপর চরম অত্যাচার চালায়। ...এই দৈনন্দিন পুলিশী নিপীড়ন ও অপমানের শিকার গ্রাম-শহরের যে গরীব জনসাধারণ তাদের চোখে অনুপস্থিত পুলিশের বড় কর্ত্তা নয় এই খুদে সিপাইরাই উৎপীড়নকারী রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিনিধি। জনসাধারণের প্রতিবাদকে ভাষা দিতে গেলে এই অত্যাচারীদের—তারা যত সামান্যই হোক—গায়ে আঘাত লাগবেই। ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্রে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশই ছিল সাধারণ শ্রমিক ঘরের। তাই বলে কি মুক্তিযোদ্ধাদের হাত থেকে তারা রেহাই পেয়েছিল?[১০]

সি.পি.আই (এম-এল)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির তরফে *'পুলিশের প্রতি—সি.পি.আই (এম-এল)' লিফলেটেও* বলা হয়েছিল যে—"আজ সাধারণ পুলিশকে কয়েকটা স্পষ্ট কথা বলতে চাই। তারা গরীব ঘরের ছেলে। তাদের অনেকেই এসেছেন গরীব কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন-মধ্য শ্রেণী থেকে। তারা পেটের দায়ে চাকুরী করতে এসেছেন ঠিকই। কিন্তু তাদের চাকুরী যে জমিদার ও পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য গরীব জনতাকে, শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী জনতাকে হত্যা করা, এ কথা কি তারা অস্বীকার করতে পারেন? ...বড় কর্তারা, তাদের মুরুব্বিরা, বি.আর. ঘোষ-রঞ্জিত গুপ্ত-দেবী রায়-বিষ্টু বাগচীরা বডিগার্ড নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে তাদের দিয়েই এই পাইকারী হত্যাকাণ্ড সাধন করাচ্ছে। কিন্তু আগেই বলেছি জমানা বদলে গেছে। হত্যা করে বিপ্লবীদের ও বিপ্লবী জনতাকে ঠেকানো যাচ্ছে না, বরং তাদের পাল্টা হত্যা অভিযান বেড়েই চলেছে।"[১১]

পুলিশকে সরাসরি বিদ্রোহ করার জন্য প্ররোচিত কবার চেষ্টাও হয় এই লিফলেটে। এই সময় থেকে নকশালপন্থী যুবকদের এই রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ দমন করবার জন্য পুলিশ সরাসরি 'এনকাউন্টার' কৌশলের সাহায্য নিতে শুরু করে। ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে সন্ধ্যায় 'কৃষ্ণনগরে রায়পাড়ার নিকটস্থ আমবাগানে পুলিশের সঙ্গে উগ্রপন্থী বলে কথিত একদলের সংঘর্ষ হয়। এতে উভয়পক্ষ থেকে গুলি বিনিময় হয় ও তাতে একজন উগ্রপন্থী নিহত হয় বলে পুলিশের সংবাদে প্রকাশ। এই নিহত যুবকের নাম বুড়ো হালদার। কিন্তু নিহতের পিতা জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ করেন যে তাঁর পুত্রকে পুলিশ সেদিন গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় এবং পুলিশই তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে।'[১২] ১৯.৯.৭০ তারিখের 'কালান্তর'-এ লেখা হয় "গুলি করে হত্যার পর বন্দুকের কাহিনী প্রচার।" স্থানীয় বামপন্থী কিছু দল (S.S.P, C.P.I, F.B) বুড়ো হালদারকে হত্যার বিরুদ্ধে তদন্তের দাবী জানায়। *পুলিশ রিপোর্টে* এই ঘটনাকে এইভাবে দেখানো হয়—"One Naxalite was killed and three police personnel sustained bullet injuries on their knees in a prolonged armed encounter between police and a group of extremists near the railway station tonight (15.9.70)."

Frontier পত্রিকায় ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১-এ জনৈক T. Goswami 'The Hounds of West Bengal শীর্ষক প্রবন্ধে কৃষ্ণনগরের এই ঘটনাটিকে পুলিশের ঠাণ্ডা মাথায়

সুপরিকল্পিতভাবে নকশালপন্থী যুবকদের নির্মূল করার পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখান। "When murder in lock-up was found inconvenient another method was discovered to eliminate the youth against whom no convincing case could be framed. Prisoners arrested in the morning or a day before would be killed in "gun battle" with the police. Take, for instance, the murder of Buro Halder of Krishnanagar. As 'The Statesman' correspondent from Krishnanagar reported (Sept. 16, 1970) "during the combing operation a small police party headed by the former S.P. Mr. A. Samanta, arrived near a jungle at Raipara. Suddenly from the jungle a volley of shots were fired at the police party. The policemen and officers took up positions, and returned the fire. The stillness of the night was broken with the reverberating sounds of gunfire." Later, police discovered the bullet-riddled body of 'Buro Halder."

পুলিশের তরফেও নকশালপন্থীদের নির্বিচার পুলিশ হত্যার 'অমানবিক' দিকটিকে তুলে ধরা হয়। যেমন ১০.১১.৭০ তারিখে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালী থানার জে.সি.ও (JCO) পঞ্চানন দাসকে রথতলা এলাকায় কিছু নকশালপন্থী যুবক ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। এই 'খতম' কার্যটি হয় হাবিলদারটির একমাত্র পুত্রকে সাক্ষী রেখে। বাচ্চা ছেলেটি পিতার মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে এতদূর মানসিক আঘাত পায় যে তাব বাকরুদ্ধ হয়ে যায়, খাদ্যগ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং হাসপাতালে কিছুদিনের মধ্যেই মারা যায়। তাঁর সহায় সম্বলহীন স্ত্রীও শোচনীয় অবস্থায় পড়ে। ঘটনাটি নদীয়ার প্রাক্তন পুলিশ সুপার.অমিয় সামন্তর সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লেখা।

ওপরের উদাহরণটি অবশ্যই শহরে নকশালপন্থী যুবকদের একাংশের 'মানবিকতা' বর্জিত আবেগের বহিঃপ্রকাশ, কিন্তু পাশাপাশি তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহা ও ঘৃণাবোধের দ্বারা প্ররোচিত পুলিশ 'খতমেব' দৃষ্টান্তও রয়েছে। রাণাঘাটে ২১.১০.৭০ তারিখে রাণাঘাট কোর্টের এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টার অমূল্য খাসনবিশকে হত্যা করা হয়। নকশালপন্থী বন্দী যুবকদের উপর অকথ্য অত্যাচারের অভিযোগ ছিল তার নামে। মরণাপন্ন অবস্থায় জল চাইলে বন্দীদের মুখে মূত্রত্যাগ করাই ছিল তার নেশা। এইভাবে কেবলমাত্র সত্তর সালেই নদীয়া জেলায় 'পুলিশ' খতমের বা পুলিশ কর্মীদের ওপর নকশালপন্থীদের আক্রমণের সংখ্যা ছিল কুড়ি।[১৩] এর মধ্যে অধিকাংশই ঘটেছিল কৃষ্ণনগর শহরে।

সত্তর থেকে এই শহর ভিত্তিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে নদীয়া জেলায় কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। কৃষ্ণনগরে সত্তর এবং তার পরবর্তী বছরগুলিতে শহরেব সি.পি.আই (এম-এল) যুবকদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় মূলতঃ 'এ্যাকশন স্কোয়াডের ইচ্ছার' মাধ্যমে। স্কুল কলেজেব নিয়মমাফিক কাজকর্মে বাধা দেওয়া, এবং মূলতঃ পুলিশের ওপর আক্রমণ চালানোই ছিল এ্যাকশন স্কোয়াডের প্রধান কাজ।

শান্তিপুর শহরে সি.পি.আই (এম-এল)-এর যে কর্মীরা শহরকেন্দ্রিক কাজকর্ম চালাতেন,

তাঁরা পাশাপাশি গ্রামের 'গেরিলা স্কোয়াড' সংগঠনের ব্যাপারেও সক্রিয় ছিলেন। যতদিন "অজয় ভট্টাচার্য-কালাচাঁদ দালাল জীবিত ছিলেন, (বাহাত্তর সালের তেসরা মে পুলিশের গুলিতে এঁদের মৃত্যু হয়) প্রায় ততদিন শান্তিপুরে শহরের পাশাপাশি গ্রামের সংগঠনেও যুবকরা একইভাবে লিপ্ত ছিলেন। নদীয়া জেলায় মাওবাদী সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শান্তিপুর এত অগ্রগণ্য ছিল যে পার্টির প্রথম জেলা সংগঠন কমিটি এখানেই তৈরী হয়। জেলা কমিটিতে শান্তিপুরের অজয় ভট্টাচার্য-কালাচাঁদ দালাল, বীরেন দাশ, কেষ্ট ঘোষ, দুলাল সাধু প্রমুখ ছিলেন। অন্তত সত্তর সাল অবধি শান্তিপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা এবং পুলিশের ওপর আক্রমণের দৃষ্টান্ত বিরল এবং তা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসাবেই দেখা যায়। শুধু তাই নয়, 'শ্রেণীশত্রু' খতমের' যে ডাক, তা নদীয়া জেলার মধ্যে শান্তিপুরেই সবার শেষে সাড়া তোলে। যদিও সত্তরের প্রায় শুরু থেকেই (এপ্রিল মাস) শান্তিপুর শহরে দেওয়াল লিখন দেখা যায়, চারু মজুমদারকে উদ্ধৃত করে—'খুনীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থই মৃত্যু' (৩০.৪.৭০—স্থান শান্তিপুর কৃত্তিবাস হাই স্কুল), কিংবা 'দিকে দিকে জোতদারের গলাকাটা চলছে চলবে', ইত্যাদি; কিন্তু শান্তিপুরে খতমের রাজনীতিকে কার্যকরী করা হয় প্রথম ৩.১০.৭০ তারিখে, শহরের সবচেয়ে ধনবান ও কুখ্যাত কালোবাজারি ও জমি জায়গার বন্ধকী কারবারি পাঁচু ভগতকে হত্যা করে। এই বিবরণ ও কারণ দর্শিয়ে সি.পি.আই (এম-এল) লোকাল ইউনিটের তরফে ৭.১০.৭০ তারিখে লিফলেট বিলি করা হয়।

এই 'খতম' নীতি সূচনায় শান্তিপুরে নকশালপন্থী কর্মীদের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা আনে। কানাই বঙ্গ যিনি নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক ছিলেন, 'খতম' নীতি শান্তিপুরে চালু হতেই এই দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এ সম্পর্কে সে সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে রুবি (জয়শ্রী) ভট্টাচার্য লিখেছেন—'সত্তর সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত শান্তিপুরে কোনো খতম অভিযান হয়নি—পার্টি থেকে অসম্ভব চাপ ও সমালোচনা। ঐ সময়ে তাকে (অজয় ভট্টাচার্য) খুবই বিচলিত হতে দেখা গেছে...তাছাড়া কোনো এক জায়গার অবস্থা আর এক জায়গায় চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তীব্র তর্ক-বিতর্কের মধ্যে এবারে অজয় ভট্টাচার্য-বিরোধী গোষ্ঠী একটা তৈরী হতে লাগলো।'[১৪] ঊনসত্তর থেকে ডেবরা-গোপীবল্লভপুর ও শ্রীকাকুলামের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেরিলা স্কোয়াড গঠন ও 'খতম' নীতি কার্যকর করার জন্য খুবই চাপ আসছিল। অজয় ভট্টাচার্য-কালাচাঁদ দালাল মূলতঃ এই ইস্যুতেই শুধু শান্তিপুরেই নয়—গোটা জেলাতেই ক্রমশঃ কোণঠাসা হচ্ছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত অজয় ভট্টাচায প্রসঙ্গে অসীম চ্যাটার্জীর (যিনি ডেবরা-গোপীবল্লভপুরের গেরিলা কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন) মন্তব্যের তাৎপর্য বিচার্য।

একাত্তরের গোড়া থেকেই কৃষ্ণনগর বা নবদ্বীপের মতই শান্তিপুরেও স্কুল কলেজের ওপর অতর্কিত হামলা শুরু হয়, ব্যক্তি খতম চলতে থাকে এবং পুলিশও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়। তবে প্রাক্তন নকশালপন্থী কর্মীরা এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, 'প্রত্যেকটি খতম জনগণের স্বার্থে হয়েছিল।'[১৫]

চাকদহের ক্ষেত্রে কিন্তু সি.পি.আই (এম-এল)-এর মূল কাজকর্ম কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় সি.পি.আই (এম)-এর সঙ্গে সংঘাতে। চাকদহ আঞ্চলিক পরিষদের অধীন কল্যাণীতেও এইভাবে শ্রমিক বনাম ছাত্রফ্রন্টের লড়াই-এ শহরের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ হয়। চাকদহের প্রাক্তন সি.পি.আই (এম) কর্মী অরুণ ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণের কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক।

'মধ্যবিত্ত এলাকায়, শিল্পাঞ্চলে সি.পি.আই (এম-এল) যতক্ষণ পর্যন্ত গণআন্দোলন গড়ে তোলার লাইন ও প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিল, দুই দলের মধ্যে সংঘাত খুনোখুনির পর্যায়ে যায়নি। কিন্তু অনতিবিলম্বে সি.পি.আই (এম-এল) গণসংগঠন বাতিল, বুর্জোয়া শিক্ষা বাতিল, মধ্যপন্থীরা ও আপসপন্থীরা শ্রেণীশত্রু এবং শ্রেণীশত্রুকে খতম করার সন্ত্রাসবাদী পথ গ্রহণ করে। এর ফলেই কংগ্রেস অনুগামী এবং পুলিশের আশ্রিত সমাজবিরোধীরা পরিকল্পিতভাবে সি.পি.আই (এম-এল)-এর খতম লাইনের জঙ্গী কর্মীতে সহজেই পরিণত হবার সুযোগ পায়। গোপনে ষড়যন্ত্রমূলক পদ্ধতিতে ছোট ছোট গোষ্ঠী তৈরী করে শোষক শ্রেণীশত্রু সহ অবিলম্বে সশস্ত্রপন্থার বিরোধী বামপন্থী কর্মী বিশেষভাবে সি.পি.আই (এম) কর্মী ও নেতাদের খতম করার কর্মপন্থা রচিত হয়। চাকদহ এলাকায় কুখ্যাত কংগ্রেসী সমাজবিরোধী গোপাল সিং-এর ভাই শঙ্কর সিং[১৬] সি.পি.আই (এম-এল)-এর নির্ভরযোগ্য কাজের লোকে পরিণত হয়। লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের কাজে লাগানোর তাত্ত্বিক বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়। বলা হয় শত্রুর রক্তে যার হাত রঞ্জিত নয় সে বিপ্লবী নয়। লুম্পেন প্রলেতারিয়েত সি.পি.আই (এম) দলেও একেবারে কম ছিল না। দলের নেতারা তাঁদের ক্ষিপ্ত করে তোলেন। সর্বোচ্চ নেতারা বলতে থাকেন বোমা ছুঁড়লে কি রসগোল্লা ছোঁড়া হবে? শ্রেণীশত্রু হত্যা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় পাল্টা হত্যার রাজনীতি সামনে আনা হয়। শুরু হয়ে যায় সংঘর্ষ এবং খুনোখুনি। এই খুনোখুনির মাধ্যমে দুটি দলই দুর্বল হতে থাকে। ১৯৭১ সালে এই খুনোখুনি ব্যাপক রূপ নেয়।'[১৭]

ওই এলাকার আর এক সি.পি.আই (এম) নেতা সৌরেন পাল মনে করেন যে, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট ভাঙার পর থেকেই চাকদহে নকশাল—সি.পি.আই (এম) লড়াই শুরু হয়। সত্তর-একাত্তর জুড়ে এই পর্বই চলে। এই যে দুই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বৈরিতার চরমপর্যায় শুরু হয় এতে খুনের বদলা খুন, আক্রমণের পাল্টা প্রতি-আক্রমণ, সন্ত্রাসের পাল্টা সন্ত্রাস—ওটাই যেন দুই পার্টির স্ট্র্যাটেজী হয়ে দাঁড়াল। রাষ্ট্রপতির শাসন, পরোক্ষ কংগ্রেসী শাসন ইচ্ছাকৃতভাবেই যেন দুই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে হানাহানি বৃদ্ধি করতে চাইল। অপরদিকে সি.পি.আই দুই কমিউনিস্ট পার্টির সংঘর্ষ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে দর্শকের আসনে থেকেছে। চাকদহে সি.পি.আই (এম)-এর তৎকালীন রাজনীতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ—

(ক) ৯.২.৭১ তারিখে চাকদহের কিছু সি.পি.আই (এম) কর্মী নেতাজী সুভাষ রোডের বাসিন্দা জনৈক স্বপন বিশ্বাসকে সি.পি.আই (এম) পার্টির সমর্থক না হওয়ার সুবাদে তার বাড়ি থেকে জবরদস্তি করে ধরে নিয়ে পাবনা কলোনীর দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

(খ) ১৫.৩.৭১ তারিখে চাকদহের সি.পি.আই (এম) কর্মী গোপাল চ্যাটার্জী, দুলাল ঘোষ, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, ষষ্ঠীচরণ দাস প্রমুখ দিঘোরা-র জনৈক কর্মকার তারাপদ রায়ের দোকানে গিয়ে মারধোর করে। লোকটি নবকংগ্রেস-এর সমর্থক ছিল।

(গ) ৫.৪.৭১ তারিখে সন্ধ্যায় চাকদহের সি.পি.আই (এম) কর্মীরা পাবনা কলোনীর বাসিন্দা জনৈক প্রবীর দে-কে মারধোর করে। এই ঘটনার পরের কয়েক দিনে সি.পি.আই, সি.পি.আই (এম) ও কংগ্রেস (আর) পার্টিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণ হয়। চাকদহ-বনগাঁ রোডে মদন পাল নামে জনৈক সি.পি.আই (এম) কর্মী আক্রান্ত হয়। ৯.৪.৭১ তারিখে স্থানীয় সি.পি.আই (এম) নেতা ও কর্মীরা একটি ছোট মিছিল বার করে সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদ করে।

এইভাবে নদীয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় সত্তরের মার্চ-এপ্রিল থেকে কোথাও সি.পি.আই (এম) বনাম নব কংগ্রেস কিংবা কোথাও সি.পি.আই (এম) বনাম সি.পি.আই (এম-এল) সংঘর্ষ শুরু হয়। সি.পি.আই, সি.পি.আই (এম-এল)-এর প্রতি নিষ্ক্রিয় সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। সত্তর-এর মে মাসের চব্বিশ তারিখে চাকদহে সি.পি.আই.এম ও (এম-এল)-এর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, নকশালপন্থীদের তরফে লিফলেট প্রচার করা হয়— *'এই আক্রমণের বদলা নিতে হবে।'*

চাকদহে প্রথম 'নকশালপন্থী' হত্যা শুরু হয় সত্তরের সেপ্টেম্বর মাসে (২১.৯.৭০) নকশালপন্থী যুবক বিধান মজুমদারকে হত্যার মধ্য দিয়ে। এর 'বদলা' নিতে প্রায় পাঁচশ' (পুলিশের রেকর্ডের হিসাব অনুযায়ী) নকশালপন্থী কর্মী পরদিন লালপুর খেলার মাঠ থেকে শবদেহ নিয়ে মিছিল বার করে। শুধু তাই নয়, চাকদহ রেল স্টেশনে সি.পি.আই (এম) অফিসটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বিধান মজুমদারের স্মৃতিতে শহীদ বেদী তৈরী করা হয় এবং আয়োজিত শোকসভায় এই 'খুনের বদলা' হিসাবে খুনীদের (অর্থাৎ সি.পি.আই (এম) কর্মীদের) অন্ততঃ ছয়জনকে হত্যা করার আহ্বান জানানো হয়।

শুরু হয়ে যায় পাবস্পরিক বদলা নেওয়ার পালা। চাকদহের পাবনা কলোনীর বাসিন্দা বি.পি.এস.এফ কর্মী জনৈক তরুণ ভাদুড়ীকে প্রথমে কিডন্যাপ ও পরে ছোরা দিয়ে আঘাত করা হয় (২.১১.৭০), তিনি প্রাণে বেঁচে যান। এরপর ২৪.১১.৭০ তারিখে পুলিশ রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করা হয় চাকদহ থানার কাঁঠালপুলি এলাকার বাসিন্দা ও সি.পি.আই (এম) নেতা সৌরেন পাল-এর আত্মীয় কানু (অলোক) দে-র হত্যাকাণ্ড। তৎকালীন স্থানীয় নকশালপন্থী ছাত্রনেতা অরুণ ব্যানার্জীর মতে কানুকে হত্যাটি ছিল খুবই অবাঞ্ছিত। এই হত্যার পর পরই গোটা চাকদহে সি.পি.আই (এম)-এর তরফে প্রবল প্রতি আক্রমণ নেমে আসে শুধু সি.পি.আই (এম-এল)-এর ওপরেই নয়, প্রতিপক্ষ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির ওপরও বিশেষ করে নব কংগ্রেসের ওপর। ২৯.১০.৭০ তারিখের *দি স্টেটসম্যান* পত্রিকায় লেখা হয়—"The uncompromising hostility of the Naxalites towards the Marxists and the

latter's equally determined effort to counter it by retaliatory violence have accounted for over 42 murders in West Bengal over the past six months."[১৮]

সত্তরের নভেম্বর মাসে চাকদহে এই সি.পি.আই (এম)-এর ক্যাডারদের হাতেই নাটকীয় ভাবে ধরা পড়ে গ্রেপ্তার হন জেলা কমিটির সম্পাদক নাদু চ্যাটার্জী ও চাকদহের অন্যতম সি.পি.আই (এম-এল) কর্মী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিতাই সরকার। অসম্ভব প্রতিশোধপরায়ণ সি.পি.আই (এম) ক্যাডারদের হাতে এরপর একটি গণহত্যা হয় যেখানে পাঁচজন নকশালপন্থী যুবককে (তিনজন স্থানীয় ও বাকি দুজন চাকদহের বাইরের ছেলে) পিটিয়ে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে সি.পি.আই (এম)-এর প্রবীণ কর্মী নিরঞ্জন বসু, যুবকর্মী প্রদীপ দাস, এঁরাও নকশালপন্থী যুবকদের হাতে 'খতম' হন।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, যে সত্তর সালের ১৭ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী পদত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন গোটা রাজ্যে সি.পি.আই (এম)-এর রাজনীতিতে একটা মারমুখী ভাব এনেছিল। নদীয়া জেলায় যে যে এলাকায় সি.পি.আই (এম)-এর এতটুকু প্রাধান্য ছিল, সেখানেই তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে মরিয়া লড়াই-এর ভূমিকায় দেখা যায়। বিভিন্ন এলাকায় মিটিং বা অধিবেশনের মাধ্যমে একদিকে অন্যায়ভাবে নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেওয়ায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা ও অন্যদিকে কেবল অস্তিত্ব রক্ষাব তাগিদে সি.পি.আই (এম-এল) ও নব কংগ্রেসের সঙ্গে মোকাবিলায় নামা—এসবই এই সময়ে সি.পি.আই (এম)-এর প্রধান কার্যসূচী হয়ে দাঁড়ায়।

যেমন, সত্তরের ৬ই এপ্রিল রাণাঘাটে সি.পি.আই (এম)-এর জেলা সম্পাদক অমৃতেন্দু মুখার্জীর সভাপতিত্বে নদীয়া জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত পার্টি কর্মীদের নিয়ে (পুলিশের হিসাবমত ৮০০০) এক বিরাট মিটিং হয় যেখানে অন্যায়ভাবে সি.পি.আই (এম) কর্মীদের গ্রেপ্তার, বিধানসভা ভেঙে দেওয়া এবং মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় প্রমোদ দাশগুপ্ত ও রাণাঘাটের সি.পি.আই (এম) বিধায়ক গৌর কুণ্ডু প্রমুখ বক্তারা কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস এবং বিশেষ করে চাকদহ অঞ্চলের সি.পি.আই-এর বিরুদ্ধ সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন।

চাকদহ শহরে, আশ্চর্যজনকভাবে, সি.পি.আই ও বাংলা কংগ্রেস দলের নেতারা প্রায় প্রকাশ্যভাবেই সি.পি.আই (এম-এল) কর্মীদের মদত দিচ্ছিল। যেসময় সি.পি.আই (এম) কর্মীরা শহরের বিশেষ কয়েকটি এলাকায় যেমন কাঁঠালপুলি, পাবনা কলোনী ও খোসবাসমহল্লায়—চিহ্নিত সি.পি.আই (এম-এল) যুবকদের অভিভাবকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শাসানি দিচ্ছিল যে ছেলেদের এদের হাতে স্বেচ্ছায় তুলে না দিলে তাদের মৃতদেহ বাড়ির সামনে পড়ে থাকবে—সেসময় সি.পি.আই ও বাংলা কংগ্রেস সি.পি.আই (এম)-এর এই ব্যবহারের প্রতিবাদ জানায় (বিশেষ করে সত্তরের ডিসেম্বর মাস থেকে নকশালপন্থীদের ক্রমশঃ কোণঠাসা করে ফেলছিল সি.পি.আই (এম))। একাত্তর-এর মাঝামাঝি নাগাদ সি.পি.আই (এম-এল) কর্মীরা কেবল পিঠ বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে সি.পি.আই (এম)-

এর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।[১৯] এর প্রমাণ কেবল দুটি দিনের মধ্যে ২৮.৪.৭১ ও ২৯.৪.৭১-এ চাকদহ শহরে সি.পি.আই (এম) ও সি.পি.আই (এম-এল) পার্টির মধ্যে হত্যালীলায় দুপক্ষের মোট নয় জন কর্মীর মৃত্যু হয়।

প্রথম থেকেই এইভাবে নকশালপন্থী যুবকরা চক্রব্যূহে পড়ে। একদিকে যথেষ্ট পাকাপোক্ত সংগঠন গড়ে না তোলায় এলাকার ছেলেরা বেশীরভাগই শহরে আবদ্ধ থেকে চে গুয়েভারা লাইনে আসক্ত হয়ে পড়ে—'ব্যক্তিগত বীরত্ব অন্যদেরও বিপ্লবী কাজে আকৃষ্ট করবে' এই বিশ্বাসে, এবং ব্যক্তিগত বীরত্ব কেবল সি.পি.আই (এম) কর্মীদের হত্যার কাজেই ব্যবহৃত হল, অন্যদিকে চাকদহ এলাকার শক্তিশালী সি.পি.আই (এম) ভিতকে আক্রমণ করে সামাল দেওয়ার মতো গণসমর্থনের অভাব দেখা যায়। এই প্রবল প্রতিশ্রুতিমান যুবকদের সমস্ত আন্তরিকতা শেষমেষ সাধারণ লোকের কিছু সামাজিক উপকারসাধনেই ব্যয়িত হয় যেমন সুদ ব্যবসায়ীরা শহরাঞ্চলে সুদের কারবার বন্ধ করে কিংবা ডাক্তাররা তাঁদের দর্শনী কমিয়ে দেন—এই মাত্র। যদিও চাকদহের পূর্ব এলাকায় রাজারমাঠ, বা শ্রীনগর এলাকায় ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে কিছু সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল, কিন্তু তাও স্থায়িত্ব লাভ করেনি। এই 'অতিকথা'র নায়করা অবিলম্বেই ব্যূহবন্দী হয়ে পড়েন।

গোয়েন্দা পুলিশের চোখে নকশালবাড়ি আন্দোলন

আটষট্টি সাল থেকেই রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগ নকশালবাড়ির সমর্থনে গড়ে ওঠা বিপ্লবী কো-অর্ডিনেশন কমিটির কার্যকলাপ তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করছিল। পরবর্তীকালে সি.পি.আই (এম-এল) গড়ে ওঠার পর্ব থেকে পুলিশ শুধু ঘটনার বিবরণমূলক ব্যাখ্যাই দেয়নি, সামাজিক চেহারা ও শিক্ষা—এসব কিছুর বিশ্লেষণাত্মক নোট নিতে শুরু করে। বিশেষ করে, রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশের তৎকালীন উপপ্রধান রঞ্জিত গুপ্ত নকশালপন্থী কর্মীদের ও আন্দোলনের ওপর নিয়মিত পর্যবেক্ষণাত্মক নোট নিয়েছেন। এমন কি এই আন্দোলন দমন করার জন্য পুলিশী ব্যবস্থার পাশাপাশি কি কি প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার, তার ওপরেও তাঁর সুচিন্তিত মতামত পাওয়া গিয়েছে।

আটষট্টি সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর, একটি তারিখবিহীন নোট পাওয়া গিয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, 'সাধারণভাবে 'উগ্রপন্থীদের' রণনীতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক, (Political-cum-organisational), এবং (খ) ক্রিয়াপদ্ধতিমূলক (Operational)—দুটির ওপরেই তারা সমান জোর দেয়।

সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তারা কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর রাজনৈতিক প্রচার (intensive political propaganda) চালিয়ে তাদের বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চায় এবং গেরিলা যুদ্ধের কায়দার সঙ্গে পরিচিত করাতে চায়।

কাজের ক্ষেত্রে তাদের অব্যবহিত (immediate) পরিকল্পনা হল বিভিন্ন দল বা গ্রুপ তৈরী করে গেরিলা কায়দায় আকস্মিক আক্রমণের জন্য তৈরী হওয়া (to organise ambush

type operations and group actions)।

এরপর এই নোটে মাও ও চেগুয়েভারার বিপ্লবী যুদ্ধের লাইনের মধ্যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করে নকশালপন্থী (পুলিশের ভাষায় তখনও অব্দি 'উগ্রপন্থী' বা Ultra) যুবকদের ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য নিয়ে লেখা হয়েছে—"In communist phraseology, Mao's road to revolution is termed as "defensive" compared to Che Guevara's line which is supposed to be "offensive". While Mao lays emphasis primarily on politicalization of the peasant masses and then on Guerilla warfare, Che Guevara, on the mass at the beginning and gives more importance to outright armed oparations by small bands of devoted partisans. According to Che Guevara line, a band of revolutionaries with a handful of arms can start revolution from an inaccessible area and the revolution will take its own course. But Mao says the revolution can only be successful when the peasant masses are made politically conscious. Now the ultras have implicit faith in Maoism and precisely speaking the majority of the ultras in West Bengal are trying to go by Mao's line..."

এই নোটে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনে এই উগ্রপন্থীরা খুশীই হয়েছে এবং প্রফুল্ল ঘোষ ও কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন গড়ে তোলায় তাদের কোনো মাথাব্যথা বা উদ্যোগ নেই। শুধু তাই নয় যুক্তফ্রন্টের দলগুলির মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবিরও তারা বিরোধী, কারণ এই 'উগ্রপন্থীরা' তাদের প্রচারে ক্রমাগতই বলে আসছে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র একটি ধোঁকামাত্র (Parliamentary democracy is nothing but a hoax).

এই সাধারণ পর্যবেক্ষণ ছাড়াও, এই নোটে পুলিশ আরও জানিয়েছে যে আর্থিক দিক দিয়ে কিছু সুরাহার জন্য স্টেট কো-অর্ডিনেশন কমিটি একটি গোপন সার্কুলার (No. 1.1968)-এর মাধ্যমে ইউনিটগুলিকে লেভি আদায় ও তহবিল তৈরীর জন্য পদক্ষেপ নিতে বলেছে যার পঁচিশ শতাংশ যাবে জোনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে, পঞ্চাশ শতাংশ জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে এবং বাকী পঁচিশ শতাংশ যাবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে।[২০]

নদীয়া জেলার কথাও বিশেষ উল্লেখ লাভ করেছে এই পর্যবেক্ষণে, যেখানে বলা হয়েছে, এই জেলার বিশেষ কয়েকটি অংশে যেমন শান্তিপুর, নবদ্বীপ, চাকদহ ও কৃষ্ণনগর শহরে নকশালপন্থীরা বিশেষভাবে সক্রিয়।

এখানে উল্লেখ্য যে আটষট্টিতে, যখন এই নোটটি লেখা হয়, তখনও এই রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে অল্প কয়েকটি জেলাই মাওবাদীদের প্রভাবে প্রভাবিত ছিল, এবং নদীয়া ছিল সেই অল্প কয়েকটির মধ্যে অন্যতম। অন্য যে জেলাগুলিতে তখন নকশালপন্থীরা প্রভাব ছড়াচ্ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলি হল চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও বীরভূম। যে জেলাগুলি এই প্রভাবের থেকে তখনও অব্দি—প্রশাসনিক তৎপরতার পক্ষে মুক্ত ছিল, সেগুলি হল মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, কোচবিহার, মালদহ এবং

আশ্চর্যজনকভাবে মেদিনীপুর শহর ও খড়্গপুর বাদ দিয়ে বাকী মেদিনীপুর জেলা। অবশ্যই পুলিশের এই পর্যবেক্ষণ কতদূর তথ্যনির্ভর ছিল বলা শক্ত। গোটা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যেগুলির ছাত্রসমাজ ব্যাপকভাবে নকশালবাড়ির রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, এমন তেত্রিশটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নদীয়ার চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—যথা, কৃষ্ণনগর বিপ্রদাস পালচৌধুরী ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কৃষ্ণনগর কলেজ, বগুলার শ্রীকৃষ্ণ কলেজ ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আছে। এ তালিকা পুরোপুরি সঠিক বলে মনে হয় না (দ্রষ্টব্য ঃ *নদীয়ার কলেজের তালিকা, যেখানে মাওবাদীদের প্রভাবের হার দেওয়া আছে ঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-১০৭/সারণী-৩-২)।*

উনসত্তর সালের ১লা মে শহীদমিনারে সি.পি.আই (এম-এল) পার্টি ঘোষণার পর থেকে গোয়েন্দা পুলিশ যে ক্রমেই এই বিপ্লবী দলটি সম্পর্কে সাধারণ (Casual observation) পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারছে না তার প্রমাণ পাওয়া যায় পুলিশের একটি ছোট্ট 'নোট' দেখে। ১৭.৮.৬৯ তারিখে নদীয়ার নবদ্বীপে সি.পি.আই (এম-এল) পার্টির তরফে একটি মিছিল ডাকা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন ডেপুটি আই.জি নদীয়া জেলার পুলিশ সুপার-কে লেখা একটি চিঠিতে ভবিষ্যতে সি.পি.আই (এম-এল)-এর এইরকম মিটিং বা মিছিলের ছবি তুলে রাখতে অনুরোধ জানান—যাতে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মী বা নেতাদের বিরুদ্ধে সেগুলি কাজে লাগে।[২১]

সত্তর সালে ধীরে ধীরে পুলিশের ভাষ্যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের বিবর্ত্তন ও শক্তিবৃদ্ধির একটা ছবি ফুটে ওঠে। যেমন ৬.৩.৭০ তারিখে পুলিশ নোটে লেখা হয়—'উনসত্তরের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ অব্দিও দেখা গেছে নকশালপন্থী দলগুলি সাংগঠনিক প্রভাব বৃদ্ধিতে যথেষ্ট তৎপর। কিন্তু সত্তর সালের মার্চ মাস নাগাদ দেখা যাচ্ছে তারা শহর এবং গ্রামাঞ্চলে তাদের যথেষ্ট শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি করে ফেলেছে। এই সময় থেকে জেলা সাংগঠনিক কমিটি ও আঞ্চলিক সাংগঠনিক কমিটিগুলি জেলা কমিটি ও লোকাল কমিটিতে রূপান্তরিত হয়েছে। গুণগতভাবে সি.পি.আই (এম-এল) ক্রমশই সন্ত্রাসবাদী লাইনের দিকে ঝুঁকছে। গ্রামের ক্ষেত্রে তারা যেমন ছোট ছোট স্কোয়াড গড়ছে (অন্ধ্রে যেগুলিকে 'দলম' বলা হয়), শহরের ক্ষেত্রেও তেমনি তারা ছোট ছোট কার্যকরী ও দৃঢ়সংকল্প কর্মীদের নিয়ে স্কোয়াড গড়েছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, যে গ্রামাঞ্চলে এদের সাংগঠনিক বিস্তারে আর বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না, ক্যাডারদের মধ্যে আত্মসমালোচনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা সাধারণভাবে কাজে ব্যর্থতার লক্ষণ বলে ধরা হয়। যাই হোক, গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলে গোপন কাজকর্মের ওপর আরও বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে এবং আণ্ডারগ্রাউণ্ড কাজকর্ম তীব্রতর হচ্ছে।'

পুলিশ এরপরই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, কোনো সন্দেহ নেই যে সি.পি.আই (এম-এল), সাময়িক ভাবে হলেও নিশ্চিতভাবে মাওবাদী লাইন ছেড়ে চে গুয়েভারা লাইনের দিকে ঝুঁকছে কারণ গ্রামাঞ্চলে আরও বেশী ও ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক প্রচারে এরা আর

আগ্রহী নয়।

গ্রাম এলাকায় সি.পি.আই (এম-এল)-এর প্রভাবে বিস্তারে ব্যর্থতা এসেছে ধরে নিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ এর কারণ বিশ্লেষণ করছে এইভাবে, "If the CPI(M), CPI, SUC and RSP seize land by force, what can the CPI(M-L) cadres do but to plan murders of jotedars?" "But such murders also are not easy. Again when the rural poor hope to seize land by force along the lines of other political parties, why should they fall for the political line of Charu Mazumder? That is why, in the rural areas, Naxalite politicalization has not progressed and consequently secret terroristic thinking has hardened."[২২]

এইভাবে পুলিশ ক্রমশই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও তার কার্যকারিতা বিষয়ে মন্তব্য করতে এগিয়ে আসছে অর্থাৎ পুলিশের তরফে এই আশঙ্কাই প্রকাশ করা হয়েছে যে রাজনৈতিক দলগুলির কাজে যথেষ্ট পরিমাণে দূরদর্শিতার অভাবের জন্যই ভবিষ্যতে গ্রামগুলিতে নকশালপন্থার বীজ উপ্ত হতে পারে। "This trend of terrorism will be intensified in the near future. The progress in the land distribution should have been followed up by the Govt. by either proper organisation of credit, seeds, bullocks and ploughs--which has not been done. The Jotedar in the rural areas still weilds influence and power. He is not likely to co-operate with the rural poor by offering the usual credit and the loan of agricultural implements. This would not only cause frustrations but provide new issues of class hatred."[২৩]

সবশেষে পুলিশের এই রিপোর্টে প্রায় ভবিষ্যদ্বাণীর মত মন্তব্য করা হয়েছে যে, যদি দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হয় (মনে রাখতে হবে সত্তর সালের ৬ই মার্চ এই রিপোর্টটি লেখা হয়েছে এবং ওই মাসেরই ১৭ তারিখে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হয়। এই পতনের আগাম আভাসও গোয়েন্দা পুলিশের কাছে এসেছিল বলেই মনে হয়), তাহলে কিন্তু সি পি.আই (এম-এল)-এর পক্ষে ব্যাপক জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে তা হবে এক সুবর্ণ সুযোগ, কারণ সেক্ষেত্রে সি.পি.আই (এম)-ও সহিংস আন্দোলনের রাস্তায় যাবে এবং দুই পক্ষের ক্রিয়াপদ্ধতির মধ্যে কোন সীমারেখা টানা যাবে না।

পুলিশের এই উপসংহার যে বাস্তবে হুবহু ফলে গিয়েছিল তা এই অধ্যায়ের প্রথমাংশের আলোচনায় দেখা গেছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথার উল্লেখ থাকা দরকার, যে সত্তরের মাঝামাঝি সময় অব্দিও পুলিশের হিসাবমত শহুরে নকশালপন্থীদের মধ্যে চল্লিশ শতাংশ ছিল লুম্পেন শ্রেণীভুক্ত। পুলিশের বিশ্লেষণে নকশালপন্থীদের মধ্যে দুই শ্রেণীর কর্মী ছিল— এক, রাজনৈতিক, দুই অপরাধী। পুলিশ রিপোর্টে লেখা হয় যে, "It will be incorrect to describe the entire party as the CPI(M) do, as a body of anti-socials. There are idealists and ideologues in the CPI(M-L); they may be misguided but there may also be other misguided parties in India."[২৪]

২৫.৫.৭০ তারিখে স্বরাষ্ট্র সচিবকে লেখা একটি চিঠিতে পুলিশের তৎকালীন ডি.আই.জি নকশালপন্থীদের দ্বারা সৃষ্ট অরাজকতার সঠিক মোকাবিলার জন্য নির্দেশ চেয়ে পাঠাচ্ছেন। এই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে পুলিশ সরাসরি রাজনৈতিক স্তরে কি কি করণীয় সে ব্যাপারেও মতামত দিতে শুরু করেছে। মনে রাখতে হবে সময়টা ছিল পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পরে রাষ্ট্রপতি শাসন। সুতরাং এই সুযোগে প্রশাসনিক রাজনৈতিক স্তরেও যে পুলিশের ক্ষমতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

গোয়েন্দা উপপ্রধান তাঁর চিঠিতে নকশালপন্থাকে মোকাবিলার উপযোগী কিছু ব্যক্তিগত দাওয়াই ফরমাইশ করেছেন। যেমন, উদ্ধৃত করা যাক—"Purely police action, however, will not solve the problem. This movement is the reflection of a strong element of utter frustration in our socio-economic situation. Therefore, the socio-economic and the political situation will have to be dealt with by the Govt. in their entirety. Another point may also please be remembered–the CPI(M-L) started as a group splintering off from the CPI(M). The ranks of the CPI(M) are the main recruiting ground of the cadres of CPI(M-L) A posture of militancy is the most significant factor of the CPI(M) ideology. When such posture cannot be matched by them by action naturally erosion in the CPI(M) cadres occurs to the advantage of CPI(M-L)."

এরপর প্রতিষেধকের প্রসঙ্গ। 'সুতরাং আমাদের প্রধান প্রচেষ্টা হবে গ্রামের মানুষদের আমাদের দিকে টেনে আনা।' এখানে 'আমাদের দিকে' অর্থে নিশ্চয়ই পুলিশ প্রশাসন বা প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রকে বোঝাচ্ছে। এর কারণটা হল এই যেহেতু সি.পি.আই (এম-এল)-এর প্রধান কাজ হল গ্রামভিত্তিক এবং গ্রামে মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলা, সে কারণে গ্রামের ব্যাপক জনমত ও সমর্থন তৈরী করাই ছিল তাদের প্রয়োজন। কিন্তু গণসমর্থন না পেয়ে তারা স্ট্রাটেজী বদল করে গ্রামে গোপন শেলটার থেকে শ্রেণীশত্রু খতমের রাজনীতি শুরু করে। এই রাজনীতি চালাতে গেলেও গ্রামে সমর্থক শ্রেণীর দরকার, মাওবাদে যেমন বলা হয়েছে বিপ্লবীদের থাকতে হবে গ্রামীণ সমাজে এতই সহজ শ্রেণীবোধে যেন ব্যাপারটা দাঁড়ায় 'জলের মধ্যে মাছের ঘোরাফেরা'। অতএব পুলিশের যেটা করণীয় সেটা হল এমন ব্যবস্থা করা যাতে মাছগুলি আর জল না পায়। মূল চিঠি থেকে উদ্ধৃত করা গেল—"Naturally, therefore, our main effort should be to keep the people of the rural areas on our side. This is very necessary. Originally the CPI(M-L) strategy was to create "liberated" rural bases with mass participation. This required mass sympathy on the side of the CPI(M-L). When this was not possible the CPI(M-L) changed their strategy to killing of class enemies operating from the rural underground shelters. This also required sympathisers in the rural arena. The Maoist principle "fish in water" is a cardinal point of the strategy. It, therefore, stands to reason that with the mass support on

the side of the administration "fish" will have no "water"."

এরপর পুলিশ জল থেকে মাছগুলিকে কিভাবে ছেঁকে তোলা যায় তার কয়েকটি সম্ভাব্য উপায় দেখিয়েছে। যেমন (ক) দ্রুত ভূমি সংস্কার ও আইনী মারপ্যাঁচ এড়ানো, (খ) যে যে গ্রাম অঞ্চলে নকশালপন্থীরা সক্রিয়, সেই অঞ্চলগুলিতে Test relief ও gratuitious relief শুরু করা। (গ) বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় রাস্তা তৈরী করা ও কুয়ো বা পুকুর খনন করে দেওয়া, (ঘ) স্কুল ও কলেজগুলিতে খেলাধূলায় উৎসাহ দেওয়া, টেকনিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো তৈরী করা, (ঙ) আদিবাসী এলাকাগুলিতে জনসংযোগ বাড়ানো দরকার, প্রয়োজনে 'সাঁওতাল' ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করে। শিক্ষিত আদিবাসীদের জন্য চাকরীর ব্যবস্থা করা দরকার। ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার বিভাগ বা আদিবাসী কল্যাণ বিভাগে কর্মীসংখ্যা বাড়িয়ে আরও প্রসারিত করা যেতে পারে কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে, এবং (চ) পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসি অর্থাৎ প্রশাসনের—উভয়ের তরফেই 'প্রতিরোধ বাহিনী' গড়ে তোলা উচিত। পুরোপুরি রাজনৈতিক কাঠামোয় না হলেও এই প্রতিরোধ বাহিনীতে কংগ্রেসী ও বাম রাজনীতির কর্মীদের অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া উচিত হবে না।[২৫]

অতএব একাত্তরের শেষাশেষি জেলায় জেলায় ও শহরে শহরে যে 'এ্যান্টি-নকশাল স্কোয়াড' গড়ে উঠতে লাগল, সরাসরি সমাজবিরোধী ও একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সংযোগে, তার প্রধান ব্লু-প্রিন্ট কোথায় তৈরী হয়েছিল তা সহজবোধ্য।

৩০.৫.৭০ তারিখে নথিভুক্ত আরও একটি রিপোর্টে ওপরের বক্তব্যের সুরেই বলা হচ্ছে যে, "...From the Maoist strategy of 'Krishi Biplab' they switched over to individual terrorism, without mass participation of Che Guevara. At the present moment, the trend is towards the Latin American kind of extremism. There are reports of resistance to the action squads in village from the villagers themselves and that the cadres of CPI(M-L) at the rural bases are under severe strain. Therefore, Charu Majumder and his lieutenants have no alternative but to switch to less exacting and easier tasks of trouble-making in urban area."

গ্রামের বাসিন্দারা নকশালপন্থী কর্মীদের সামনে নিজেরাই প্রতিরোধ গড়ে তুলছিল ব্যাপকভাবে, সত্তর সালের মাঝামাঝি নাগাদই, এমন ঘটনা অন্ততঃ নদীয়া জেলার ক্ষেত্রে খুবই ব্যতিক্রমী। যেমন স্থানীয় কাগজ 'নবদ্বীপ বার্তা'য় একটি খবর প্রকাশিত হয় যে নদীয়ার কালীগঞ্জ গ্রামে জনৈক ছাত্র জোতদারদের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের উত্তেজিত করার চেষ্টায় উক্ত গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয় ও তাঁদের হাতে ছাত্রটি শেষ পর্যন্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শোনা যায় ছাত্রটি কলকাতার কোনো কলেজের ছাত্র।[২৬]

তবে কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর এলাকার নকশালপন্থী কর্মী বেণী সরকারের মতে পুলিশী নিপীড়ন যখন শুরু হয়, তখন গ্রামে কৃষকদের মধ্যে থেকে সংগঠন করা বা খতমকার্যে

তাদের নিয়ে স্কোয়াড গড়া, ইত্যাদি কাজ প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণনগর শহর-সংলগ্ন-এলাকার গ্রামগুলিতে যেমন যাত্রাপুর, ইছাপুর, নগরহাটা (যেসব গ্রামে বেশীরভাগই সাঁওতাল বা 'দুলে-বাগদী' জাতীয় নিম্নবর্গ চাষীদের বাস), দোগাছি, জালাল খালি অঞ্চলে শহরের অনেক ছেলে সংগঠন গড়তে যেতেন। কিন্তু এই সময়—অর্থাৎ সত্তরের মাঝামাঝি থেকে যার শুরু—কোনো কোনো গ্রামে আশ্রয় পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অগত্যা শহরে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিতে হয়। একসময় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যখন বেশ কিছু কর্মীর নামে পুরস্কার ধার্য হয়। বেণী সরকারের মতে গ্রামাঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে প্রতিরোধ না পেলেও আন্তরিকতাও পাননি। ভয়ই এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ প্রসঙ্গে নাদু চ্যাটার্জীর বক্তব্যও অনেকটা একইরকম। নদীয়াতে করিমপুর-তেহট্ট নাকাশীপাড়ায় বা আড়ংঘাটায় বেশ কিছু কৃষক বেরিয়ে এসেছিল আন্দোলনের স্বার্থে, কিন্তু চাকদহ বা হরিণঘাটা এলাকায় সংগঠন যথেষ্ট শক্তিশালী করে গড়ে তোলা গেলেও, খতমনীতি কার্যকর করার ব্যাপারে গরীব কৃষকদের অংশগ্রহণ স্বেচ্ছায় প্রায় ছিল না বললেই চলে। নাদু চ্যাটার্জী এক সময় নিজে গিয়েছিলেন হরিণঘাটা এলাকায় এক কুখ্যাত জোতদারকে 'খতম' করার জন্য স্থানীয় লোকদের প্ররোচিত করতে, কিন্তু 'খতমের' নির্ধারিত সময়ে তিনি নিজেই অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন বলে স্বীকার করেছেন।[২৭] এক্ষেত্রে একটা কথা দিনের আলোর মত সত্যি। নদীয়া জেলায় বহু সি.পি.আই (এম-এল) সংগঠক ও কর্মী, যাঁরা নাদু চ্যাটার্জী বা অজয় ভট্টাচার্যের মত গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে বা কালক্রমে বিক্ষোভকে সংগঠিত করে সি.পি.আই (এম-এল)-এ এসেছেন তাঁরা, বা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র যারা ছাত্রসুলভ প্রখর ঔচিত্যবোধ ও রাজনৈতিক আদর্শবোধ থেকে সি.পি.আই (এম-এল)-এ যোগ দিয়েছেন তাঁরা কেউই 'খতম'কার্যকে মন থেকে মেনে নিতে বা সহজেই কার্যকর করতে পারেননি। 'খতম' নীতির রূপায়ন ও কার্যকারিতা নিয়ে শুরু থেকেই সংগঠক ও কর্মীদের একাংশের মধ্যে সন্দেহ ছিলই বিশেষ করে 'শ্রেণীশত্রু'র রক্তে হাত রাঙাতে না পারলে কমিউনিস্ট হওয়াই বৃথা—এই ধারণাকে জনপ্রিয়করণের ফলে বহু নাবালক কমিউনিস্ট ফাঁদে পা দেয়—স্বেচ্ছাচারিতার, পুলিশের অথবা এ্যান্টি-নকশাল স্কোয়াডের।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকশালপন্থী ছাত্রনেতা অমল লাহিড়ী, যিনি নাদু চ্যাটার্জীর গ্রেপ্তারের পরে, অল্প সময়ের জন্য (৩/৪ মাস) জেলা কমিটির সম্পাদক হন, তাঁব স্মৃতিচারণাতেও ধরা পড়ে সে সময়ের এক অবিমৃষ্যকারী চেহারা। তাঁরই সহপাঠীদের মধ্যে একজন হরিণঘাটা এলাকায় একটি 'খতম' কার্যে অংশ নিয়ে অত্যুল্লাসের সঙ্গে রক্তাক্ত হাত তুলে ধরে বলেছিল, অবশেষে আজ কমিউনিস্ট হওয়া গেল। এগুলি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের টুকরো হলেও একটা সময়ের ইতিহাসের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরে বলেই মনে হয়। এ প্রসঙ্গে Frontier Anthology—থেকে বীরভূমের ওপর প্রকাশিত একটি রিপোর্টের একটি অংশ তুলে ধরলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"...A word about the composition of the ML activists. Most of them

are in their teens, many in fact in their early teens. A very high percentage of them belong to urban centres. Highly mobile and swift, their actions bear the stamp of meticulous planning and perfect training. Politics, unfortunately is not one of their strong points and serious, critical discussion with them is often dangerous. One thing which merits mention is that very few of the urban and rural poor have cared to join their ranks as activists. ...The communication gap between the ML on one hand and the general public on the other hand is great in as much as most annihilations remain unexplained until some wall-writings appear."[২৮]

বাস্তবিকই নদীয়ার শান্তিপুরের উপকণ্ঠে গোবিন্দপুর এলাকায় নকশালপন্থী যে সমস্ত কর্মীরা সক্রিয় ছিল তারা প্রায় সবাই ছিল কিশোর বয়সের—গড় বয়ঃতালিকা পনেরো থেকে কুড়ির মত। একমাত্র যে নেতা ছিল তার বয়স ছিল ছত্রিশ।[২৯]

উনিশশো সাতাত্তরের পরে কৃষ্ণনগর শহরে যে সব কর্মী নকশালবাড়ি আন্দোলনে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন সময়ে 'শহীদের' মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে একটি স্মারক পুস্তিকা বেরোয়। সেটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অধিকাংশই স্কুল অথবা কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই সি.পি.আই (এম-এল)-এর কর্মী হন।[৩০] সবচেয়ে বড়ো কথা এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই শহরে 'এ্যাকশন' করতে গিয়ে হয় পুলিশের হাতে, অথবা এ্যান্টি-নকশাল স্কোয়াডের হাতে, অথবা বোমা বিস্ফোরণে মারা যান।

নকশালবাড়ি আন্দোলন সম্পর্কে পুলিশের বিভিন্ন বিশ্লেষণ ছাড়াও আরও পর্যবেক্ষণ পাওয়া গেছে। সত্তর সালের ফাইল থেকে একটি খুবই কৌতূহলজনক চিঠি পাওয়া গিয়েছে, যেটি ইংরাজীতে লেখা এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে উদ্দেশ্য করে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ পাঠানো হয়েছিল। জনৈক আর.কে. গোস্বামী এই চিঠিতে কি করে নকশালপন্থাকে দমন করা যায়, সে নিয়ে তাঁর মতামত পাঠিয়েছিলেন। যেসব উপায় তিনি নির্দেশ করেছিলেন, সেগুলি সংক্ষেপে ছিল এই—

(ক) ভারত সরকারের উচিত ভারতে চীনা দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়া, তাহলেই নকশালপন্থীদের কাছে টাকা আসা বন্ধ হবে;

(খ) প্রতিটি স্কুলের প্রতিটি ক্লাসে একটি বা দুটি ছেলেকে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া উচিত যে (সহপাঠীদের মধ্যে) নকশালপন্থীদের সম্বন্ধে খবর থাকলেই পুলিশকে জানানো, কারণ ব্রিটিশ আমলে লেখক এই পদ্ধতি অনুসৃত হতে দেখেছেন;

(গ) পুলিশ বাহিনীতে একটি 'বিশেষ দল' থাকা উচিত যারা দেখামাত্রই দেওয়াল লিখনগুলি মুছে ফেলবে;

(ঘ) গভীর রাত্রে পুলিশের চররা এলাকার রাস্তা ও গলিগুলিতে টহল দিতে থাকবে, এবং যেসব ছেলেদের দেওয়ালে লিখতে দেখবে, তাদের গ্রেপ্তার করবে ও প্রভূত নির্যাতনে রাখবে, এবং

(ঙ) এগুলির যথাযথ রূপায়ণ নির্ভর করবে পুলিশের সদিচ্ছার ওপরে। লেখকের বিশ্বাস পুলিশের মধ্যে কিছু অংশ নকশালপন্থীদের সমর্থক।[৩১]

লেখা দরকার যে এই পত্রের লেখক এর আগেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দুটি অন্য সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। সেগুলি ছিল—"How to solve food problem" এবং "How to solve Refugee Problem." চিঠিটি পুলিশের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব পায়, এবং বাহাত্তরের পর থেকে উপরোক্ত (খ) নির্দেশটিকে কার্যকরীও করা হয়।

নদীয়ার 'লাল এলাকা' ঃ সত্তর থেকে বাহাত্তর

ভেবোডাঙ্গা-দাদুপুর-পূর্বস্থলী ঃ

এই এলাকা বর্ধমান ও নদীয়া জেলার সীমান্ত এলাকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। মধ্যে ভাগিরথী তার বুকে বেশ কয়েকটি গজিয়ে ওঠা চর নিয়ে দশ মাইলের মত এলাকা জুড়ে একটা ভৌগোলিক দুর্গমতার সৃষ্টি করেছিল, যার সুযোগ নিয়ে একদিকে পূর্বস্থলী থানা (বর্ধমান জেলা), অন্যদিকে নাকাশীপাড়া থানা (নদীয়া জেলা) এলাকায় নদীয়ার মাওপন্থী বিপ্লবীরা খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

এই এলাকার গ্রামগুলিতে কিভাবে নকশালবাড়ি আন্দোলনের আদর্শ ও ক্রমে সংগঠন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে নিয়ে আগের অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ঃ চতুর্থ অধ্যায়, পৃঃ ১৫০)। দাদুপুর-ভেবোডাঙ্গা এই সমস্ত গ্রাম গোয়ালা ঘোষ সম্প্রদায় অধ্যুষিত ছিল। সম্প্রদায়গত ভাবে এই গোয়ালারা জঙ্গী মনোভাবাপন্ন হয় এবং যে কোনোরকম দাঙ্গাহাঙ্গামায় এরা চিরকালই জড়িয়ে পড়তে অভ্যস্ত। এই বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকায় নকশালপন্থী সংগঠন তৈরী করতে যাঁরা অগ্রগণ্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে সড়ক, সাধনপাড়া, মুড়াগাছা, বহির্গাছি এলাকায় ছিলেন অরুণ মুখার্জী, দিলীপ চুনারী প্রমুখ এবং ভেবোডাঙ্গা, কাঁদোয়া, উড়ুমডাঙ্গা, তেঁতুলবেড়িয়া প্রমুখ গ্রামাঞ্চলে সক্রিয় ছিলেন মূলত সুবোধ মজুমদার।

একাত্তরের ফেব্রুয়ারীতে সাধনপাড়া এলাকাতে প্রথম খতম হন শ্যামাপদ দাস (সুদখোর-মহাজন)। এই খতমের পর ঐ এলাকার প্রধান সংগঠক অরুণ মুখার্জী ও দুখীরাম রায় (ইনিও কৃষ্ণনগর পলিটেকনিকের ছাত্র) কর্করিয়া ও কাশিয়াডাঙ্গা নামে দুটি গ্রামের মধ্যবর্ত্তী এলাকার একটি শিবমন্দির থেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন (১৯.৩.৭১)। কর্করিয়া গ্রামের সাগর দত্ত নামে এক নিম্নকৃষক পুলিশকে এই বিপ্লবীদের খবর জানিয়ে দেয়। পুলিশের হাতে নির্যাতনের ফলে এঁরা দুজনেই মারা যান (পুলিশের মান্থলি রিভিউ-তে ১৯.৩.৭১-এ এই দুজনের ধরা পড়ার তথ্য থাকলেও, মৃত্যুর খবর নেই)।

পুলিশী নির্যাতনে এই দুই নকশালপন্থী যুবকের মৃত্যু, ওই অঞ্চলের বেশ কিছু সাধারণ মানুষকে খুবই আবেগতাড়িত করে তুলেছিল বলে নকশালপন্থী কর্মী সুবোধ মজুমদার মনে করেন; কারণ বিশেষ করে এই ঘটনার মধ্যে দিয়েই ভেবোডাঙ্গা গ্রামের আটজন যুবক, অধিকাংশই নিরক্ষর —নকশালপন্থী রাজনীতিতে আসেন। তাদের অবশ্যই উদ্দেশ্য ছিল—

কোন বিপ্লবী কর্মকাণ্ড নয়—অরুণ-দুখিরামের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া। একমাসের মধ্যেই সাগর দত্তকে হত্যা করা হয়। এইভাবে তারা দেখান যে 'শহীদের মৃত্যুই সংগঠনের শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে।' ভেবোডাঙ্গা গ্রামের নিমাই ঘোষ, জনার্দন প্রামাণিক, অনাথবন্ধু ঘোষ, কাশীনাথ ঘোষ, নির্মল মণ্ডল, হেম মণ্ডল—এঁরা সবাই একাত্তরে নকশালপন্থী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হলেন। ১৪.৭.৭১ তারিখে মুড়াগাছার সি.পি.আই (এম) নেতা পাঁচুগোপাল ব্যানার্জীর ওপর হামলা করা হয়। মুড়াগাছায় সে সময়ে 'এ্যাকশন স্কোয়াডে'র কাজকর্ম চালাচ্ছিলেন বুলি সিংহ রায়, শুভ্রাংশু ঘোষ, দিলীপ চুনারী প্রমুখ। এই ঘটনার দুদিন পরেই কৃষ্ণনগরে শুভ্রাংশু ঘোষ ধরা পড়েন।

একই সঙ্গে দাদুপুর গ্রামের নকশালপন্থী সমর্থক হিসাবে পরিচিত অতুল দাস-এর বাড়িকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণনগর এ্যাকশন স্কোয়াডের নেতা বুলি সিংহ রায় কিছু গ্রামীণ যুবককে নিয়ে গেরিলা স্কোয়াড বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। বৈদ্যনাথ ঘোষ, চরণ ঘোষ, (নিরক্ষর ক্ষেতমজুর) অনিল ঘোষ, নিত্য সেন, হারু ব্যানার্জী (সড়ক), রবি সাঁতরা, সাধন রায়, ধর্মদাস ঘোষ, প্রাণ ঘোষ—এঁদের নিয়ে দাদুপুর এলাকায় একটি 'এ্যাকশন স্কোয়াড' গড়ে উঠেছিল, যারা পরপর কয়েকটি খতমকার্য সম্পন্ন করেছিল। প্রথমটি হয় ঃ ২৫.৪.৭১ তারিখে কাশিয়াডাঙ্গার জনৈক বুড়ো (বিশ্বনাথ) ঘোষের হত্যা। এ্যাকশন স্কোয়াডের আসল লক্ষ্য কেষ্ট দত্ত বা কৃষ্ণ সুন্দর দত্ত (পুলিশ কর্মী) পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরপর ১৩.১১.৭১ তাবিখে দাদুপুর গ্রামের জনৈক চিন্তামণি ঘোষ খতম হয়। এই খতমটি হয় পুরোপুরি ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানোর জন্য।[৩২] তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে পিস্তল ছিনতাই-এর। ১৫.১০.৭১ তারিখে দাদুপুর গ্রামের জনৈক সমরেন্দ্রনাথ রায়-এর পিস্তলটি ছিনতাই হয়।

দাদুপুরের ঘটনাগুলি থেকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার—এক, খুব বিক্ষিপ্ত কয়েকটি 'এ্যাকশন' ছাড়া এ অঞ্চলে আর কিছু হয়নি। দুই, এই 'এ্যাকশনগুলি'ও পুরোপুরি ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্য হয়েছিল—প্রথমটি বাদ দিয়ে। প্রথমটির ক্ষেত্রেও একটি নিরপরাধ লোক 'খতম' হয়। তিন, এই 'এ্যাকশন' গুলিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে চরণ ঘোষ নামে একজন দরিদ্র নিরক্ষর গ্রামীণ কিশোর ছিল, সে গ্রামে অবস্থাপন্ন বাড়িতে গরু চরানো ও চাকর-বাকরের কাজ করত। পুলিশের কাছে তার বিবরণ অনুসারে "In the month of April, Baidyanath asked me to join Naxalite party. He also told me that his party would also arrange for my food and other amenities if I would join Naxalite party. At the instigation of Baidyanath I started my activities along with them." 'খতমের' রাজনীতির জন্য এই অনিচ্ছুক শ্রমদান গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্রের অন্য আরেকটি চেহারাকে ফুটিয়ে তোলে।

ইতিমধ্যে আরও দুটি ঘটনা ঘটে, সেগুলি নকশালপন্থী কর্মীদের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রভাব ছড়ায়। প্রথমটি ছিল, ভেবোডাঙ্গা গ্রামের সঙ্গে কিনুপোঁতা-তেঁতুলবেড়িয়ার মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই সময় সি.পি.আই (এম-এল) কর্মীরা যথেষ্ট প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই দুই দলের মধ্যে মধ্যস্থতা করে দাঙ্গা থামায়। এই ঘটনা আশপাশের গ্রামে খুবই

আলোড়ন ছড়ায়। পরবর্ত্তীতে নভেম্বর মাসের তেইশ তারিখে কিনুপোঁতার দাঙ্গায় প্রধান উসকানিদাতা হিসাবে আমির আলি শেখকে হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ধর্মদায়। মন্টু মোদক নামে একজন ধনী রেশন ডীলারকে পুলিশের দালাল সন্দেহে 'খতম' করা হয় প্রায় প্রমাণ ছাড়াই। এই হত্যাটি জনমানসিকতায় নকশালপন্থীদের সম্বন্ধে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

এই এলাকায়, পরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে ১৯৭১-এর ২১শে অক্টোবর বত্রিশজন নকশালপন্থীদের একটি স্কোয়াড সড়ক, সাধনপাড়া, কাঁদোয়া, বহির্গাছি এলাকার কয়েকজন জোতদারদের যেমন, সংকর্ষন ব্যানার্জী, দিবাকর ব্যানার্জী, ধনঞ্জয় ব্যানার্জী (সড়ক গ্রামের), পঞ্চানন বিশ্বাস, কিশোরী মজুমদার, ভক্ত দাস, শীতল মজুমদার (কাঁদোয়া গ্রামের) বাড়ি থেকে দশটি বন্দুক ছিনতাই করে। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাস ছড়ায়। পুলিশ রেকর্ডেও দেখা যাচ্ছে যে, ২১.৯.৭১ তারিখে গ্রাম সড়ক, থানা কোতোযালী থেকে নকশালপন্থীরা তিনটি বন্দুক এবং বারো রাউণ্ড কার্তুজ লুট করে। ভেবোডাঙ্গা, কর্করিয়া, উদুমডাঙ্গা, বহির্গাছি, সড়ক, সাধনপাড়া—এই গ্রামগুলিতে রাতারাতি সি.আর.পি ক্যাম্প বসে যায়। গ্রামের পুরুষরা বাড়িতে রাত্রিবাস করা ছেড়ে দেয়। এই সময়ের অন্যতম প্রধান নকশালপন্থী সুবোধ মজুমদার-এর কথায় ভেবোডাঙ্গা গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে প্রকাশ্যে নকশাল ক্যাম্প খোলা হয়, ছিনতাই করা অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখা হত, বিপ্লবীরা সবাই বন্দুক কাঁধে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াত। গোটা ভেবোডাঙ্গা গ্রাম নকশালবাড়ির সমর্থক হয়ে উঠেছিল, প্রতিটি বাড়িতে শেল্টার তৈরী ছিল। পুলিশ সে সময় স্টেনগান, গ্রেনেড, ইত্যাদি নিয়েও সত্তর-আশি জন দল না বেঁধে গ্রামে গ্রামে রেইড করতে ঢুকত না। পুলিশ আসার খবর পেলেই বিপ্লবীরা স্কুলের পিছনে বিস্তীর্ণ আখক্ষেতে ঢুকে পড়তো। অন্য সময় এরা ভাগিরথী পেরিয়ে রুকুনপুরের চর ও ওপারে চরকমলনগরের বিস্তীর্ণ বালির চড়ায় আশ্রয় নিত। পুলিশ সেদিকে যেতে সাহস করত না। বন্দুক লুঠের পর পর ভেবোডাঙ্গা-রুকুনপুরের সব পুরুষমানুষ রাতে চরে বাস করত। সেখানেও অনেকসময় গ্রামের লোকদের নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা হত। নদী পারাপারেও কোনো সমস্যা ছিল না। মাঝিরা নৌকা নিয়ে তৈরীই থাকত। মাঝিদের ওপরেও পুলিশী অত্যাচার নেমে আসে। তাদের নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে, মারধোর করে কিংবা খেয়া পারাপার বন্ধ করে দিয়ে পুলিশ মাঝিদের দমন করে।

এই চরে থাকাকালীনই পরপর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। এক, ২৪.৯.৭১ তারিখে কৃষ্ণনগর কোর্ট লকআপ থেকে এগার জন বিচারাধীন বন্দী পালাতে চেষ্টা করে। এদের মধ্যে শুভ্রাংশু ঘোষ পুলিশের গুলিতে মারা যায়। চারজন বন্দী ধরা পড়ে যায়। বাকি ছ জনের মধ্যে কয়েকজন সেই চরে এসে আশ্রয় নেয়। এই সময় বাইরের এবং স্থানীয় এলাকার সব মিলিয়ে প্রায় তিরিশজন সি.পি.আই (এম-এল) কর্মী চরেই 'শেল্টার' নিয়েছিলেন।

দুই, পূর্বস্থলী থানার তামাঘাটা গ্রামের কুখ্যাত সুদখোর মহাজন সুধীর রায় ও তার

সহযোগী দুলাল সেনকে খতমের জন্য উনিশ জনের একটি স্কোয়াড গঙ্গা পেরিয়ে 'এ্যাকশন' করতে যায়। এই অভিযানে ভেবোডাঙ্গায় মধ্যকৃষক পরিবারের ছেলে হেম মণ্ডল-এর মৃত্যু হয়।

তিন, দাদুপুরের সাধন রায়কে পুলিশের চর সন্দেহে 'খতম' করা হয় (৬.৮.৭২)। এই সময়ে কিন্তু এই 'বিপ্লবীরা' পুলিশের তাড়নায় ক্রমশই ব্যস্ত এবং প্রতিদিনই তাঁদের আশ্রয় পাল্টাতে হচ্ছে। লুঠ করা বন্দুকগুলির খোঁজে পুলিশ তখন হন্যে হয়ে ঘুরছে। ফলে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের অভাব এবং নিরাপত্তাহীনতাবোধ কয়েকজনের মধ্যে এনে দেয় আত্মসমর্পনের তাগিদ। বন্দুক লুঠের পর এই বিস্তীর্ণ এলাকায় পুলিশী তৎপরতার বিবরণ পুলিশের ভাষ্য থেকেই উদ্ধৃত করা গেল।

"There was a spurt of gun snatching incidents in Baro Kendua and Sarak belt during last Durga Puja time. Local Police immediately searched the localities but in vain. Later when violent incidents were reported from Purbasthali as well, the situation called for strong action. Both Nadia and Burdwan districts were told to hold joint raids in this border and having a joint conference on 19th October, the two districts raided jointly the affected villages. A large number of local suspects including supporters were arrested but the leading naxalites evaded arrests, nor the stolen firearms could be recovered. The activists moved across the inaccessible areas bound by Bhagirathi and the old river course (Chari Ganga) and continued to harrass the peaceful villagers."

"...The difficulty was in bringing force from the headquarters and reaching there in time. There was always a time lag and the miscreants got scent of advancing police team and shift their hideouts. Some of the local villagers rush out for informing them at the sight of the police party. In other cases, the miscreants have their own lookouts and keep watch on the movements of the raiding teams."[৩৩]

২৩ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখে রাজ্য পুলিশ থেকে দিল্লীর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম পাঠানো হচ্ছে যে, নদীয়া জেলার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্ভুক্ত দাউদপুর (দাদুপুর), পাঞ্চণীপুরাণ, উদয়পুর প্রভৃতি গ্রাম বাস্তবে 'উগ্রপন্থী'দের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এই অঞ্চলে পরপর ডাকাতি, ভয় দেখিয়ে অস্ত্র আদায় সবই চলছে কিন্তু পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করতে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না। পুলিশ জানে কোথায় এদের ঘাঁটি বা আশ্রয়স্থল—কিন্তু এ সত্বেও পুলিশ ব্যর্থ হচ্ছে।

বাহাত্তর আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই দৃঢ়মূল সংগঠন ক্রমশই দুর্বল হতে থাকে। '৭১-এর চর-এ থাকাকালীন ব্যাপক বন্যার ফলে বিপ্লবীদের ক্রমশঃ আত্মরক্ষায় মনোযোগী হয়ে উঠতে হয়। পার্টির ওপরতলার সঙ্গে যোগাযোগ তখন বিচ্ছিন্ন। বন্যার পর পর গ্রামগুলিতে অনাহার চলছে। ভেসে বেড়ানো নকশালপন্থী কর্মীরা একটানা প্রায় বাইশদিন না খেয়ে,

পুলিশের তাড়া সহ্য করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে সময় হয় আটাগুলে, বা ক্ষেত থেকে মটরশুঁটির ডগা তুলে বা আশপাশের সজনে গাছের পাতা সেদ্ধ করে পেট ভরাতে হত। বন্যার পর বাহাত্তরের শুরুতে এই নকশালপন্থী কর্মীরা ক্ষেতমজুরের কাজ করে পেট ভরাত। এই সময় বুলি রায় এসে এলাকা থেকে বহু কমরেডকে অন্য জায়গায় নিয়ে যান। পলাশীপাড়ার বিল্বমঙ্গল চ্যাটার্জী এই সময়ে নদীয়া জেলার খুব নিরাপদ 'শেল্টার' হিসাবে এই অঞ্চলের বহু বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন। প্রায় 'ভাসমান' জীবন নিয়ে নদীয়া-বর্ধমান সীমান্তে তখন জনাপাঁচেক সি.পি.আই (এম-এল) কর্মী কেবলমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে বিপর্যস্ত। অন্যদিকে একাত্তরের নভেম্বর মাসে, দাদুপুরের চিন্তামণি ঘোষের 'খতমের' পর সেখানকার নকশালপন্থী কর্মীরা ঝাউডাঙ্গা-মেরতলাচর ও সাধুগঞ্জ চর এলাকায় আশ্রয় নেয়। এই এলাকাগুলি পূর্বস্থলী থানার অন্তর্ভুক্ত। এই সময় অনাথবন্ধু ঘোষ গোটপাড়া-শিকড়েগাছি গ্রামে পুলিশ রেইডের ফলে গ্রেপ্তার হয়ে যান। ফলে কুলবনের চরে লুকিয়ে রাখা চারটি বন্দুকের খোঁজও পুলিশ পেয়ে যায়। পরপরই সাধনপাড়া এলাকা থেকে নিত্য সেন ও চরণ ঘোষ ধরা পড়ে। চরণ ঘোষের বিবৃতি অনুযায়ী এঁরা দুজনেই পুলিশের কাছে ধরা দেবার কথা ভাবছিলেন কারণ, নিরাপত্তাহীনতা ও আর্থিক দৈন্য। ৫.১২.৭২ তারিখে পুলিশকে দেওয়া চরণ ঘোষ ও নিত্য সেনের বিবৃতি থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করা গেল। চরণ ঘোষ—"When Nitya contacted me at village Sadhuganj he told me that his mother has arranged to surrender us before police through Gopal Bhattacharji. Myself and Nitya Sen were contemplating to surrender before police as we lost all connections with our party leaders viz. Bablu (বুলি সিংহ রায়) and Subodh Majumder and we also lost the charm of party work as we did not get any financial help which were assured by our leaders at the time of recruiting us in the party."

নিত্য সেনের বিবৃতিতেও (৬.১২.৭২) স্পষ্ট হয় যে বাহাত্তরের শেষাশেষি নদীয়ার নাকাশীপাড়া থানার অন্যতম প্রধান ঘাঁটি এলাকা কিভাবে ক্রমশই নিস্তেজ হতে থাকে। "After the departure of Bablu (বুলি সিংহ রায়—সাধন রায়কে খতমের পর এলাকা ছাড়েন), our cadres were disintegrated for want of proper leadership. Some of us of Bhebondanga who took shelter at Mertala Char left for their houses as they were reluctant to continue partywork any more. Baidyanath Ghosh, Rabi Santra, Ram, Nemai, Tapan Dalal and some others whose name I could not recollect were arrested by the Police. ...My mother Smt. Tulashi Das was maintaining touch with Gopal Bhattacharji for arranging our surrender. We were also eager to surrender as our party had no activity and there was none to guide us."[৩৪]

একাত্তরে লুঠ হওয়া বন্দুকগুলির অধিকাংশই পুলিশ উদ্ধার করে ফেলে। ২১.১২.৭১ তারিখে নাকাশীপাড়া থানার ধুবুলিয়া থেকে পুলিশ কাঁদোয়া অঞ্চলের সি.পি.আই (এম-

এল) কর্মী তপন দালালকে গ্রেপ্তার করে ও একটি পাইপগান, বার রাউণ্ড গুলি (.৩০৩ কার্তুজ) উদ্ধার করে। ১৬.৭.৭২ তারিখে ভেবোডাঙ্গার সি.পি.আই (এম-এল) কর্মী অনাথবন্ধু ঘোষ পুলিশের হাতে ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ একটি .৩০৩ রাইফেল উদ্ধার করে এবং পরদিনই অর্থাৎ ১৭.৭.৭২ তারিখে চরকমলপুর থেকে লুঠ হওয়া বন্দুকগুলির মধ্যে একটি ডি.বি.বি.এল ও একটি এস.বি.বি.এল বন্দুক উদ্ধার করে। চরণ ঘোষ ও নিত্য সেন পুলিশের কাছে ধরা পড়লে পুলিশ ৩.১২.৭২ তারিখে দুটি .৩০৩ রাইফেল ও ছত্রিশ রাউণ্ড কার্তুজ সাধনপাড়া থেকে, ১০.১২.৭২ তারিখে ওই একই জায়গা থেকে আরও তিনটি .১২ বোর ডি.বি.বি.এল বন্দুক ও তিনটি এস.বি.বি.এল বন্দুক উদ্ধার করে। এছাড়াও পলাশীপাড়ার বিল্বমঙ্গল চ্যাটার্জী, যিনি নকশালপন্থী বিপ্লবীদের 'শেল্টার' দেওয়ার পাশাপাশি অস্ত্র সরবরাহ করার কাজটাও করতেন, নিত্য সেনের বিবৃতির ফলে তাঁর বাড়িতেও পুলিশ হানা দিয়ে ৫.১২.৭২ ও ৬.১২.৭২ তারিখে প্রচুর কার্তুজ উদ্ধার করে। এই সময়ে বেশ কিছু অস্ত্র যে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধের সূত্রে এপারের নকশালপন্থী বিপ্লবীদের হাতে এসেছিল তা পুলিশের রেকর্ডে উল্লিখিত আছে। ১৫.৭.৭১ তারিখে কৃষ্ণনগর বাস স্ট্যাণ্ডে বাংলাদেশ মুক্তিফৌজের জনৈক সদস্যের কাছ থেকে একটি .৩০৩ রাইফেল ও কিছু কার্তুজ ছিনতাই হয়ে যায় বলে পুলিশ উল্লেখ করেছে।

এই সময় বাহাত্তরের জুলাই মাসে চারু মজুমদারের গ্রেপ্তার ও মৃত্যু ঘটছে। চতুর্দিকে বিপ্লবী কর্মীদের ওপর বিবিধ আক্রমণের চাপ ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে। কার্যত বাহাত্তরের শেষে নাকাশীপাড়া ও পূর্বস্থলী থানাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ব্যাপক ঘাঁটি অঞ্চল রাষ্ট্রশক্তির সামনে আত্মসমর্পণ করছে। এই অঞ্চলে বিপ্লবীদের মধ্যে মুখ্য নেতা হিসাবে দিলীপ চুনারী আগেই শান্তিপুরে চলে গেছেন সংগঠনের অন্য দায়িত্ব নিয়ে এবং একাত্তরেই তিনি তেহট্ট থেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। অন্য নেতা সুবোধ মজুমদারও বিভিন্ন বিভ্রান্তির মধ্যে অবশেষে চুয়াত্তর সালে নদীয়ার তাহেরপুর থেকে ধরা পড়েন।

আড়ংঘাটা অঞ্চল

রাণাঘাট ও আড়ংঘাটা একটাই বিপ্লবী লোকাল কমিটির অধীনে ছিল। এই দুটি এলাকার কাজকর্মকে প্রধানত শহর ও গ্রাম এলাকার কাজে ভাগ করা যায়। আড়ংঘাটা এলাকার অধীন নদীয়া জেলার এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ এক সময় মাওবাদী বিপ্লবীদের হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছিল। এর অন্যতম প্রধান একটি কারণ ছিল এই যে রাণাঘাট থানার পুলিশ, অভিযোগ পাওয়া যায়, যে নকশালপন্থী বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া রাখত।[৩৫] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে চুর্ণী নদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীর মিলিয়ে যুগল কিশোর অঞ্চল, আড়ংঘাটা অঞ্চল, আড়খিসমা অঞ্চল, বহিরগাছি (দলুয়াবাড়ি অংশ) অঞ্চল এবং কমলপুর—এই এলাকাগুলি নকশালপন্থীদের 'মুক্তাঞ্চলে' পরিণত হয়েছিল। এছাড়াও এদের প্রভাব বনগাঁ সীমান্ত অবধিও ব্যাপ্ত ছিল। আড়ংঘাটা এলাকার বিপ্লবী গেরিলাদের নদীয়া জেলার সবচেয়ে সংগঠিত ও জঙ্গী কমিটি

হিসাবে উল্লেখ করা হয়। নদীয়ার প্রথম জোতদার 'খতম' হয় এই এলাকায় (নগেন বিশ্বাস—১২.৩.৭০)। জেলার বহু নকশালপন্থী যুবক আড়ংঘাটায় গিয়ে কাজ করেছেন। শুধু নদীয়ার নয়, কলকাতার বেহালা, যাদবপুর বা বেলেঘাটা অঞ্চলের বহু বিপ্লবী কর্মী আড়ংঘাটায় এসে শেল্টার নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে পুনরায় বুলি সিংহ রায়-এর নাম উঠে আসে। নদীয়ার বিভিন্ন এলাকায় 'এ্যাকশন স্কোয়াডের' নেতা হিসাবে প্রশ্নাতীত দক্ষতায় 'খতম' কার্যে নেতৃত্ব দিতে দেখা গেছে এই যুবকটিকে, কখনও কৃষ্ণনগর শহরে, কখনও রাণাঘাট-আড়ংঘাটা এলাকায় আবার কখনও নাকাশীপাড়া থানা এলাকায়। আড়ংঘাটা এলাকার নকশালপন্থীদের কাজকর্ম মূলতঃ ছিল, এক—শ্রেণীশত্রু বা জোতদার খতম করা, দুই—ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বলপূর্বক অর্থ আদায় এবং তিন—অস্ত্র ছিনতাই, সেটা বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে অথবা পুলিশের কাছ থেকে। কিছু ব্যবসায়ী যেমন সবদলপুবের গোবিন্দ দে, বা কার্তিক মণ্ডল কিংবা আড়ংঘাটার মহাদেব সাহা নকশালপন্থীদের ভয়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়।

শ্রেণীশত্রু খতমের তালিকায় দেখা যায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (নদীয়ার মধ্যে) জোতদার ও ব্যবসাদার খুন হয় এই অঞ্চলে। সত্তরের ২০শে জুন হোসেনপুরের জোতদার ধূর্জটি প্রসাদ বিশ্বাসকে 'খতম' করা হয়। এই হত্যার বিবরণ জানিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই আড়ংঘাটায় লিফলেট বিলি করা হয়।

২২.১.৭১ তারিখে আঁইশমালির সরাফৎ আলি কারিকারকে 'খতম' করা হয়। এই ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। ৪.৫.৭১-এ আনন্দনগর এলাকায় রাধানাথ বিশ্বাসকে 'খতম' কবা হয়।

৯.৭.৭১ তারিখে আড়ংঘাটা সবদলপুর এলাকার জনৈক বটুলাল সাধুখাঁকে তাঁর দোকানে হত্যা করা হয়। এই লোকটি সুদেব ব্যবসা করত। ৩১.৭.৭১-এ হোসেনপুর গ্রামের সুশীল বিশ্বাসকে 'খতম' করা হয় এবং এই খতমকার্যে বস্তা গ্রামের জ্যোতিষ পাগলা নামে একজন হোমগার্ড প্রধান অংশ নেয়।

২৩.৮.৭১ তারিখে আড়ংঘাটার ধনী ব্যবসায়ী অজয় নন্দীকে 'খতম' করা হয়। অভিযোগ, এই লোকটির কাছ থেকে নকশালপন্থীরা আগে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করেছিল। এরপর আরও চল্লিশ হাজার টাকা দাবী করলে অজয় নন্দী তা দিতে অস্বীকার করায় আড়ংঘাটা স্টেশনে তাকে গুলি করে 'খতম' করা হয়।

২৬.৮.৭১-এ বায়াশপুরে জনৈক জোতদার সুনীতি রঞ্জন সরকারকে খতম করা হয়। *পুলিশ রিপোর্টে* এই লোকটির হত্যাকারীদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে—"The two suspected to be accused persons are known anti-social rowdies–one of whom was involved in a rape case and a dacoity case. Recently they have joined the Naxalites to gain their ulterior motive to procure arms."[৩৬]

এরপর ৩০.৯.৭১ তারিখে সবদলপুর এলাকার বাসিন্দা পার্থসারথী ঘোষকে আনন্দনগর এলাকায় হত্যা করা হয়। এছাড়া আড়ংঘাটার সি.পি.আই (এম) অফিসও আক্রমণ করা হয়

ও সুকুমার ভৌমিক ও শচীন বিশ্বাস নামে দুজন সি.পি.আই (এম) সদস্যকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডে এলাকার সি.পি.আই কর্মীদের যোগসাজস ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। আড়ংঘাটা এ্যাকশন স্কোয়াডের এই সমস্ত খতমকার্যে প্রায় একক নির্দেশ ও নেতৃত্ব দিয়েছেন কুমুদ সরকার। সহযোগী হিসাবে বুলি সিংহ রায়ের নামও পাওয়া যায়। সত্তর-উত্তর এই পর্যায়ে কিন্তু এলাকার প্রথমদিকের নকশালপন্থী রাজনীতির অন্যতম সংগঠন আনন্দনগরের ভবদেব হালদার ও আড়ংঘাটার মহানন্দ রায় ক্রমশই নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন (এঁদের সবার নামেই প্রশাসনের তরফে পাঁচশো টাকার পুরস্কার মূল্য ঘোষিত হয়েছিল)। আড়ংঘাটা এ্যাকশন স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য স্বপন সরকার-এর (কুমুদ সরকারের ভাইপো) বিবৃতি পড়লে জানা যায় যাদের মধ্যে দিয়ে মূলতঃ 'খতম' গুলি করানো হত—তারা সবাই 'নতুন' দীক্ষিত কর্মী ছিল। নকশাল কর্মীদের রেওয়াজ মতোই এলাকার সংগঠনের নীতি নির্ধারক বা গুরুত্বপূর্ণ কোন মিটিং-এ এই নতুন ছেলেদের কোন অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না। পুলিশ জানাচ্ছে—সাধারণভাবে কোন ঘটনা ঘটাবার মাত্র পনেরো-কুড়ি মিনিট আগে 'এ্যাকশনের' পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ক্যাডারদের জানানো হত। পুলিশের বিশ্লেষণে নকশালদের কাজকর্ম তাৎক্ষণিক এবং নেতিবাচক কেননা সুদূরপ্রসারী, ইতিবাচক কাজে পরিকল্পনা লাগে—"That is precisely why the naxals cannot attack any major target because such target require longer planning. That is why the CPI(ML) had selected the schools and colleges where it is easy to misbehave and decamp." (একাত্তরের পুলিশ ফাইল থেকে)।

এছাড়া আড়ংঘাটা এলাকায় অস্ত্র লুঠের ঘটনাও বহুল ঘটে। সত্তর-এর বিভিন্ন লেখায় চারু মজুমদার ক্রমশ গেরিলা যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার ওপর জোর দিচ্ছিলেন। *('ঘৃণা করুন, চূর্ণ করুন মধ্যপন্থাকে'—২৫ জুন ১৯৭০/দেশব্রতী, 'লাল এলাকা তৈরী করতে কী কী করতে হবে?' —১লা অক্টোবর ১৯৭০/দেশব্রতী, 'কৃষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কাজকে অগ্রাধিকার দিন'—১লা ডিসেম্বর, ১৯৭০)*। আড়ংঘাটার মাওবাদী বিপ্লবী কর্মীদের অন্যতম নেতা কুমুদ সরকার-এর ভাষ্য মত এই ইস্যুতে তাঁর সঙ্গে পার্টির মতবিরোধ হয়। যদিও পরে আড়ংঘাটা এলাকায় (গাংনাপুর হয়ে চব্বিশ পরগণার এরোলি অব্দি) চব্বিশটা বন্দুক লুঠ হয়। তবে এই বন্দুকগুলির অধিকাংশই লুঠ হয় বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। পুলিশের কাছ থেকে রাইফেল ছিনতাই হয়েছে খুবই কম।

কুমুদ সরকার এর কারণ এইভাবে দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিগতভাবে তিনি পুলিশ বাহিনীকে আঘাত হানার বিরোধী ছিলেন এই কারণে যে তাঁর মতে আড়ংঘাটার নকশালপন্থী সংগঠন এত জোরদার ছিল না সংগঠিত পুলিশী প্রত্যাঘাতকে সামলাতে পারবে। সেই হিসাবে গ্রামাঞ্চলে স্কুল কলেজের ওপর বা জাতীয় নেতাদের মূর্ত্তিভাঙার কাজেরও তিনি বিরোধী ছিলেন, কারণ এই জাতীয় কাজগুলি তাঁর মতে গ্রাম এলাকায় 'শেল্টার' পাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেয়। বাস্তবিকই শহরাঞ্চলেও সাধারণভাবে রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত-মনস্কতাকে এই ধরনের

ধ্বংসাত্মক কাজ যতখানি নকশালপন্থীদের প্রতি বিরূপ করে তোলে, তা আর অন্য কোনো কাজে হয়নি।

কিন্তু আড়ংঘাটা এলাকায় পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবী মাওবাদীদের যে গোপন আঁতাতের খবর পাওয়া যায়, তা এক হিসাবে অভিনব। কৌশলগত দিক দিয়ে বিপ্লবীদের পক্ষে এটা যে অত্যন্ত সুবিধাজনক হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। যেমন অভিযোগ এসেছিল যে হোসেনপুরের জোতদার ধূর্জটি বিশ্বাসকে 'খতম' করার আগে ওই গ্রামেরই বাসিন্দা হোমগার্ড মৃণাল বিশ্বাসের মাধ্যমে জনৈক আই.বি অফিসার-এর সঙ্গে নকশালপন্থীদের এই বোঝাপড়া হয়েছিল যে পুলিশ কোনো 'কেস' নিয়ে তদন্ত করবে না, বা দোষীদের গ্রেপ্তার করবে না, এবং বদলে নকশালপন্থীরাও কোনো পুলিশ 'খতম' করবে না। শুধু তাই নয়, এলাকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে টাকা আদায় করা হত, তার একটা বড় অংশ মৃণাল বিশ্বাসের মাধ্যমে পুলিশের কাছে পৌঁছে যেত। আড়ংঘাটা থানার জনৈক অফিসার-ইন-চার্জও এই গোপন আঁতাতের অংশীদার ছিল বলে অভিযোগ ওঠে।

শুধু রাজ্য পুলিশ নয়, কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনীর অন্যতম সি.আর.পি-ও অর্থের বিনিময়ে নকশালপন্থী কর্মীদের গ্রেপ্তারের পর বিনা কেসে ছেড়ে দিত বলে অভিযোগ উঠেছিল। আড়ংঘাটা এবং আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রাম জুড়ে নকশালপন্থীদের নিজস্ব বৃত্ত এত গভীর ভাবে ছড়িয়ে ছিল যে আড়ংঘাটার ডাক বিভাগের প্রধানও বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন বলে জানা যায়। সংগঠন যে কত দৃঢ়মূল ও ব্যাপক ছিল, তার প্রমাণ মেলে একটি তথ্য উল্লেখে, (ক) যে অজ্ঞাতনামা লেখকের চিঠিটি পুলিশ ফাইলে মিলেছে, তাতে দেখা যায় লেখক গোয়েন্দা প্রধানকে লিখছেন—আড়ংঘাটা এলাকায় নকশালপন্থীদের দমনে প্রশাসনিক কোনো পদক্ষেপ নিতে গেলে যা করা দরকার, তা হল, রাণাঘাট পুলিশ স্টেশনের প্রতিটি কর্মচারীকে সরিয়ে দেওয়া, এমনকি সদর ডিভিশনাল পুলিশ অফিসারকেও। এলাকার কোনো ব্যক্তিকেই বিশ্বাস করা যাবে না কারণ 'চব্বিশ ঘণ্টা নকশালপন্থীদের চোখ খোলা থাকে—রেলস্টেশন থেকে সবদলপুর পর্যন্ত, এমনকি রাস্তায় যেসব চার পাঁচ বছরের উলঙ্গ বাচ্চারা খেলাধূলা করে, তারাও বিড়া অথবা সবদলপুরের রাস্তায় কোনো অচেনা মুখ দেখলে নকশালপন্থীদের সাবধান করে দেয়'। "Their informing agency is very powerful. 24 hours they are posted from Rly. Stn. to Sabdalpur. Even the naked boys of five and six years playing by the roadside alert them if any unknown persons come at sabdalpur or Bira."[৩৭]

পুলিশের সঙ্গে বোঝাপড়ার এই নীতিতে আকস্মিক ছেদ পড়ে একাত্তরের শেষাশেষি (২১.১১.৭১) যখন নকশালপন্থী কর্মীরা আড়ংঘাটা স্টেশন থেকে ডাউন গেদে লোকালে উঠে দুজন কনস্টেবলের কাছ থেকে দুটি রাইফেল ছিনতাই করতে গিয়ে তাদের হত্যা করে। ফলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশী হানায় বন্দুক সহ বহু নকশালপন্থী পুলিশের কাছে ধরা পড়ে। কার্যতঃ একাত্তরের পর থেকে এই এলাকায় নকশালপন্থী কাজকর্ম প্রায় গুটিয়ে

আসে। বাহাত্তরের তেইশে ফেব্রুয়ারী কুমুদ সরকারও পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।

অস্ত্র লুঠের ক্ষেত্রে আড়ংঘাটা এলাকায় বেশ কয়েকটি ঘটনার কথা জানা যায়। যেমন, রাণাঘাট থানা এলাকার দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা মনোহর সরকারের বন্দুক সেই সময়ে ছিনিয়ে নেওয়া হয়, যখন তিনি সেটি রাণাঘাট থানায় জমা দেওয়ার জন্য আড়ংঘাটা স্টেশনের কাছে তাঁর দোকানে অপেক্ষা করছিলেন (৭ ৬.৭১)।

এছাড়া রাণাঘাটের কাছে হিজুলী ফরেস্ট অফিসারের বাংলোয় হানা দিয়ে তাঁর রাইফেলটি নকশালপন্থীরা ছিনতাই করে। হোসেনপুরের ভীষ্মদেব বিশ্বাসের বন্দুক ছিনতাই করা হয় (.১২ বোর লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ছিনতাই করা অস্ত্রগুলি কানাইপুর গ্রামে বা সবদলপুর গ্রামের নকশালপন্থী সমর্থকরা মাটির তলায় বা খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখত।

সারণী—৫.১

নদীয়া জেলায় একাত্তরের জুন মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত নকশালপন্থীদের দ্বারা বন্দুক ছিনতাই এর তালিকা

1.	04.06.71	1 D.B.B.L. Gun in Ranaghat P.S. area (Recovered on 30.8.71)
2.	07.06.71	1 D.B.B.L Gun in Ranaghat P. S. area (Recovered on 30.8.71)
3.	16.06.71	4 D.B.B.L. Gun in Ranaghat P.S. area (Recovered one on 21.9.71)
4.	17.06.71	1 D.B.B.L. Gun in Kotwali P.S. area
5.	06.07.71	1 Govt. Muskat at Plassey P.S. under Berhampore Court GRPS area.
6.	06.07.71	1 D.B.B.L. Gun at Merabazar under Kaliganj P.S. area.
7.	06.07.71	1 D.B.B.L. Gun in Mira Plassey under Kaliganj P.S. area.
8.	15.07.71	1 Rifle of Mukti Fauz in Kotwali P.S.
9.	27.09.71	2 S.B.B.L and 3 D.B.B.L guns in Nakashipara.
10.	27.09.71	2 S.B.B.L and 1 D.B.B.L guns in Kotwali P.S. area.
11.	15.10.71	One Pistol in Nakashipara P.S. area.
12.	24.10.71	One Govt. D.B.B.L gun from Forest Ranger Hijuli Ranaghat.
13.	07.11.71	1 D.B.B.L gun in Hanskhali P.S. area.
14.	21.11.71	2 Govt. Rifles were snatched away from 2 constables of Ranaghat P.S. after killing them in Ranaghat G.R P.S. area. (2 rifles were recovered subsequently).
15.	24.11.71	One Govt. rifle was snatched away from the RPF personnel in Ranaghat P.S. area

(পুলিশ রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত)

শিবপুর-চাঁদেরঘাট এলাকা

শিবপুর-চাঁদেরঘাট এলাকাও নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্ভুক্ত এমন একটি ভৌগোলিক অবস্থানে দাঁড়িয়েছিল যে জলঙ্গী নদী পেরিয়ে নাকাশীপাড়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে হয় চাপরা, নয় কৃষ্ণনগর শহর হয়ে ঘুরে যেতে হত। তাছাড়া এই অঞ্চলে বাসিন্দাদের মধ্যে তপশীলজাতিভুক্ত নিম্নবর্গের ভূমিহীন দিন মজুরদের সংখ্যাধিক্য থাকায় নদীয়ার নকশালপন্থীদের অন্যতম বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠতে শিবপুর-এর দেরী হয়নি। এখানকার অন্যতম 'বিপ্লবী' সংগঠক সমীর বিশ্বাস মনে করেন শিবপুর এলাকাতে প্রকৃত অর্থে মাওবাদী কাজকর্ম কিছুটা করা গিয়েছিল বলেই এখানে কৃষকদের মধ্যে আত্মনির্ভরতার চেতনা তৈরী হয়েছিল। শহর থেকে বিপ্লবী গেরিলারা এসে কৃষকদের শ্রেণীশত্রুর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবেন, তাদের হয়ে 'খতমের' কাজটিও করে দেবেন, এই প্রচলিত অভ্যাসের ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল শিবপুরে। শুধু 'খতম' সম্পন্ন করাই নয়, শিবপুর গ্রামে মাওবাদী কৃষক গেরিলারা জোতদারদের জমি দখল করে তা ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনের উদ্যোগও নিয়েছিল। এই ইতিবাচক উদ্যোগের দৃষ্টান্ত নদীয়াতে নকশালপন্থীদের ঘাঁটি বা শক্তিশালী এলাকা বলে চিহ্নিত স্থানগুলিতে আর হয়েছে বলে জানা নেই। আগের অধ্যায়ে (চতুর্থ অধ্যায়) আলোচিত হয়েছে যে কিভাবে শিবপুরের স্কুলে ছেলেরা অবসর সময়ে মাওবাদী লেখাগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করত। গ্রামে ঠাকুর তৈরীর কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে এই ছেলেরা গ্রামে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেছিল বলে সমীর বিশ্বাস—যিনি এই গ্রামে বিপ্লবী কাজকর্মের অন্যতম সংগঠক ছিলেন মনে করেন। তাঁর মতে, এই গ্রামে জনজাগরণের মাত্রা এতটাই উচ্চস্তরে ছিল যে, গ্রামের একপাশে পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্বেও বিপ্লবী কর্মীরা গ্রামেই থাকতে পারতেন। ২৮.৪.৭১ তারিখে রেকর্ড করা একটি পুলিশ রিপোর্টে দেখা যায় যে ২৬.৪.৭১ তারিখে প্রকাশ্যে ঢেঁড়া পিটিয়ে শিবপুর ষষ্ঠীতলা পাড়ায় একটি মিটিং-এ ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের জমি বিলি করার আলোচনা হয়, পুলিশের হিসাব মত প্রায় দু শ'জন লোক ওই মিটিং-এ উপস্থিত থাকে। বক্তারা গ্রামের মুচি, বাগ্দী এইসব নিম্নবর্গের মানুষ ও চাষীদের উদ্দেশ্যে জোতদারদের জমি ও সম্পত্তি দখল করার জন্য উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেয়—বিশেষ করে যেসব জোতদাররা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে অসীমারঞ্জন বিশ্বাস ও নিত্যানন্দ বিশ্বাস নামে দুজন জোতদার গ্রামে তাদের বাড়িঘর ফেলে রেখে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিল। গ্রামে এই সময় নজরদার বাহিনী তৈরী করা হয় যাতে কেউ সম্পত্তি সরিয়ে ফেলতে না পারে বা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে।

উক্ত মিটিং-এর সিদ্ধান্তমত ২৮.৪.৭১ তারিখে গ্রামের প্রায় দু শ'জন লোক অসীমারঞ্জন বিশ্বাস ও নিত্যানন্দ বিশ্বাসের বাড়ি আক্রমণ করে টাকা ও চালের বস্তা প্রভৃতি লুট করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, টাকা বা ধান লুট করা ছাড়া নকশালপন্থীরা কোনো ব্যক্তির গায়ে

হাত দেয়নি বা ক্ষতি করেনি। এই ঘটনার পরে পুলিশ সাতজনকে গ্রেপ্তার করে। শিবপুর গ্রামে শৌমিক বিশ্বাস নামে জনৈক নকশালপন্থী কর্মীর বাড়িতে থানা বসে, যাতে গ্রামে বহিরাগত আগন্তুকদের ওপর নজর রাখার কাজ করা যায়। পুলিশের রিপোর্টে লেখা হয়— "It revealed during enquiry that the Naxalites have set up a strong rural base in the area and they will create further trouble by launching armed peasant movement. In view of this a strong police camp may continue in the area to ensure arrest of the leaders and to keep close watch."

সমীর বিশ্বাসের বক্তব্যমতই গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও কৃষকদের প্রকাশ্য আক্রমণাত্মক কাজকর্মে কোন বাধা বা দ্বিধা আসেনি।

শিবপুরে বাইরের বহু নকশালপন্থী কর্মীরা গিয়ে কাজ করেছেন। কৃষ্ণনগরের নাদু চ্যাটার্জী বা মহিম চন্দ কিংবা শুভ্রাংশু ঘোষ এঁরা কোনো না কোনো সময় এখানে গিয়ে কাজ করেছেন। স্থানীয় যে সব যুবক মাওবাদী সংগঠন গড়ে তোলার কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গণপতি মণ্ডল (লেখাপড়া জানা একটি মধ্যকৃষক পরিবারের ছেলে, যে ঘরবাড়ি ছেড়ে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল), মনতোষ বিশ্বাস, করুণাসিন্ধু বিশ্বাস, হরিপদ বিশ্বাস, সুধীর কুমার বিশ্বাস, সন্ন্যাসী মণ্ডল, তারাপদ বিশ্বাস, প্রদোষ তরফদার, জগবন্ধু বিশ্বাস। লক্ষ্যণীয় যে এইভাবে শিবপুর গ্রাম উচ্চবর্ণীয় ও সম্পদশালী মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেও বহু যুবক মাওবাদী সংগঠনে উৎসাহিত ও লিপ্ত হয়। নিম্নবর্গীয় বাগ্দী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে প্রচণ্ড লড়াকু মানসিকতা নিয়ে আন্দোলনে যোগ দেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মেঘনাদ সর্দার, বিশ্বনাথ সর্দার, খোকন সর্দার প্রমুখ।

৭.৭.৭০ তারিখে শিবপুরের পাশের গ্রামে রাধানগরে জাহান আলি ঢাকী নামে এক কুখ্যাত সুদখোর মহাজনকে হত্যা করা হয়। একাত্তরের ৩১শে জানুয়ারী শিবপুর গ্রামের জনৈক প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক গোবিন্দকুমার মণ্ডলকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। ৯.৯.৭১ তারিখে শিবপুরের নিতাই বিশ্বাসকে খতম করা হয়।

শিবপুরের প্রধান নকশালপন্থী নেতা সমীর বিশ্বাস সত্তরের শেষাশেষি পুলিশের চাপে এলাকা ছেড়ে যান পলাশীর বালিটুঙ্গি গ্রামে। পলাশীতে এই সময় স্টেশন সংলগ্ন মীরাবাজার এলাকাতে বেশ কিছু যুবক নকশালপন্থী সংগঠন গড়ে তুলছিলেন। এরপর সত্তরেই পুলিশের কাছে ইনি গ্রেপ্তার হয়ে যান। কিন্তু তাঁর মতে, শিবপুর গ্রামে বিপ্লবী সংগঠন এত জোরদার ছিল যে নেতৃত্ব যখন জেলে সেই পর্যায়েও চাষীরা জোতদারদের হয়ে ক্ষেতে কাজ করতে অস্বীকার করে, তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করে এবং এগুলি করা হয় দীর্ঘসময়ের জন্য। কিন্তু গলদ রয়ে গিয়েছিল যেখানে এবং যে কারণে শিবপুরের এই জনসাধারণকে টিকিয়ে রাখা যায়নি সেটা হল একটা গ্রামকে কেন্দ্র করেই এই সংগঠন তীব্র হয়েছিল। বিপ্লবী সংগঠনকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়নি বলেই ব্যাপক পুলিশী নির্যাতনের মুখে শিবপুর-চাঁদের ঘাট ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

পলাশী মীরাবাজার এলাকা

নদীয়ার পলাশী রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকাটিকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই একটি বড় গঞ্জ বা ব্যবসায়িক কেন্দ্র আছে, যেখানে সত্তর সালের হিসাবে প্রায় দশ-বারো হাজার লোকের বাস ছিল। এলাকার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই ছিল 'আগরওয়ালা' —অর্থাৎ মাড়ওয়ারী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং এই এলাকার আর্থিক লেনদেনও ছিল উল্লেখযোগ্য। নদীয়া-মুর্শিদাবাদের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত পলাশী-মীরাবাজার যদিও কালীগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত (কালীগঞ্জ থেকে ১৮ কি.মি. দূরে) তেহট্ট থানা থেকেও এর দূরত্ব বেশী নয় (মধ্যে জলঙ্গী নদী প্রবাহিত)। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ছাড়াও এই এলাকায় বহু সম্পন্ন মধ্যবিত্তের বাস ছিল যাদের মধ্যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুকধারীর সংখ্যাও নগণ্য ছিল না।

সত্তর থেকে এই এলাকায় মাওপন্থী সংগঠন গড়ে তোলার তাগিদে কৃষ্ণনগর পলিটেকনিকের ছাত্র শুভ্রাংশু ঘোষ যাতায়াত শুরু করেন —মূলতঃ এই এলাকার রেল কোয়ার্টার্স সংলগ্ন কোয়ার্টারগুলিতে। কৃষ্ণনগরের আরও একজন নকশালকর্মী রাম ঘোষের নামও এই সূত্রে পাওয়া যায়। এলাকার যে যুবকরা নকশালপন্থী হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে জনৈক অভিজিৎ বসু ও পরিমল ঘোষের নামও উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও কুড়ি-একুশ জন স্থানীয় যুবক এই রাজনীতিতে সক্রিয় ছিল (যাদের মধ্যে 'ঘোষ' সম্প্রদায়ভুক্ত বেশ কিছু যুবক ছিল,যে সম্প্রদায়ের বিশেষ 'জঙ্গী' প্রবণতার কথা আগেই বলা হয়েছে)।

গোটা সত্তর জুড়ে এই এলাকায় সি.পি.আই.(এম-এল) পার্টির সমর্থনে দেওয়ালে দেওয়ালে রাজনৈতিক শ্লোগান লেখা বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা সংগ্রহ করা ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সন্ধান পাওয়া যায় না। বাস্তবিকই, পলাশী-মীরাবাজার এলাকা চিহ্নিত ছিল একশ্রেণীর যুবকদের রেলওয়াগন ভাঙ্গা বা অন্যান্য সম্পত্তি লুট করা —এইসব সমাজবিরোধী কাজকর্মের দ্বারা। সত্তরে পুলিশের নিজস্ব নোটে এমন মন্তব্য পাওয়া যায় যে এলাকার বাসিন্দাদের এইসব সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন অভিযোগ সত্ত্বেও স্থানীয় পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকত। অর্থাৎ পুলিশী দর্পণ অনুযায়ী এই সমাজবিরোধী যুবকরাই 'নকশাল'-এ রূপান্তরিত হয়, ফলে 'রাজনৈতিক' আন্দোলনটি যুবকদের চরিত্র পরিবর্ত্তিত না করে নিজের চরিত্রটিই পরিবর্ত্তিত করে। এ চিত্র বাস্তবানুগ হলেও মনে রাখা দরকার যে সত্তর সালে রাজনৈতিক তত্ত্বের পিছু হটার সময়ে, নকশালবাদী আন্দোলনের ব্যাপক চেহারাটাই তখন 'এ্যাকশনভিত্তিক' হয়ে পড়েছে। পলাশী এর ব্যতিক্রম হয়নি।

সত্তর সালের নভেম্বর থেকে এখানে শুরু হয় 'এ্যাকশন'। নভেম্বর মাসের পঁচিশ তারিখে নকশালপন্থীদের দাবি অনুয়ায়ী চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় মীরাবাজারের কাপড় ব্যবসায়ী ব্রিজমোহন আগরওয়ালা প্রকাশ্য দিবালোকে দোকানেই ছুরিকাহত হন। পুলিশ অভিজিৎ বসু ও পরিমল ঘোষকে গ্রেপ্তার করে। সাময়িক ভাবে এখানকার নকশালপন্থী কাজকর্মে

ছেদ পড়ে।

এই সময় শুভ্রাংশু ঘোষের নির্দেশে অভিজিৎ বসুর ভাই সত্যজিৎ বসু এলাকার নেতৃত্ব নেয় ও সংগঠনের কাজ শুরু করে। যেহেতু প্রথম থেকেই সংগঠনকারী যুবকদের শ্রেণীচরিত্র সন্দেহজনক ছিল সেকারণে অচিরেই তাদের কাজকর্ম এলাকার সাধারণ বাসিন্দাদের কাছে ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়ায়। পুলিশী রিপোর্টে স্থানীয় নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ পাওয়া যায় — নাকাশীপাড়া থানার সার্কেল ইন্সপেকটর ও কালীগঞ্জ থানার ও.সি.-কে বদলি করার জন্য পলাশীর বাসিন্দারা চাপ দিতে থাকে —এ তথ্যও পাওয়া যায়। মূলত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে 'ত্রাস' হয়ে ওঠা এই যুবকদের যে স্থানীয় পুলিশও সমীহ করত, গোয়েন্দা দপ্তর-এর রিপোর্ট থেকে এ তথ্য অনুমেয়।

একাত্তরের ১২-ই মে কালীগঞ্জ থানারপুলিশ জানকীনগর ক্রসিং এলাকায় জনৈক মানুল্লা শেখের গোডাউনে চোরাই রেলের সম্পত্তির তল্লাশী চালাতে গেলে প্রায় শ' পাঁচেক লোক পুলিশকে ঘিরে ধরে ও উপস্থিত কনস্টেবলের বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এর পর পরই একাত্তরের ৭ই জুলাই মীরাবাজার এলাকার অনন্ত কুমার মণ্ডল ও জগবন্ধু বিশ্বাসের বাড়ী থেকে দুটি বন্দুক ও কিছু কার্তুজ লুঠ হয়। আগের দিনই ৩৬৭ আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জার থেকে বিধুভূষণ চক্রবর্তী নামে জনৈক কনস্টেবলকে ছুরিকাঘাতে ঘায়েল করে তার মাস্কেটটি পলাশী স্টেশন থেকে হাতিয়ে নেওয়া হয়। ২৯.৭.৭১ তারিখে মীরাবাজারের বাসিন্দা শিশির ঘোষের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অশোক কুমার ঘোষ ও সুধাময় বিশ্বাস এই তিন ব্যক্তিকে 'নকশালপন্থী' যুবকরা হত্যা করে। পুলিশ রিপোর্টে কারণ হিসাবে দর্শানো হয়েছে বাড়ির মেয়েদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল মন্তব্য করার বিরোধিতা করার জন্যই এই হত্যা। 'নকশালপন্থী' যুবকদের দ্বারা কৃত বহু ধরণের প্রথাবিরোধিতার অভিযোগ থাকলেও মেয়েদের বিরুদ্ধে অশালিনতার অভিযোগ খুবই দুর্লভ, তবে প্রথম থেকেই পুলিশ রিপোর্টে এই এলাকার যুবকদের সমাজবিরোধী মস্তান হিসাবে চিহ্নিত করার কথাও স্মরণে রাখা দরকার। প্রকৃত ইতিহাস পুলিশ রিপোর্টের তথ্যের আড়ালে অনেক সময়ই ঢাকা পড়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত হত্যার ঘটনায় চিহ্নিত হত্যাকারীদের —যারা নাকি এলাকার সাধারণ মানুষেরও বিরাগভাজন ছিল —পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এই ঘটনার কদিন আগেই (২৫.৭.৭১) দেবগ্রামের জনৈক অবিনাশ অধিকারীর বাড়ি থেকে কুড়ি-পঁচিশ জন নকশালপন্থী যুবকের একটি দল 'মাও সে তুঙ'-এর নামে শ্লোগান তুলে পনের হাজার টাকা ডাকাতি করে নিয়ে যায়।

হরিণঘাটা ছিল নদীয়া জেলার আরেকটি এলাকা, যেখানে সি.পি.আই.(এম-এল)-এর নেতৃত্বে চলে কিছু জোতদার খতমের কার্যসূচী। খতম হয় সীতারাম সিংহ রায় (জোতদার ও সন্দেহভাজন পুলিশের চর), হাবরা-শ্রীকৃষ্ণপুরের বাসিন্দা ভোলামাস্টার, রাজবেরিয়ার আনন্দপুর এলাকার বাসিন্দা বিশ্বনাথ মালাকার ও হরিণঘাটার বনবিহারী পাল। মনে রাখা দরকার যে হরিণঘাটা এলাকায় সি.পি.আই.(এম)-র কৃষক সংগঠন ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী.

ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'খতম' নীতি পরিচালনা করা ছাড়া গণ উদ্যোগ তৈরীর কাজ বিন্দুমাত্র হয়নি। (পলাশী মীরাবাজার এবং হরিণঘাটার যাবতীয় সূত্র পুলিশ রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত)।

শস্যসম্ভবা পলিমাটি নিয়েছে চোরাবালির রূপ

নকশালপন্থার নাম নিয়ে ক্রমবর্ধমান স্বেচ্ছাচারিতার মূলে দায়ী ছিল সেই সময়। সত্তর সালের নভেম্বর মাসে নদীয়া জেলা সি.পি.আই.(এম-এল)-এর সম্পাদক ও অন্যতম সংগঠক নাদু চ্যাটার্জী চাকদহে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই জেলায় নকশালবাদী সংগঠন ভেঙ্গে পড়ে। এলাকাভিত্তিক কাজকর্মগুলি সবই এ্যাকশন স্কোয়াডের হাতে চলে যায়। জেলা সংগঠনের গুরু দায়িত্ব নেবার মত পরিণত নেতৃত্বের অভাবের চেয়েও বড় করে দেখা যায় তৎকালীন সুস্থিতির অভাব —যখন ক্রমশঃই আন্তঃপার্টি যোগাযোগের রাস্তাগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এলাকাভিত্তিক বীরত্বের একক সংগ্রামই গণসংগ্রামের স্থান নিচ্ছে। ফলে সত্তরের শেষাশেষি জেলা সংগঠনের নেতৃত্ব সুনির্দিষ্টভাবে কার হাতে অর্পিত হচ্ছে তা স্পষ্ট হয় না, এমনকি এ বিষয়ে পরস্পরবিরোধী মতামত মেলে।

যেমন, আড়ংঘাটার অন্যতম নকশালপন্থী নেতা কুমুদ সরকারের মতে নাদু চ্যাটার্জীর গ্রেপ্তারের পর কৃষ্ণনগরের শুভ্রাংশু ঘোষ অল্প কিছুদিনের জন্য জেলা সম্পাদক হন, পরে কল্যাণীতে আয়োজিত জেলা কমিটির মিটিং-এ বুলি সিংহ রায় ও কুমুদ সরকার যৌথভাবে এই দায়িত্ব পান। কিন্তু অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য ঘেঁটে জানা যাচ্ছে যে শুভ্রাংশু বা অন্যরা কোনদিনই জেলা সম্পাদকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হননি। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী ছাত্রনেতা অমল লাহিড়ী তিন-চারমাসের জন্য এই দায়িত্ব নেন। তারপর সরোজ দত্তর উপস্থিতিতে জেলা কমিটির মিটিং-এ এই দায়িত্ব পান কল্যাণীর অমরআদিত্য চৌধুরী। সত্তরের শেষাশেষি নদীয়া জেলা কমিটি যাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে এই নামগুলি ছিল —শুভ্রাংশু ঘোষ, সমীর বিশ্বাস, (শিবপুর), গোরা ভট্টাচার্য, অজয় ভট্টাচার্য, অজয় চৌধুরী (কল্যাণী), দুখিরাম রায় ও কলকাতার বিপ্লব ভট্টাচার্য।[৩৮] এই তালিকাটি অসম্পূর্ণ ও ঠিক নয় —এমন ধরে নিলেও বোঝা যায় যে কেবলমাত্র 'এ্যাকশন'-এর ওপর নির্ভর করেই গুরুত্বের তালিকায় নামগুলি উঠে এসেছিল। গোরা ভট্টাচার্যর মতো চিহ্নিত 'লুম্পেন' যদি সত্যিই জেলা কমিটির সদস্য হয়ে থাকে, তাহলে সত্তরের পর নদীয়া জেলায় মাওবাদী আন্দোলনের চেহারা কি হতে পারে তা অনুমান করা কঠিন নয়।

বাস্তবিকই শুভ্রাংশু ঘোষের বিবৃতিতেও দেখা যায় এই কথা স্বীকার করা হচ্ছে যে – "After the arrest of Nadu @ Soven Chatterjee, we do not follow any system in the party. The actions are being committed sporadically in unplanned manner."[৩৯] নদীয়ার নকশালপন্থীদের প্রভাবাধীন বিভিন্ন গ্রাম ও শহর এলাকায় সে সময় বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত বীরত্ব ও বাহাদুরির নিদর্শন ছড়ানো হচ্ছিল। কেবল ব্যক্তিগত আক্রোশ

চরিতার্থ করার জন্য যে 'খতম' নীতিকে কি ঢালাওভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

২৬.১০.৭১ তারিখে কৃষ্ণনগর কোতয়ালী থানার দোগাছি গ্রামে প্রায় জনাকুড়ি নকশালপন্থী যুবক ধারাল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জনৈক বরুণ গোস্বামীকে আক্রমণ ও হত্যা করে। এরপর তারা লোকটির পরিবারের বাকী সদস্যদেরও 'শ্রেণীশত্রু'-জ্ঞানে হত্যা করে ও বাসগৃহে আগুন লাগিয়ে দেয়। চলে যাওয়ার সময় তারা শ্লোগান দেয় 'বদলা নিলাম, নকশালবাড়ি লাল সেলাম।' বলা দরকার বরুণ গোস্বামীর স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পরিবারের বাকী সদস্যরা ছিল তার সাত, চার ও দুই বছর বয়সের তিন ছেলে —ভজন, মদন ও সুধন।[৪০]

নদীয়া জেলায় 'লুম্পেন' শ্রেণীর যুবকদের নকশালপন্থী কাজকর্মে অংশগ্রহণ মেদিনীপুর জেলার চেয়ে অনেক বেশী ছিল বলে সেখানকার বিপ্লবী কমল লাহিড়ী —একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন। নকশালবাড়ির কৃষকসংগ্রামের পর নতুন পথ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরানো ধরণের সব সংগঠনই অকেজো, সুতরাং সবকিছু ভেঙেচুরে নতুনভাবে গড়তে হবে এই তত্ত্বকে খাড়া করতে গিয়ে বিচারবুদ্ধিহীন স্বতঃস্ফূর্ততার খেলায় মাতল ছাত্রযুবকদের দল। শ্রেণীশত্রু 'খতমের' রাজনীতির চেহারা বদলিয়ে হয়ে দাঁড়াল ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি। গোটা সত্তর এমনকি আশির দশকের অনেকটা জুড়েই নদীয়াতে শুরু হয় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। সত্তরের শুরুতে শহরগুলিতে ব্যাপকভাবে স্কুল কলেজগুলিতে আক্রমণ চলে, শিক্ষাব্যবস্থাকে অসার প্রতিপন্ন করার জন্য নৈরাজ্যবাদী কাজকর্ম উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষা ভণ্ডুল করা, লেবরেটরী ভাঙচুর করা, বোমা ফেলা, স্কুলবাস পুড়িয়ে দেওয়া —এসবই চলে 'মাও সে তুঙ'-এর নামে শ্লোগান তুলে। কৃষ্ণনগর দু-একটি স্কুলের ছাত্রদের তরফে নকশালবাদের সপক্ষে কিছু কার্যকলাপ দেখা গিয়েছিল।[৪১] কিন্তু যখন পলিটেকনিকের এস.এফ. সমর্থক ছাত্র প্রশান্ত সরকারকে কেবল পরীক্ষা বয়কট না করার জন্য প্রকাশ্য রাস্তায় তার সহপাঠীরা খুন করে (২১.৯.৭০)। সেই ঘটনা গোটা শহরে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

একাত্তরের মধ্যপর্ব থেকে নকশালপন্থী আন্দোলন চোরাবালির গর্ভে পড়ে। মূর্ত্তিভাঙ্গা প্রসঙ্গে পূর্ণর দলিল প্রথম যখন নদীয়ার সাধারণ নকশালপন্থী কর্মীদের কাছে পৌছায় তখন সহানুভূতি ও সমর্থন পায়। কিন্তু একাত্তরের পার্টির রাজ্য কমিটিব মিটিং-এ কৌশিক ব্যানার্জী ও আরও অনেকে সুশীতল রায় চৌধুরীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করায় নদীয়াতেও এই দলিলের তীব্র বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়। এর পর পর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে সি.পি.আই.(এম-এল) নেতৃত্বের মধ্যেও বিতর্ক তৈরী হয়। মূলতঃ অসীম চ্যাটার্জীর উদ্যোগে এই বিতর্ক ওঠে, এবং কল্যাণীর অন্যতম তাত্ত্বিক নকশালপন্থী কর্মী অমর আদিত্য চৌধুরীর সহযোগে 'অশোক' ছদ্মনামে এই দলিলটি প্রকাশিত হয়। ইয়াহিয়া খাঁকে 'জাতীয় বুর্জোয়া' আখ্যা দিয়ে পাকিস্তানের এই গৃহযুদ্ধকে মূলতঃ এই ভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চর হিসাবে মুজিবর রহমান জাতীয় বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে অন্যায়

যুদ্ধে লিপ্ত। ভারত সরকার এই যুদ্ধে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। কিন্তু যেহেতু চীন ইয়াহিয়া খাঁকে সমর্থন করছে সুতরাং ভারতের মুজিবকে সাহায্য দান অন্তর্ঘাতের চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব সি.পি.আই.(এম-এল)-এর দায়িত্ব ইয়াহিয়া খাঁকে সমর্থন করা ও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অঙ্গ হিসাবে পুলিশ ও মিলিটারির ওপর আক্রমণ হানা।

পাশাপাশি সি.পি.আই.(এম)-এর পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সাহায্যদান ও পাকিস্তানকে চীনের সমর্থন জ্ঞাপনকে সমালোচনা করা হয়। ১২.১২.৭১ তারিখে কলকাতায় একটি প্রকাশ্য মিটিং-এ প্রমোদ দাশগুপ্ত বলছেন —"পিকিং রেডিও বলছে ভারত পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উসকানি দিয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক কথা নয়। পূর্ব বাংলার মানুষ নিজেরাই পাক জঙ্গীশাহীর কবল থেকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য ১৮৫৮ সাল থেকে সংগ্রাম করছে।" বাংলাদেশ তার সংগ্রামে ভারতের সাহায্য নেওয়ার জন্য চীনের সমালোচনার প্রসঙ্গে শ্রী দাশগুপ্ত বলেন —"এর মধ্যে দোষ কোথায়? চীনও তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানকে পরাজিত করার জন্য আমেরিকার সাহায্য নিয়েছিল"। জ্যোতি বসুও বাংলাদেশের ব্যাপারে রাশিয়ার ভূমিকার সপ্রশংস উল্লেখ করেন। (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা. ১৩.১২.৭১, পৃষ্ঠা —৩)

শুধু পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ নিয়েই নয়, ধীরে ধীরে খতমের রাজনীতি ও গণসংগঠন বর্জন —সব ইস্যু নিয়েই অসীম চ্যাটার্জী চারু মজুমদারের তত্ত্বের বিরোধিতা করতে শুরু করেন। নদীয়াতে নকশালপন্থী কর্মীদের মধ্যে তখন অর্ন্তদ্বন্দ্ব, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও গোষ্ঠী বিভাজনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। নদীয়ার কর্মীদের অধিকাংশই এসময় অসীমপন্থী হয়ে দাঁড়ায় যেমন শুভ্রাংশু ঘোষ, রমেন সাহা, বুলি সিংহ রায়, অজয় চৌধুরী, অমর আদিত্য চৌধুরী প্রমুখ। অন্যদিকে নদীয়ায় কর্মরত কলকাতার কিছু নকশালপন্থী যুবক যেমন কাজল, প্রণব ভট্টাচার্য কিংবা হরিণঘাটার সুজিত, জাগুলীর সুশীল মজুমদার এবং ভেবোডাঙ্গার সুবোধ মজুমদার ও বিপুল প্রামাণিক—এরা তখনও চারু মজুমদারের তত্ত্বকে সমর্থন জানিয়ে যান। বাহাত্তরে চারু মজুমদারের গ্রেপ্তার ও মৃত্যুর পর এই গোষ্ঠী বিভাজন তীব্রতর হয় মহাদেব মুখার্জীর হস্তক্ষেপে —(যিনি শান্তিপুরের ছেলে ছিলেন এবং প্রথম জীবনে এই এলাকার ট্রেনে হকার ছিলেন) যিনি চীনে দশম পার্টি কংগ্রেসে লিন পিয়াও-এর ভাবমূর্ত্তি নাকচ হওয়ার পর সি.পি.আই.(এম-এল) পার্টিতে লিন সমর্থক ও লিন বিরোধী গোষ্ঠীতন্ত্রের জন্ম দিলেন। নদীয়ার সুবোধ মজুমদার বা বিপুল প্রামাণিক, সামগ্রিক ভাঙনের এই পর্বে মহাদেব মুখার্জীর নেতৃত্বকে মেনে লিনপন্থী চারুগোষ্ঠীর অনুগামী হন। বিপুল প্রামাণিক — (যিনি পরবর্ত্তীতে সি.পি.আই.(এম-এল) লিবারেশন গোষ্ঠীর অনুগামী) মনে করেন এই পার্টি বিভাজন মূলতঃ কেন তা সঠিক না জেনেই বিতর্ক ও বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন তিনি। জানার কোন উপায়ও ছিল না। পার্টিতে তখন আত্মরক্ষার সময়। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে নদীয়ার অনেক নকশালপন্থী কর্মীরাই (যেমন বেণী সরকার, অজিত চৌধুরী, বুলি

সিংহ রায়, রমেন সাহা, মধু ঘোষ প্রমুখ) 'terrain'-এর প্রশ্ন তুলে আসামে চলে যান।

এর আগে থেকেই পারস্পরিক অবিশ্বাস বাড়ছিল। 'শ্রেণীচ্যুতি'র প্রশ্নে কোন কর্মী কতটা আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখালেন সেই নিয়ে পার্টি মিটিং-এ প্রশ্ন উঠত। বিপুল প্রামাণিকের ভাষ্য অনুযায়ী পার্টি মিটিং-এ এই প্রশ্নও উঠেছে যে অমুক নেতা টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজেন!

বস্তুতপক্ষে একাত্তর থেকে শুরু হয় কে কতখানি প্রকৃত কমিউনিস্ট —শহুরে কর্মীদের মধ্যে সেটাই প্রমাণ করার পালা। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ শান্তিপুর। একাত্তরের ডিসেম্বর মাসে তেঘড়িতে একটি মিটিং-এ শান্তিপুরের অজয় ভট্টাচার্য ও কালাচাঁদ দালালকে জেলা পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। অভিযোগ ছিল, ব্যবহারিক জীবনে অজয় ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত বিলাসিতার কিছু অভ্যাস ছাড়তে না পারা যেমন, তিনি কেন গায়ে মশামারার ক্রীম মাখেন, কিংবা সর্বদা গ্রামের ছোটখাটো সম্পন্ন জোতদারের বাড়িতে শেলটার নেন, কোন নিরন্ন কৃষকের বাড়ি নয়, (শান্তিপুবে প্রাক্তন নকশালকর্মীদের সাক্ষাৎকার অনুসারে)। এই সময় শান্তিপুর সি.পি.আই.(এম-এল) তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে থাকেন অজয় ভট্টাচার্য, কালাচাঁদ দালাল, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও অল্পকিছু পুরানো সঙ্গী, অন্যদিকে 'এ্যাকশন স্কোয়াডের' অবিসংবাদী নেতা হিসাবে রুদ্র ভট্টাচার্য, সোমনাথ চ্যাটার্জী, সমর পালচৌধুরী (এই গোষ্ঠীই অজয় ভট্টাচার্যদের বিরুদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ও একাত্তরে তাঁদের বিতাড়ন করে), তৃতীয় গোষ্ঠীটির নেতা বীরেন দাশ-এর অনুগামী হিসাবে থাকেন কেষ্ট ঘোষ, বুলু চ্যাটার্জী, অমূল্য বিশ্বাস, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, রণজিৎ দাস প্রমুখ।

আদি গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে অজয় ভট্টাচার্যরা তখন যথেষ্ট কোণঠাসা অবস্থায় ছিলেন। শান্তিপুরের বেশীরভাগ দ্বিতীয় প্রজন্মের নকশালপন্থী যুবকদের কাছে (অর্থাৎ যারা সি.পি.আই. পর্ব থেকে সি.পি. আই.(এম-এল)-এর সঙ্গে যুক্ত হননি) —অজয় ভট্টাচার্যরা তখন আর 'মিথ' নন। তাঁর প্রবল জনপ্রিয়তায় তখন চিড় ধরেছে। সবার সঙ্গে মানিয়ে চলা, বিপদের মুহূর্ত্তে কমরেডকে অস্ত্র দিয়ে নিঃস্বার্থ সাহায্য করা যে তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, নেতৃত্বের এই ফাঁকি সম্বন্ধে সমালোচকরা তখন সরব। অবিশ্বাসের বীজ এতদূর উপ্ত হয়েছিল যে, ২৫.৩.৭২ তারিখে শান্তিপুরে উপকণ্ঠে, কদমপুর গ্রামে, অদ্বৈত ভৌমিক নামে জনৈক জোতদারের পুকুরে মাছ ধরার সময় বিপ্লবী দলের কর্মী গণেশ ঘোষ নামে চোদ্দ বছরের একটি বালককে যখন জোতদারের লোক ধরে ফেলে ও পিটিয়ে মেরে ফেলে, তখন এই ঘটনায় অজয় ভট্টাচার্যের প্রত্যক্ষ উসকানি ছিল বলে গুজব ছড়ায়। ফলে অচিরেই ৩.৫.৭২ তারিখে শান্তিপুরের কাছে কন্দখোলা গ্রামের আমবাগানে অজয় ভট্টাচার্য, কালাচাঁদ দালাল, শম্ভুনাথ সরকার ও মধুসূদন চ্যাটার্জীকে সি.আর.পি., পুলিশ ও এ্যান্টি নকশাল স্কোয়াড ঘিরে ফেলে হত্যা করে,তখন প্রথমদিকে তাঁদের মৃত্যুকে 'শহীদের মৃত্যু' বলে শান্তিপুরের সহযোদ্ধারা স্বীকৃতি দেয়নি।

কৃষ্ণনগরের 'এ্যাকশন স্কোয়াডের' উল্লেখযোগ্য নেতা ও জেলা সি.পি.আই.(এম-এল)

-এর প্রথম সারির কর্মী শুভ্রাংশু ঘোষের মৃত্যুও তাঁর সহকর্মীদের অনেকের কাছে অনভিপ্রেত ছিল না বলে জানা যায়। একাত্তরে ধরা পড়ার পর শুভ্রাংশ রাজসাক্ষী হতে পারেন — কৃষ্ণনগর জেলে এমন কানাঘুষো শোনা যেত। যদিও শুভ্রাংশু ঘোষের মৃত্যু হয়, পুলিশের গুলিতে (২৪.৯.৭১), (কৃষ্ণনগর সদর কোর্ট লক-আপ থেকে ছজন বিচারাধীন বন্দী পালায় —তাদের মধ্যে একমাত্র শুভ্রাংশ ঘোষই পলায়নরত অবস্থায় গুলিতে মারা যান), তবু শেষদিকে তিনি তাঁর সহবন্দীদের আস্থাভাজন ছিলেন না বলেই জানা যায়।

পঞ্চমাংক

১৯৭২ শুরু হল। পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় বারের মত রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসানকালে নতুন নির্বাচন হল। সি.পি.আই.-এর সমর্থনে সিদ্ধার্থশংকর রায়কে মুখ্যমন্ত্রী করে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এল। শুরু হল পাল্টা এক শ্বেতসন্ত্রাসের যুগ। নকশালপন্থীদের দমনে শুরু হল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে 'গণহত্যার' পালা। এর সঙ্গে 'খেটে খাওয়া মানুষের দুর্গতি রোধে' বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পাড়ায় পাড়ায় প্রতিরক্ষাবাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিল। এর আগেও সত্তরের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণনগরে নকশালী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার জন্য ওখানকার নব কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, সি.পি.আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস.এস.পি., আর.এস.পি. এবং সি.পি.আই.(এম) হাত মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ বাহিনী গঠন করে।[৪২] বাস্তবে দেখা গেল ব্যক্তি হত্যার রাজনীতিকে রোধ করতে এইসব প্রতিরোধ বাহিনী —যারা বকলমে পুলিশের 'এজেন্ট প্রোভোকেটিয়র' ছিল, নতুন উদ্যমে ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি শুরু করল। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনও এই কাজে লাগে। নদীয়া জেলায় এইভাবেই 'এ্যান্টি-নকশাল স্কোয়াড' তৈরীহয়।

কৃষ্ণনগরে এমনিতেই দীর্ঘকালীন একটি ঐতিহ্য ছিল দুর্গা বা জগদ্ধাত্রী পূজোর বিসর্জনের দিন বিভিন্ন পাড়ার মধ্যে সংহিস হাঙ্গামা। সত্তর থেকে ক্রমে শহরে এমন কিছু ক্লাব গড়ে ওঠে যারা —এক, কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের অনুসারী, এবং দুই 'পাড়া' ধারণার বিকল্প, পরিবর্ত্ত একটি অস্তিত্ব তৈরী করছিল। কৃষ্ণনগরে উনসত্তর-সত্তরে এমনই দুটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব গড়ে ওঠে যাদের একটি তথাকথিত নকশাল ছেলেদের এবং অপরটি কংগ্রেসী ছেলেদের আশ্রয় দেয়। বৌবাজার এলাকায় মধ্য ষাটে গড়ে ওঠা পল্লীউন্নয়ন সমিতি ক্লাবটিতে বামন হালদার, বাসু ঘোষ, সুনু বোস, ঝুনু বোস, কার্ত্তিক মালাকার, কৃষ্ণ, শ্যামল সরকার প্রমুখ নকশালপন্থী যুবকরা যুক্ত ছিল। সত্তর থেকে পাশের পল্লীশ্রী পাড়ায় গ্যালাক্সি ক্লাব নামে পাল্টা একটি ক্লাব গড়ে ওঠে যাদের নিয়ে, তারা শহরে সমাজবিরোধী হিসাবেই পরিচিত ছিল যেমন, বীরবল পাল, বংশী পাল, মনা মজুমদার, সুনু সরকার ও আরও অনেকে।

উপরোক্ত বীরবল শহরের রেলস্টেশন সংলগ্ন বেলেডাঙ্গা এলাকাতেও একটি সমাজবিরোধী গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক ছিল। এই গ্যালাক্সি ক্লাবের মূল পৃষ্ঠপোষক দীনেশ মজুমদার ছিলেন প্রথমে এস.এস.পি. পার্টির সমর্থক, পরে সি.পি.আই.(এম)-এর। তিনি নিজেও

সমাজবিরোধী কার্যকলাপের জন্য ঊনসত্তরে গ্রেপ্তার হন।

সত্তরের দুর্গাপুজোর পর থেকে বৌবাজার ও পল্লীশ্রীর এই দুটি ক্লাবের মধ্যে হত্যার রাজনীতি নিয়ে শুরু হয় পারস্পরিক বদল নেওয়ার পালা। একাত্তরের মার্চে নির্বাচনের দিনটিতে বীরবলের সহযোগিতায় পুলিশ বৌবাজার এলাকার বেশ কয়েকজন নকশালপন্থী ছেলেকে ধরে নিয়ে যায়। পাল্টা প্রতিশোধ হিসাবে বীরবলের বেশ কয়েকজন সমর্থককে পর পর হত্যা করা হয় (২.৪.৭১-এ বীরবলের ওপর হামলা হয়, বীরবল প্রাণে বেঁচে যায়, ৩.৪.৭১-এ বীরবলের দুই কুখ্যাত সঙ্গী অমর দাস বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসী বিশ্বাসকে ছায়াবাণী সিনেমা হলের মধ্যে হত্যা করা হয়, ৭.৪.৭১ তারিখে বীরবলের এক পৃষ্ঠপোষক পৃথ্বীশ মুখার্জীকে ছুরিকাঘাত করা হয়, ৯.৪.৭১ তারিখে গ্যালাক্সি ক্লাবের আর এক সদস্য সুবর্ণ দাসকে হত্যা করা হয়)। তৎকালীন নকশালপন্থী যুবক গোরা ভট্টাচার্যের নাম বীরবলের এইসব সাঙ্গপাঙ্গদের হত্যার কেসে পুলিশের রিপোর্টে ওঠে।

এইবার বীরবলের নেতৃত্বে শুরু হয় নকশালপন্থীদের ওপর পাল্টা প্রতিশোধের পালা। পর পর হত্যা করা হয় সাধন ওরফে লক্ষ্মণ কুমার বর্মণ নামে দশম শ্রেণীর ছাত্র ও এক নকশালপন্থী কিশোরকে (১০.৪৭১)। এর পর একাত্তরের ৮ অকটোবর নকশালপন্থী কিশোর সন্দীপ রায় (টোটো)-কে কৃষ্ণনগরের কাছে দোগাছিতে এই এ্যান্টি-নকশাল স্কোয়াড হত্যা করে। আরও যেসব নকশালপন্থী যুবককে এই দল হত্যা করে তাদের মধ্যে ছিলেন বৌবাজারের বিশু বিশ্বাস (২৮ এপ্রিল, ১৯৭১-এই বিশু বিশ্বাস '৬৬-তে খাদ্য আন্দোলনে নিহত হরি বিশ্বাসের ভাই), উদয় রায় ও সমর রায় (৮ অক্টোবর, ১৯৭১)।

এখানে এটাও উল্লেখ থাকা দরকার যে, পুলিশের রেকর্ডে এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করা আছে যে — "The support of some influential persons of the town, on both the groups for their designing interest reported to be giving impetus to the rowdy elements of both areas to keep this restive situation alive."

এটা ঘটনা যে, সাধারণ লোকের কাছে এই হত্যা ও পাল্টা হত্যার মধ্যে রাজনীতি বা আদর্শের কোন চিহ্ন ছিল না। ব্যক্তি হত্যাকে আর বিপ্লবের খাতিরে খতম বলে চালানো যাচ্ছিল না।

সত্তর সালের তেসরা অকটোবর শান্তিপুর শহরের ব্যবসায়ী পাঁচু ভগতকে হত্যার মধ্যে দিয়ে খতম নীতির সূচনা হয়। এর পর একাত্তরে শান্তিপুর ও সন্নিহিত এলাকায় বেশ কয়েকটি শ্রেণীশত্রু হত্যার ঘটনা ঘটে (যেমন ৩১.৩.৭১-এ বাবলা-গোবিন্দপুরের পোষ্টমাস্টার ললিত কুমার মণ্ডল, ২৯.৪.৭১-এ কন্দখোলার জোতদার কমল কুমার নন্দী, ২.৯.৭১-এ সাহেবডাঙ্গার শ্যামদালাল, ও একই দিনে শম্ভু দেবনাথ নামে অপর এক ব্যক্তি এই খতমকার্য গুলি সবই গোবিন্দপুর এলাকায় ঘটে)। এই সময় সি.পি.আই.(এম-এল) পার্টির শান্তিপুর ইউনিটের তরফে "আড়বাঁদির কুখ্যাত সুদখোর বিন্দে গড়াই খতম "শীর্ষক একটি লিফলেটে খতম নীতির সপক্ষে বলা হয় —'নির্বিশেষ (Abstract) মৃত্যুর একটা ভাবপ্রবণতার দিকে

আছে ঠিক, কিন্তু বিশেষ (Concrete) মৃত্যুর কি তাই? বিশেষ মৃত্যুর ক্ষেত্রেই প্রশ্ন আসে, কে নিহত হল? সে কি আমার বন্ধু, না আমার শত্রু? সে যদি জনতার শত্রু হয়, তার জন্য তো চোখের জল পড়ে না। কারণ সে বেঁচে থেকে আমার হাসি কেড়ে নিয়েছিল, সে গিয়েই আবার আমি আমার হাসি ফিরে পেয়েছি! যে জনতার বিরুদ্ধে —সে তো ইতিহাসের বিরুদ্ধে।"

এই লিফলেটেই জনতার উদ্দেশ্যে 'রেডবুক' থেকে কিছু নির্দেশিকা তুলে দেওয়া হয়।

মনোযোগ দেবার আটটি ধারা ঃ

১। ভদ্রভাবে কথা বলুন।

২। ন্যায্যমূল্যে কেনাবেচা করুন।

৩। ধারকরা প্রতিটি জিনিষ ফেরৎ দিন।

৪। কোন জিনিষ নষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ করুন।

৫। লোককে মারবেন না, গাল দেবেন না।

৬। ফসল নষ্ট করলেন না।

৭। নারীদের সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করবেন না।

৮। বন্দী সৈন্যদের প্রতি দুর্ব্যবহার করবেন না।

প্রায় একইরকম ভাষাগত সাদৃশ্য রেখে বাহাত্তরের ১৬ই মে ও ৩০শে মে শান্তিপুরের এ্যান্টি-নকশাল স্কোয়াডও দুটি লিফলেট বিলি করে ('নকশাল কুত্তাদের বিপ্লবের রূপ' ও 'হনুমান ও জাম্বুবানের লাফালাফি')। প্রথমটিতে বলা হয় —'গত দুবছর যাবত সভ্যতার ইতিহাসে একটি জঘন্যতম কলঙ্কিত অধ্যায় বলে চিহ্নিত থাকবে। যাদের হত্যাকরা হয়েছে তারা সকলেই প্রায় সাধারণ ঘরের ছাপোষা মানুষ, কি অপরাধ তাদের ছিল? আর যত অপরাধই থাক, তাদের হত্যা করার অধিকার এই অসভ্য জানোয়ারগুলোকে কে দিল?' এর পর এই লিফলেটে নকশালপন্থীদের দ্বারা দুটি বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ ও সংবাদ দেওয়া হয়েছে যার খবর পুলিশেরও অজানা ছিল এবং যা এই এ্যান্টি-নকশাল পার্টির "আবিষ্কার"। এবপর নকশালপন্থী যুবকদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে এই পার্টি প্রচ্ছন্ন হুমকি দেয় এই বলে —'অভিভাবকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনাদের ছেলেদের সৎপথে ফিরে আসতে বাধ্য করান ও আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। এই কচি ছেলেদের ভবিষ্যৎ হয়ত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, এবং আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনার কাছে আপনার স্নেহের পুত্রকে ফিরিয়ে দেব, তাদের কোন ক্ষতি হতে দেব না।' জনগণের প্রতি কিছু ব্যবহারিক নির্দেশাবলীও দেওয়া ছিল এই লিফলেটে —যেমন,

১। গ্রামে ও শহরে অলিতে গলিতে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলুন।

২। বীরেন দাস, কেষ্ট ঘোষ প্রমুখ নকশালী কুত্তাদের আশ্রয়স্থলের সংবাদ দিন।

৩। যেখানেই এদের পাবেন, ধরে পিটিয়ে পুলিশের হাতে দিন বা আমাদের সংবাদ দিন।

৪। নকশালী কুত্তাদের কোনরকম সাহায্য বা আশ্রয় দেবেন না।

৫। আশ্রয় দাতা ও সাহায্যকালী দালালদের ধরুন ও পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে নিন।

সি.পি.আই.(এম-এল)-এর প্রচারিত লিফলেটগুলির সঙ্গে একইরকম ভাষাগত সাদৃশ্য রেখে পাল্টা প্রচার চালায় এ্যান্টি-নকশাল স্কোয়াড।[৪৩]

শান্তিপুরের নকশালপন্থীদের বিরুদ্ধে এইভাবে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ঘোষণায় প্রতিবাদ আসে স্থানীয় আর.সি.পি.আই. নেতা মকসদ আলী ও বৈদ্যনাথ প্রামাণিকের তরফে। 'গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্রকে রুখতে হবে' শীর্ষক একটি ইস্তাহার এই দুই নেতার নামে প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে শান্তিপুর আর.সি.পি.আই.-এর এই উদ্যোগ একটি একক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। ফলে প্রবীণ এই দুই নেতাকে 'হনুমান' ও 'জাম্বুবান' আখ্যা দিয়ে এ্যান্টি নকশাল কমিটি প্রচার করে 'এতদিন যাবত এই বীর গণতন্ত্রী বৃদ্ধদ্বয় তথাকথিত সমাজবিরোধীদের নানা ভাবে সাহায্য করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন ও পদলেহন করেছেন এবং আজকের পরিস্থিতিতে এঁরা আবার সভ্য সমাজে ফিরে আসতে চেষ্টা করেছেন। এঁদের রাজনীতিক পরিচয় জনসাধারণ জ্ঞাত আছেন, কি সর্ব্বভারতীয় কি পশ্চিমবঙ্গে এই গণতন্ত্রবিদদের দলীয় অবস্থা কি তা নিশ্চয়ই জানেন?'

এইভাবে মূলতঃ কংগ্রেসী উদ্যোগে শান্তিপুরে চলে পাল্টা হত্যার রাজনীতি, যারা অজয় ভট্টাচার্য-কালাচাঁদ দালাল ও তাঁদের অন্য সহযোগীদের হত্যা করে, গণেশ ঘোষকে হত্যা করে। এইসব এ্যান্টি নকশাল স্কোয়াডের প্রতি কি ধার্তরাষ্ট্র স্নেহ পুলিশ প্রশাসন পোষণ করত তা বোঝা যায়। ১৬.৫.৭২ তারিখে শান্তিপুর আই.বি.-র পাঠানো একটি নোটে — "People are quite happy for the death of Ajoy Bhattacharji and other Naxalites in Police encounter. R.G.Party is very active in Santipur P.S. area and they are holding meeting in various places. A section of CPI(M) however are not happy over the turn of events and secretly they are helping the Naxalites " শান্তিপুরের নকশালপন্থী কর্মীদের কথায় এ সময়ে শান্তিপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে এত অসংখ্য বিপ্লবী হত্যা হয়েছে যার পূর্ণ ইতিহাস আজও অনুদ্ঘাটিত।

বেসরকারী গুণ্ডা বাহিনীর পাশাপাশি পুলিশের তরফেও ঠাণ্ডা মাথায় নকশালপন্থীদের মোকাবিলা করার চরম রাস্তা বেছে নেওয়া হয়েছিল। নদীয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় সুপরিকল্পিতভাবে নকশালপন্থী যুবকদের হত্যার বিভিন্ন ঘটনা এ.পি.ডি.আর. কিছুটা সংকলিত করে প্রকাশ করেছে, কিন্তু এই তালিকাও অসম্পূর্ণ।

একাত্তরে জুন মাসের পঁচিশ তারিখে কলকাতা পুলিশের একটি বাহিনী নদীয়ার জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নয়জন নকশালপন্থী কর্মী (এক মহিলা সহ)-কে তুলেনিয়ে যায়। এই বিপ্লবী যুবকদের অধিকাংশই পূর্ব কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। অভিযোগ ওঠে, বন্দীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন গবেষক শিক্ষকও ছিলেন, নকশালপন্থার সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক ছিল না। যাই হোক, এই বন্দীদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত পাঁচজন সন্দেহভাজন নকশালপন্থী যুবককে পুলিশ ঠাণ্ডা

মাথায় গুলি করে হত্যা করে ও অত্যাচারের যাবতীয় চিহ্ন নির্মূল করার জন্য তাদের দেহ দাহ করানোর ব্যবস্থা করে। অবশ্যই তাদের অভিভাবকদের জানানোর কোনো প্রশ্নই ওঠেনি।[88]

২৬.১১.৭১ তারিখে পুলিশের মান্থলি রিপোর্টে কৃষ্ণনগরের নকশালপন্থী যুবক বিপ্লব ব্যানার্জীর মৃত্যু সম্পর্কে মাত্র তিনটি লাইন লেখা হয় — 'Army personnel produced Biplab Banerji with two pipe-guns. The Naxalite sustained injuries during scuffle with the public and succumbed to his injuries.'

অথচ কথিত ঘটনা ছিল এই যে তেহট্টর শ্যামনগর গ্রামের কাছে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর হাতে রাজাকার সন্দেহে বিপ্লব ব্যানার্জী ধরা পড়েন। হিন্দীতে তাদের কাছে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখার জন্য তাকে তেহট্ট থানায় পুলিশের কাছে প্রত্যর্পন করা হলে তেহট্ট থানায় তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। (দ্রষ্টব্য ঃ শহীদ স্মরণে, প্রকৃত নকশালবাড়ির বীর শহীদদের জীবনী, দ্বিতীয় সংকলন, পৃষ্ঠা- ৬১)

রাণাঘাটের রূপশ্রী ক্যাম্পের সক্রিয় নকশালপন্থী কর্মী প্রতিবন্ধী যুবক প্রবীর বিশ্বাস, মহাদেব দাস, আড়ংঘাটার বস্তা গ্রামের ভূমিহীন কৃষক পরিবারের ছেলে মহঃ আদম শেখ এবং বেলেঘাটার দুই যুবক গোপাল ওরফে সুকুমার দত্ত ও সুবীরকে, নকশালপন্থীদের ভাষ্যমত, বিরোধীদের সম্মিলিত উদ্যোগে একাত্তরের পঁচিশে জানুয়ারী হত্যা করা হয়। জেলখানাতে বন্দী নকশালপন্থী কর্মীদেরও উপরও একতরফা আক্রমণ নেমে আসে। ১৯৭১-এর চব্বিশে ফেব্রুয়ারী বহরমপুর জেলের বন্দীদের সঙ্গে সংঘাতের জেরে বিরাট পুলিশ ফোর্স নিরস্ত্র নকশালপন্থী কর্মীদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। প্রাণ হারান শান্তিপুরের সর্বজনপ্রিয় কমিউনিস্ট নেতা কানাই বঙ্গ, শিকারপুরের এক পঙ্গু যুবক নজরুল ইসলাম, যাদবপুরের ছাত্র তিমিরবরণ সিংহ ও আরও ছয়জন যুবক। 'বহরমপুর জেলে বন্দী হত্যা করার একটা পরিকল্পনা ছিল শাসকশ্রেণীর। নির্দিষ্ট কেস দিয়ে আইনমোতাবেক কোন শাস্তি দেওয়া যায় না অত কমরেডদের। তাই বন্দী অবস্থায় হত্যা করার ফ্যাসিস্ত প্ল্যানই গ্রহণ করেছিল তখনকার প্রশাসন।' (দ্রষ্টব্য ঃ তরঙ্গ প্রবাহ, মার্চ, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা -১৫)

চাকদহের বিক্ষুব্ধ সি.পি.আই.(এম) কর্মী অরুণ ভট্টাচার্য্যের লেখায় সে সময়ের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ফুটে ওঠে —"সি.পি.আই.(এম-এল)-এর তৎকালীন নেতৃত্ব অন্ততঃ বিবেকের সাথে তঞ্চকতা করেন নি। সর্বোচ্চ নেতারা সংগ্রামের মধ্যেই ছিলেন এবং শাসক শোষকদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করেছেন। সাহসের সাথে কর্মীদের সাথে এগিয়ে গেছেন এবং জীবন দিয়েছেন। কিন্তু সি.পি.আই.(এম)-এর সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে প্রবঞ্চক আখ্যা দেওয়া যায়। তারা অনেকে কংগ্রেসকে উস্কানি দিয়েছেন যাতে এলাকায় দলের সংগঠন বজায় থাকে এবং নির্বাচনে সফল হওয়া যায়।"

সত্তর-একাত্তরে নদীয়ায় সি.পি.আই.(এম) ক্যাডাররা কিন্তু লড়ছিল সর্বত্র, চাকদহে নবদ্বীপে, ধুবুলিয়ায় —নকশালদের বিরুদ্ধে, আবার নবকংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, সি.পি.আই.-এর বিরুদ্ধেও। ৬.৪.৭১ তারিখে ধুবুলিয়ার দেশবন্ধু হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের লাইব্রেরীতে

আয়োজিত এক দলীয় মিটিং-এ সি.পি.আই.(এম) জেলা কর্ত্তৃত্ব এই সিদ্ধান্ত নেয় যে — 'এমন প্রতিরোধবাহিনী গড়তে হবে যার কাছে পুলিশ শক্তিও তুচ্ছ হবে। আমরা এ গভর্ণমেন্ট মানি না।' সেসময়—চাকদহে (চাকদহ-কল্যাণী শিল্পাঞ্চল এলাকায়) সি.পি.আই.(এম) কর্মীরা যেমন বহুমুখী লড়াই লড়েছে, ধুবুলিয়ায় বা নবদ্বীপে কংগ্রেস ও ছাত্রপরিষদের সঙ্গে দ্বিমুখী সংঘর্ষ চলেছে। একাত্তরে সি.পি.আই.(এম) রাজ্য নেতৃত্ব এই মর্মে প্রস্তাব নেয় যে গ্রাম এলাকার কমরেডদের এই বহুমুখী আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য অবিলম্বে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যাওয়া উচিত।[৫৫] একটা কথা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার যে সত্তরে, যখন শহর ও গ্রামে নকশালপন্থী কর্মীরা ব্যস্ত শ্রেণীশত্রু খতমের বিপ্লবী উদ্যোগ গড়ে তুলতে —তখনও কিন্তু সি.পি.আই.(এম) নদীয়ার বিভিন্ন এলাকায় বাস্তু জমি দখল করতে ও কৃষকদের মধ্যে তা বিলি বন্টন করতে ব্যস্ত। হরেকৃষ্ণ কোঙার ২৭.৪.৭০ তারিখে নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী কমিটি আয়োজিত সমাবেশে ঘোষণা করছেন —আইনী বা বৈধ উপায়ে ভূমি দখলের কাজটি চালানো যায় না। বক্তব্যটি খুবই ইঙ্গিতবহ।

সারণী — ৫.২

তৎকালীন পুলিশী বয়ান অনুযায়ী নদীয়ায় সি.পি.আই (এম) কর্মীদের দ্বারা বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদেব ওপব আক্রমণের তালিকা—(১.১.৭১ থেকে ৩০.৯.৭১ অব্দি) ঃ

নকশালপন্থীদেব ওপর	—	২
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	—	২৭
মোট ঃ		২৯

নদীয়া জেলায় সি.পি.আই (এম) কর্মীদের দ্বারা বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যা (১.১.৭১ থেকে ৩০.৯.৭১ অব্দি) ঃ

নকশালপন্থী হত্যা	—	৭
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	—	১
মোট ঃ		৮

সূত্র ঃ *পুলিশ রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত*

সারণী—৫.৩

তৎকালীন পুলিশী বয়ান অনুযায়ী নদীয়ায় সি.পি.আই (এম) পার্টি কর্মীদের রাজনৈতিক হত্যার তালিকা—(জানুয়ারী '৭১ থেকে সেপ্টেম্বর '৭১ অব্দি) ঃ

মাস	*হত্যার সংখ্যা*	*বিবরণ*
এপ্রিল	৬টি	— ২৯.৪.৭১ তাং-এ চাকদহ শহরে সি.পি.আই (এম) কর্মীরা আটজন নকশালপন্থী কর্মীর একটি দলকে তাড়া করে ও ছয়জনকে হত্যা করে। কোনো অস্ত্রশস্ত্র ধরা পড়েনি।

মে	১টি	— ৩.৫.৭১ তাং-এ ধুবুলিয়া ক্যাম্পের বাসিন্দা জনৈক অমল বিশ্বাসকে তার বাড়ি থেকে সি.পি.আই (এম) কর্মীরা টেনে বার করে হত্যা করে।
জুলাই	১টি	— ২৩.৭.৭১ তাং-এ নবদ্বীপ তেঘড়িপাড়ায় তিন-চার জন সি.পি.আই (এম) সমর্থক জনৈক নির্মল দাসকে ঘরে ফেরার সময় হত্যা করে।
সেপ্টেম্বর	১টি	— ১৯.৯.৭১ তাং-এ চাকদহের সি.পি.আই (এম) কর্মীরা কংগ্রেস কর্মী অজিত দেবনাথকে রিস্‌কা থেকে টেনে নামিযে হত্যা করে।

সূত্র ঃ *পুলিশ রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত*

কেন এই ব্যর্থতা? আত্মদর্পণে নকশালপন্থী চেতনা

বাহাত্তরের জুলাই মাসে চারু মজুমদারের গ্রেপ্তার ও মৃত্যুর পর নদীয়ায় পোস্টার পড়ে —'কমঃ চারু মজুমদার তোমায় আমরা ভুলিনি, ভুলবো না; জোতদার খতম করা চলছে চলবে; শ্রদ্ধেয় কমরেড চারু মজুমদারের মৃত্যুর সাথে আমাদের বিপ্লব শেষ হয় নাই'। বাস্তবিকই চারদিকের পতনের মধ্যে তখন নতুন উদ্দীপনা নিয়ে জেগে উঠছে নদীয়ার চাপরা থানার একটি অঞ্চল —কালীনগর, যেখানে নকশালপন্থী কর্মীরা নতুন করে মুক্তাঞ্চল তৈরীর স্বপ্ন দেখছেন। কৃষ্ণনগর শহরেও নতুন করে জেলফেরৎ নকশালপন্থী কর্মীদের মধ্যে ভাবনাচিন্তা লেনদেন হচ্ছিল আবার সংগঠনকে চাঙ্গা করা যায় কি করে। বস্তুতঃ উনিশশো চুয়াত্তর অব্দি নদীয়া জেলার নকশালপন্থীরা সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন —অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিতর্ক, প্রতিবিতর্ক, অবিশ্বাস ও প্রত্যাঘাতের আবহাওয়া গড়ে ওঠা সত্বেও।

এই ইতিবাচক চিন্তার ছাপ পড়েছে সে সময়কার বিপ্লবী কর্মীদের চিন্তাভাবনা, আত্মসংশোধনীর দিনলিপিতে। এগুলি লেখা হয়েছিল বাহাত্তরের সার্বিক হতাশার দিনগুলিতে, তখনও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অথবা সোজাসুজি চারু মজুমদারের ওপর ব্যর্থতার একক দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার দিন শুরু হয়নি।

গ্রাম এলাকায় মাওবাদী কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে গিয়ে কোথায় ভুল হয়েছিল, জনৈক শহুরে বিপ্লবী ক্যাডারের দৃষ্টিভঙ্গীতে একরকমই একটি আত্মসমালোচনামূলক লেখার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল। *"কেন আমরা কৃষক জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাতে পারিনি?"*

(১) আমাদের মধ্যে সঠিক কোন রাজনীতি ছিল না, আমরা নিজেরাই কমঃ চারু মজুমদারের রাজনীতি বুঝতে পারিনি।

(২) কৃষক জনসাধারণের মধ্যে আমরা বেশীদিন মিশতে পারিনি, কারণ বেশীর ভাগ সময় কমরেডদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিলাম।

(৩) আমাদের মধ্যে পেটি বুর্জোয়া নেতৃত্ব থেকে গিয়েছিল। কারণ এলাকার লাল সন্ত্রাস আমাদের সৃষ্টি।

(৪) যে সব কৃষকের সঙ্গে মিশেছি তাদের মধ্যে অনেকেরই কৃষক চরিত্র ছিল না। তাই বারে বারে ব্যর্থ হয়ে অর্থনীতি (বাদী) ঝোঁকের দিকে এগিয়ে গেছি।

অথচ অর্থনীতিবাদী ঝোঁককে পুরোপুরি অস্বীকার করতে বলেননি চারু মজুমদার। দেশব্রতী, ১৫ জানুয়ারী, '৭০ সংখ্যায় "গেরিলা এ্যাকশন সম্পর্কে কয়েকটি কথা") — শীর্ষক লেখায় চারু মজুমদার বিস্তারিত ভাবে পনেরোটি পয়েন্টে গেরিলা স্কোয়াডের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানেই দশ নম্বর পযেন্টে পুনর্জমায়েত নিয়ে আলোচনা করতে করতে লিখছেন —"যখন কয়েকটি আক্রমণাত্মক কাজ ঘটেছে এবং শ্রেণীশত্রুকে নির্মূল করার বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রয়োগ এবং কাজের মধ্যে দিয়ে, রাজনৈতিক ইউনিটগুলো ফিসফিস করে ব্যাপক অর্থনৈতিক আওয়াজ তোলে — "শ্রেণীশত্রুর ফসল দখল করো"। এই কথা গ্রাম এলাকায় যাদুমন্ত্রের মত কাজ করে। এমনকি সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া কৃষকও তখন এই যুদ্ধে নেমে পড়ে।"

সাধারণভাবে সত্তর নাগাদ এই ধারণাই নকশালপন্থীকর্মীদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল যে ফসল দখল করার আন্দোলন একটি নিষিদ্ধ জিনিষ। ডেবরা-গোপীবল্লভপুরে সন্তোষ রাণার নেতৃত্বে এই ফসল দখলের উদ্যোগকে চারু মজুমদারই প্রতিহত করেছিলেন।

(৫) আমরা শ্রেণীলাইন ঠিক রাখতে পারিনি। কারণ একদিকে পেটি বুর্জোয়া মোহ, অন্যদিকে কৃষকদের প্রতি অবিশ্বাস।

(৬) চারু মজুমদারকে আমরা আঁকড়ে ধরতে পারিনি। তাঁর লেখাকে শুধু লেখা হিসাবেই ধরেছি। তার মধ্যে কি তত্ত্ব ও সত্য আছে তা বুঝতে পারিনি। কারণ সব সময় আমরা কমরেডদের প্রতি নির্ভরশীল ছিলাম।

(৭) পার্টির দু লাইনের লড়াই আমাদের হতাশ করে দিয়েছিল। এর পূর্বে আমরা পার্টির মধ্যে এইরূপ লড়াই দেখিনি। তাই পার্টির প্রতি আমাদের অনাস্থা এসে গিয়েছিল।

(৮) নির্দিষ্টভাবে কোন শেলটার করতে পারিনি বা পাইনি। তাই কোন স্কোয়াডকে নিয়ে ড্রিল করতে পাইনি। এর ফলে কৃষকদের মধ্যে গভীরভাবে মিশতে পারিনি।' (গ্রাম এলাকায় shelter তৈরী করা শহরাঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশী কঠিন ছিল। এখানে এলাকার ভৌগোলিক বিশেষত্বও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল)। **(গোপন ও অপ্রকাশিত 'কল্যানের' লেখা একটি দলিল থেকে উদ্ধৃত)**

বোঝাই যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের নিয়ে গেরিলা স্কোয়াড গড়ে তুলতে গেলে প্রাথমিক শর্ত্তগুলি কোনোটাই ঠিকমত পালিত হয়নি। ১৯৭০-এ জুলাই মাসে দেশব্রতীতে চারু মজুমদার বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মে কৃষকদের নিজস্ব উদ্যোগ নিয়ে লিখেছিলেন —"এই দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের উদ্যোগ বাড়ানো যায় কী করে? এ উদ্যোগ বাড়ে একমাত্র চেয়ারম্যানের চিন্তাধারা শিক্ষার মধ্য দিয়ে। এ উদ্যোগ বাড়ে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের স্কোয়াডকে

গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়ার মধ্য দিয়ে। দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের স্কোয়াডকে পুরো গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন। এই অধিকার দিতে বাধা দেয় আমাদের বুর্জোয়া চিন্তাধারা —সংশোধনবাদী চিন্তাধারা। সংশোধনবাদের এই নির্দিষ্ট প্রকাশ অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর ওপর নির্ভরশীলতা আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়েছে।"[৪৬] ব্যর্থতার ঠিক এই জায়গাটি নিয়েই আরেকজন বিপ্লবী কর্মীর লেখা থেকে উদ্ধৃত করা যাক —'কৃষক জনতার সহিত একাত্ম হইতে গিয়া যে সকল বাধার সম্মুখীন হইয়াছে এবং তাহার পরিপ্রেক্ষিতে যাহা অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা নিম্ন-এ বর্ণনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ, প্রথমেই আমি নিম্নমধ্যবিত্ত কৃষকের বাড়িতে shelter নিই। সেখানে রাজনীতি পূর্ণভাবে রাখা হয়। তাহারা অবশ্য এই পার্টি লাইনকে পূর্ণভাবে জেনে নেয়, কিন্তু সরাসরি পার্টির মধ্যে এসে কাজ করিতে আসিতেছে না। কারণ এই সকলের মূলে রহিয়াছে আমার শ্রেণী লাইনের দুর্বলতা —চারু মজুমদার বলিয়াছেন —একমাত্র দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকই এই লড়াই-এর নেতা হতে পারেন। সুতরাং সংগঠক কমরেডদের কৃষক জনতার মধ্যে শ্রেণী বিশ্লেষণের দরকার আছে। সেইজন্য শ্রেণী বিশ্লেষণ সঠিকভাবে করিতে না পারায় কৃষক জনতার পরিপূর্ণ উদ্যোগ আনাইতে পারি নাই।

দ্বিতীয়তঃ. সংশোধনবাদী পার্টির প্রভাব থাকায় ঐ সকল কৃষক জনতার মধ্যে অর্থনৈতিকবাদের সংক্রামিত রোগ ঢুকিয়া গিয়াছে। সেইহেতু চারু মজুমদারের আত্মত্যাগের রাজনীতি সহজে গ্রহণ করিতে চায় না। পার্টির লাইনকে তাঁহারা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করা সত্ত্বেও দৈনন্দিন জীবনের অভাবটাই সব থেকে তাঁহাদের মনে প্রথমেই দেখা দেয়।

তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক দুর্বলতা থাকায় তাঁহাদের সংক্রামিত রোগ সারাইয়া রোগীকে বাঁচাতে অসমর্থ হয়।

চতুর্থতঃ, এক shelter থেকে আর এক shelter এইভাবে বিভিন্ন shelter-এ যাতায়াতের জন্য কৃষকের অভাবঅভিযোগ সম্পূর্ণ জানিতে পারি নাই। এবং তাহাদিগকে আত্মত্যাগের রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করা যায় নাই।

পঞ্চমতঃ, চারু মজুমদারের রাজনীতির দুর্বলতা থাকায় সংশোধনবাদী রাজনীতির প্রভাবিত হয়ে পড়ি।

ষষ্ঠতঃ, 'অ্যাকশন'-এর মধ্য দিয়ে পার্টিতে আসিয়াছি ফলে অ্যাকশনের ঝোঁক বেশি।

এই সকল কারণে নিজের মধ্যে একটা হতাশার ভাব চলে আসে। এই সকল কারণের সাথে পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বও হতাশার সৃষ্টি করে ফলে কৃষক-জনতার কাছ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। অবশ্য কৃষক shelter-এ থাকছি, কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাদের সাথে মিশিয়ে দিতে পারি নাই।'[৪৭]

বাস্তবিকই নদীয়া জেলায় নকশালপন্থী সংগঠনের বাহাত্তর সাল নাগাদ যে বিপর্যয় দেখা দেয় তাকে গুছিয়ে বলতে গেলে এই কর্মীর বিশ্লেষণগুলিই তুলে ধরতে হয়। এখানে সাংগঠনিক সেটব্যাকের কথাই বলা হচ্ছে। যদিও বাহাত্তরে নকশালপন্থী কাজকর্মকে নতুনভাবে

গুছিয়ে তোলার জন্য ডিস্ট্রিকট্ কমিটি -কে বাদ দিয়ে রিজিওনাল কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, কিন্তু উনসত্তরে গড়ে ওঠা সি.পি.আই.(এম-এল)-এর মূল সাংগঠনিক কাঠামো থেকে তা পৃথক ও বিবর্তিত অস্তিত্ব বলে ধরা যায়। নদীয়ায় এই ভাঙ্গা হাটের মেলায় যে কজন নকশালপন্থী কর্মী তখনও চারু মজুমদারকে অভ্রান্ত বলে মনে করেছেন, তাঁরাই প্রধান গোষ্ঠী হিসাবে একদিকে শক্তিনগর, অপরদিকে রাণাঘাট শহর ও তাহেরপুর-বীরনগর-বাদকুল্লা, চাপরা থানার কালিনগর এলাকাকে কেন্দ্র করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিলেন।

বস্তুতপক্ষে চারু মজুমদারের প্রতিটি লেখাকে বিচ্ছিন্নভাবে ও আক্ষরিক অর্থে বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তবে এগোনোর যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, সেটাই নকশালপন্থী কর্মীদের মধ্যে একটা বড় দুর্বলতা তৈরী করে দিয়েছিল।'দরিদ্র-ভূমিহীন কৃষকের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া একটি অপরিহার্য পথ' জেনে এই কর্মীরা তাই করার চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের উপর নির্ভর করার মূল কাজটিই হয়নি। নকশালপন্থী কর্মীরা নিজেরাই সে সময় নিজেদের বিপর্যয়ের কারণটি এইভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন —ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের দিয়ে তাদের নিজেদের উদ্যোগের দ্বার উন্মুক্ত করতে পারা যায়নি। বিপ্লবটা সেসময় যেন পার্টির বিপ্লব বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

তুলে দেওয়া যাক নদীয়ার এক সংগঠকের 'ভুলত্রুটির অভিজ্ঞতার সারসংকলন'-এর কিছু অংশ। (গোপন ও অপ্রকাশিত *'মধুর'* লেখা একটি দলিল থেকে হুবহু উদ্ধৃত)

"(১) স্কোয়াড গঠন করার ক্ষেত্রে এবং গ্রামে নির্ভর করার ক্ষেত্রে মধ্যচাষী বা মধ্যবিত্তদের ওপর নির্ভর করা। দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের উপর নির্ভর করার ক্ষেত্রে জোর না দেওয়া (আশ্রয়, থাকা, খাওয়া, যোগাযোগ এবং স্কোয়াড গঠন করার ক্ষেত্রে)।......

(২) "খতম অভিযান একই সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ আবার গেরিলাযুদ্ধের শুরু" আমাদের প্রিয় ও মহান নেতা C.M.-এর এই নির্দেশ আমরা নীতিগতভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি।....যার প্রথম বহিঃপ্রকাশ হিসাবে আমরা যারা বিশেষ করে সাঃ পরগণার মধ্যে কাজ করছিলাম, তারা বাঙালী গাঁগুলোতে যেখানে শ্রেণীসংগ্রাম অপেক্ষাকৃতভাবে তীব্র এবং যেখানে অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষক —তাদের মধ্যে প্রায় বলতে গেলে একদমই জোর না দিয়ে নিজেদের কেবলমাত্র সাঁওতাল গাঁগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য সাঁওতাল গাঁগুলোতে মূলতঃ গরীব কৃষকই প্রধান, ভূমিহীন কৃষক বলতে গেলে প্রায় একেবারেই নেই। তাই প্রচণ্ড পুলিশী সন্ত্রাসের মুখে এই শ্রেণী এককভাবে এবং প্রধানভাবে লড়াইয়ের অংশ নেওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশক্ষেত্রে দোদুল্যমান থেকেছে।

দ্বিতীয় বহিঃপ্রকাশ হল শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতা দখলের রাজনীতির প্রচারে প্রধান হিসাবে না থাকায় অনেকক্ষেত্রে হামলা, বদলা নেবার রাজনীতি হিসাবে এবং এ্যাকশন সর্বস্বতার রাজনীতি হিসাবে এসেছে। পুলিশী সন্ত্রাসের ফলে যারা ঘর ছাড়তে বাধ্য হবে মূলতঃ তাদের নিয়ে স্কোয়াডের ভিত্তি দৃঢ় করার মানসিকতা এই রাজনীতিরই ফলশ্রুতি।

ফলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে পাশাপাশি কয়েকটা গ্রাম থেকে একজন অথবা দুজন করে কমরেডকে একত্রে জড়ো করে কোনরকমে একটা action ঘটানোর চেষ্টা। দলে অনেক ক্ষেত্রেই ঐসব কমরেডদের রাজনৈতিক অধঃপতন হয়েছে। অনেককেই পরবর্ত্তী ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দিক থেকে সক্রিয় করা যায়নি।

আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কোন স্কোয়াড যখন পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করেছে ঠিক তখন সেই স্কোয়াডকে ভেঙে দিয়ে action- ঘটানোর জন্য দূরে দূরে পাঠানো হয়েছে। ফলে পরবর্ত্তী ক্ষেত্রে প্রচণ্ড পুলিশী সন্ত্রাসের মধ্যে এসব স্কোয়াডের কমরেডরা অনেকক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। অনেকের মধ্যে সাময়িক ভীতি বা আত্মরক্ষার চিন্তা প্রাধান্যবিস্তার করেছে।

তৃতীয় বহিঃপ্রকাশ —শ্রেণীলাইনকে শক্ত ও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার মহান নেতা C.M.-এর নির্দেশকে আমরা প্রায় সময়েই কার্যে পরিণত করতে পারিনি। ফলে দেখা গেছে যখনই কোন গ্রামে কোন action হয়েছে তখনই সেই গ্রামে এবং সেই গ্রামকে কেন্দ্র করে তৎসংলগ্ন এলাকায় ক্ষমতা দখলের রাজনীতির প্রচার অপ্রধান থেকেছে। এর ফলে ঐসব ক্ষেত্রে শ্রেণীর সাহস বাড়েনি। ফলে স্কোয়াডের কমরেডরা প্রায় সময়েই জনতার উপরে আস্থা রাখতে পারেনি এবং নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছে, action সংগঠিত হয়েছে এমন গ্রামে নতুন স্কোয়াড গঠন করতেও এর ফলে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছি।

চতুর্থ বহিঃপ্রকাশ —পার্টির সামরিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ সামরিক Plan Programme নেওয়ার ক্ষেত্রে) পেটিবুর্জোয়া কমরেডদের এবং অনেকক্ষেত্রে মধ্যকৃষকদের উদ্যোগ প্রায়ই সময় অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে দেখা গেছে, এবং যা দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে ও শ্রেণীসচেতন হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বারবার বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন একটি গাঁয়ে action সংগঠিত করে ফিরবার পথে স্কোয়াডের কিছু কমরেড জনৈক পেটিবুর্জোয়া সংগঠক কমরেডকে "কম্যাণ্ডার" বলে সম্বোধন করে। এই ঘটনাই প্রমাণ করে পেটিবুর্জোয়া মধ্যবিত্ত উদ্যোগ কতখানি বিপজ্জনকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল...

পঞ্চম বহিঃপ্রকাশ —কমরেডস, আমাদের শ্রদ্ধেয় ও মহাননেতা C.M. গণফৌজ গড়ে তোলার প্রশ্নে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্নে বার বার আমাদের শ্রেণী লাইনকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন মূল্যবান লেখাগুলোর মধ্যে দিয়ে তিনি বলেছেন যে "আমাদের গণমুক্তি ফৌজ প্রধানত কৃষকের ফৌজ এবং এই ফৌজ শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার," "কৃষকের শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে দিয়েই এই ফৌজ শক্তিশালী হবে", "এই ফৌজ কৃষিবিপ্লব সম্পন্ন করবে।" আমরা আমাদের প্রিয় নেতার মহান নির্দেশগুলোকে সঠিকভাবে প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা এবং মনযোগ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করিনি। এর ফলে কৃষকের গণফৌজ গঠন করার প্রশ্নে এবং কৃষকের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্নে আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাববাদী বিচ্যুতি ঘটেছে। গাঁকে গাঁ দখল এবং সম্পত্তি বিলির নিছক অর্থনীতিবাদী শ্লোগান রাখা হয়েছে, যা স্বাভাবিকভাবে স্কোয়াডগুলোর মধ্যে

বড় বড় হামলা এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যের উপর নির্ভরতা বাড়িয়েছে এবং এই ধরণের প্রোগ্রাম নেবার তাত্ত্বিক ভিত্তি জুগিয়েছে। স্কোয়াডগুলোতে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে এবং স্কোয়াডের কম্যাণ্ডার দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে থেকে নির্বাচিত করার ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নেতার নির্দেশ কার্যকরীভাবে বাস্তবায়িত করা হয়নি। ...

...আমাদের যা কিছু সাফল্য তা সবই C.M.-এর, এবং ভূলত্রুটিগুলো সবই সংশোধনবাদের নির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশ —ঠিক এইভাবে আমরা নিজেদের সাফল্য এবং ভুলত্রুটিগুলোকে দেখতে অভ্যস্ত হইনি। এই কারণে আমরা, পেটিবুর্জোয়া সংগঠক কমরেডদের অনেকেই প্রায়ই মাঝে মাঝে আত্মগত চিন্তা থেকে অহমিকাবাদ এবং আঞ্চলিকতাবাদের রোগে ভুগেছি। দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্য থেকে রাজনৈতিক ক্যাডার তৈরী করার দিকে আমাদের নজর অপেক্ষাকৃতভাবে কম ছিল। কোনরকমে একটা ঘটিয়ে আমাদের পেটিবুর্জোয়া তাড়াহুড়াবাদ এবং অধৈর্য্যপনার মানসিকতাকে আমরা অনেকসময়ই সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছি। দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষককে সচেতনভাবে শ্রদ্ধা করতে এবং ভালবাসতে শিখতে পারিনি —পারিনি নিঃশর্ত্তভাবে তাদের উপর নির্ভর করতে।" ....[৪৮]

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই ব্যাপক অসঙ্গতির সঠিক কারণ খুঁজে বের করার প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে নকশালকর্মীরা এগিয়ে যেতে চাইছিলেন। অতএব সমস্ত হতাশা ঝেড়ে ফেলে নতুন উদ্দীপনায় জেগে ওঠার একটা প্রতিশ্রুতি তখনও উজ্জীবিত ছিল বিপ্লবী কর্মীদের চেতনায়। যদিও তখনও অব্দি নির্দিষ্ট তথ্যাদি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার বদলে তাঁরা মূলত ব্যর্থতার কারণ হিসাবে পার্টির প্রতিষ্ঠিত লাইনের সঠিক প্রয়োগের অভাবকেই চিহ্নিত করছিলেন। যেমন নেতিবাচক শিক্ষার মধ্যে প্রধান বিষয়টি ছিল গণসংগঠন বর্জনের প্রশ্নটি। সত্তর দশকের পরবর্তী প্রজন্ম পুনরায় এই বিশ্বাসে ফিরে যায় যে —ট্রেড ইউনিয়ন বা গণসংগঠন হল শ্রেণীসংগ্রামের রাজনৈতিক শিক্ষালয় এবং শ্রেণীযুদ্ধের শিক্ষালয়। মূল শ্রেণীযুদ্ধ কিন্তু লড়তে হয় বাইরে রাজনৈতিক সংগ্রামের বৃহত্তর ময়দানে। '৬৭ থেকে '৭২ এই পর্বে বিপ্লবী নেতৃত্বে বিপ্লবী সংগ্রাম ও রাজনৈতিক আঘাতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সংগ্রামে জনগণ প্রাথমিকভাবে গণসংগঠনে সংগঠিত হন এবং শাষকশ্রেণীর সম্পূর্ণ উৎখাতের জন্য আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে সশস্ত্র সংগঠনে জমায়েত হন। বিপ্লবী পার্টি হল এসবের ওপরে সর্বোচ্চ নেতৃত্বদায়ী সংগঠন। সংগঠন গড়ে তোলার এই প্রতিটি স্তরই গুরুত্বপূর্ণ এবং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। সত্তরোত্তর দশকের শিক্ষা অতএব হল এই যে, 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কাজ হল গণসংগঠনে অনুপ্রবেশ করা, রাজনৈতিক লক্ষ্যে তাকে সংগঠিত করা এবং জনগণকে বিপ্লবী সংগ্রামে পরিচালনা করা।'

'শ্রেণীশত্রু খতমই হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ ও গেরিলা যুদ্ধের সূচনা' —এই সূত্রায়ণের ফলে নকশালবাড়ির কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতৃত্ব, কর্মীবাহিনী শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে পেটিবুর্জোয়া মতবাদে ডুবে গিয়েছিলেন। গণসংগঠন ও গণআন্দোলন গড়ে তোলা ও বিপ্লবী

সংগ্রামকে প্রকৃত শ্রেণীচেতনার ভিত্তিতে আলোকিত করার কাজ ফেলে রেখে সংগ্রামের একমাত্র রূপ হিসাবে "শ্রেণীশত্রু খতম" প্রাধান্য বিস্তার করল। মূল কর্মসূচী হিসাবে জমি ও ফসল দখল কিংবা বিপ্লবী কমিটির মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার কাজ পরিত্যক্ত হলে কৃষকদের উৎসাহ কমে গিয়েছিল।' চারু মজুমদার নিজেও একাত্তরের শেষাশেষি 'দেশব্রতী'তে লিখছেন যে ফসল কাটার আন্দোলন, যা একটি গণআন্দোলন, তার মাধ্যমে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ কৃষকও গণযুদ্ধে আকৃষ্ট হবেন।[৪৯] সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মূল কারণটিই যে অর্থনৈতিক, কৃষকদের এই তাগিদ তখন বিপ্লবী কর্মীদের কাছে তুচ্ছ।

নতুন বিপ্লবী প্রজন্ম এও আবিষ্কার করে যে গণসংগঠন বহিষ্কারের এই ভুল নীতির উৎস ছিল লিন পিয়াও-এর মতাদর্শগত প্রভাবের ছাপ, যে নতুন যুগের তত্ত্বের লিন পিয়াও সমাজতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী জয়ের প্রসঙ্গে জনযুদ্ধের তত্ত্বের সামরিক নীতিকে একটি সাধারণ রাজনৈতিক লাইন হিসাবে রেখেছিলেন। শত্রুর বিরুদ্ধে জনগণের সম্পূর্ণ শক্তিকে সমাবেশিত করার একমাত্র পথ হিসাবে গেরিলা যুদ্ধকে রাখার অর্থ যে অমার্কসীয় তা ক্রমেই বোধগম্য হয়। কারণ, সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত জনগণের অর্থনৈতিক বিভাজনের ওপর ভিত্তি করেই শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রামের মার্কসীয় ব্যাখ্যা দীর্ঘকালীন জনযুদ্ধের পথকে গুরুত্ব দেয়। এই দীর্ঘকালীন জনযুদ্ধের একটি কৌশল হল গেরিলা পদ্ধতি, কিন্তু অনুকূল অবস্থায় চলমান যুদ্ধের কোন সুযোগই বিপ্লবীরা ছেড়ে দেয় না। তাই বিপ্লব বিজয়ের জন্য জনগণের ওপর নির্ভরশীলতা আবশ্যিক শর্ত। এই জনগণ হওয়া চাই বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত জনগণ। এই সংগঠন গড়ে তুলতে ব্যাপক সংখ্যায়, বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন অথচ সংস্কারবাদে আচ্ছন্ন জনগণকেও পার্টির ছত্রছায়ায় আনতে হবে বিপ্লবী কর্মীদের। কিন্তু সেই '৬৭-'৭২ পর্বে পার্টি নেতৃত্বও শুধু নয়, পার্টি কর্মীরাও গণসংগঠনকে মুলতুবী রেখে পার্টি কাজকে মহত্তর হিসাবে তুলে ধরে কার্যত জনগণকে পাঠিয়ে দেওয়া হল হয় স্বতঃস্ফূর্ত্ততার শিবিরে, নয় সংশোধনবাদী বামরাজনীতির শিবিরে, অর্থাৎ একটি প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে অন্যপ্রবণতায় গিয়ে পড়া। যে শহুরে, মধ্যবিত্ত পেটিবুর্জোয়া পরিবারের যুবকরা যোগ দিয়েছিল বিপ্লবী কাজে সেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক অভিভাবকরাই সত্তর থেকেই মাওবাদ সম্পর্কে হয়ে উঠেছিলেন চূড়ান্ত রক্ষণশীল ও ভীতসন্ত্রস্ত। স্ত্রীকে লেখা চারু মজুমদারের শেষ চিঠিতে[৫০] তিনি স্বীকার করেছিলেন যে "খতমের ওপর বড় বেশী জোর পড়ে যাওয়াটা একটা বিচ্যুতি। এই বিচ্যুতি আমরা কাটিয়ে উঠছি"। একাত্তরের ১৮ই নভেম্বর-এর একটি লেখায়, যা দেশব্রতীতে প্রকাশিত হয়েছিল ১২ই মার্চ, ১৯৭২, চারু মজুমদার শহরাঞ্চলে পার্টির কাজ সম্পর্কে লেখেন— '...তাই শহরে যেসব কমরেডরা থাকবেন তাঁদের রাজনীতির উপর বেশী জোর দিতে হবে। শহরের শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র শ্রেণীগুলির মধ্যে লেগে থেকে রাজনীতি প্রচার করে পার্টি ইউনিট তৈরীর চেষ্টা বার বার চালিয়ে যেতে হবে'। পার্টির তৎকালীন রাজ্য সম্পাদককে লেখা চিঠিতে তিনি লেখেন — '....অ্যাকশন নিয়ে আত্মতুষ্টির ভাব কাটিয়ে আজ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কাজ করার জরুরী প্রয়োজন আছে। অ্যাকশন বন্ধ

থাকলেও কোন ক্ষতি হবে না।'[৩১] বাহাত্তরের পরে নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম তাত্ত্বিক রূপকার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মৃত্যু বা অপসারণ এই বিতর্কের সমাধা করে যেতে পারে নি, যার উত্তরদায়িত্ব বর্তেছে নতুন প্রজন্মের কাঁধে।

সূত্র নির্দেশ

১ *দেশব্রতী,* ২২ জানুয়ারী, ১৯৭০, *চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ,* নয়া ইস্তাহার প্রকাশনী, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পৃষ্ঠা—৯৬;

২ *তদেব,* পৃষ্ঠা—৯৫;

৩ *দেশব্রতী, 'গণমুক্তি ফৌজ গড়ে এগিয়ে চলুন'*—১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১, *তদেব,* পৃষ্ঠা—১৩০-৩১;

৪ সব ঘটনাগুলির বিবরণই স্থানীয় সংবাদপত্র *'নবদ্বীপ বার্তা'* থেকে নেওয়া হয়েছে। তারিখগুলি যথাক্রমে *১০ মে, ১৯৭০ (পৃষ্ঠা—৩), ৬ জুন, ১৯৭০ (পৃষ্ঠা—৩), ২১ জুন ১৯৭০ (পৃষ্ঠা—৩),*

৫ সাতষট্টি সালের জুন মাসে কোনো এক সংগঠক কমরেড, যিনি গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিপ্লব গড়ে তোলায় লিপ্ত ছিলেন, তাঁকে লেখা একটি চিঠিতে চারু মজুমদার *'সংগ্রামের নতুন ধরণ'* হিসাবে পুলিশের ওপর আঘাত হানার লাইন দেখান। 'পুলিশ হুকুমের দাস, কাজেই হুকুম এলেই ওরা আক্রমণ করবে। আমরা আঘাত হানলে একমাত্র ওরা ভয় পাবে এবং প্রতি আক্রমণ করতে ইতস্ততঃ করবে।'

(চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, পৃষ্ঠা—১৬৪)

এছাড়াও ১৯৭০-এর নভেম্বর দিবস, উপলক্ষ্যে সি.পি.আই (এম-এল)-এর প্রচারিত একটি লিফলেটে (পুলিশের প্রতি) পুলিশের ওপর এই হামলার সপক্ষে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয় ঃ—

"...এখন কংগ্রেস থেকে সি.পি.এম পর্যন্ত সমস্ত ভোটের পার্টিগুলোকে দিয়ে তারা (ভারতবর্ষের জমিদার ও দালাল পুঁজিপতিরা) এই রাষ্ট্রযন্ত্র চালাচ্ছে সেই ইংরাজ আমলের মতই এবং তেমনভাবেই সেই পুলিশকে দিয়েই শ্রমিক, কৃষক ও সমস্ত মেহনতী মানুষকে হত্যা করছে। পুলিশ তাদের ভাড়াটে হত্যাকারী। ...এই ধরা যাক ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের কথা। কলকাতায় রাস্তায় পুলিশ তার নিজের হিসাব মতই নরনারী, বৃদ্ধশিশু নির্বিশেষে ৮১ জন কৃষককে লাঠিপেটা করে খুন করেছিল। তারা ছিল নিরস্ত্র, তারা ছিল নিরীহ, তারা খাদ্যের দাবীতে একটা শান্তিপূর্ণ ভুখা মিছিল করেছিল। তারা বিপ্লব করতে যায়নি, তারা ক্ষমতাদখল করতে যায়নি। তবু তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। মেয়ে বাচ্চা বুড়ো কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি। সেদিন এই বীভৎস হত্যালীলা করানো হয়েছিল কাদের

দিয়ে? পুলিশকে দিয়ে। পুলিশ বিনা দ্বিধায় এই কাজ করেছিল। যে কৃষক তাদের অন্ন জোগাচ্ছে বিনা দ্বিধায় তাদের হত্যা করেছিল এবং হত্যা করেছিল পাইকারি হারে।"

"...এতকাল ভারতবর্ষে কংগ্রেসী আমলে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের বড় বড় আন্দোলন হয়েছে কিন্তু কখনো এ ধরনের আন্দোলন হয়নি। এতকাল প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র অর্থাৎ পুলিশ মারফৎ মেহনতী মানুষকে হত্যা করে এসেছে, এবার শুরু হয়েছে পুলিশ হত্যা। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী ও তার পুলিশের হাত থেকে কৃষক-শ্রমিক-যুবছাত্র-জনতা হত্যার একচেটিয়া অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন। তাই তারা জমিদার-জোতদার-মহাজন-মিলমালিক-মজুতদারদের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশও খতম করছেন। পুলিশ তারা খতম করবেনই। পুলিশ তাদের খতম করতেই হবে—কে সাধারণ পুলিশ, কে অসাধারণ পুলিশ তা বাছবিচার করলে চলবে না। কারণ, বরাবর এই গোটা পুলিশবাহিনী দিয়েই মানুষ মারা হয়ে থাকে এবং এখনও এই গোটা পুলিশবাহিনী দিয়েই বিপ্লবী আন্দোলন ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে এবং বিপ্লবীদের ও বিপ্লবী জনতাকে হত্যা করা হচ্ছে। ...সাদা পোষাকের গোয়েন্দা পুলিশ থেকে ট্রাফিক পুলিশ পর্যন্ত গোটা পুলিশ বাহিনীকে এই কাজে লিপ্ত করা হয়েছে। তাই গোটা পুলিশবাহিনীই এখন বিপ্লবী জনতার ও বিপ্লবীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে।"

৬ কৃষ্ণনগরের নকশালপন্থী কর্মী *শুভ্রাংশু ঘোষের বিবৃতি, পুলিশের রেকর্ড* থেকে উদ্ধৃত, বিবৃতিটি দেওয়া হয়েছে ১৬.৭.৭১ তারিখে;

৭ সবাই মৃত;

৮ *পুলিশ ফাইল থেকে উদ্ধৃত;*

৯ *তদেব;*

১০ *সুমন্ত বন্দোপাধ্যায় ঃ 'নকশালবাড়ি আন্দোলন ও সত্তর দশক'; 'সত্তর দশক'*, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা—১২-১৩;

১১ *নভেম্বর দিবস*, ১৯৭০-এ *প্রকাশিত;*

১২ *নবদ্বীপ বার্তা*, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০, পৃষ্ঠা—৩;

১৩ ৩০.৯.৭০ — কৃষ্ণনগরে সাদা পোষাকে প্রহরারত একদল পুলিশকর্মীর ওপর নকশালপন্থী যুবকদের আক্রমণ হয়। পুলিশও গুলি চালায়।

২৭.১০.৭০ — ডি.আই.বি এ্যাসিস্ট্যান্ট বিমল বটব্যালের বাড়িতে নকশালপন্থীরা বোমা নিক্ষেপ করে।

৩১.১০.৭০ — ডি.আই.বি সাব-ইন্সপেক্টর অশ্বিনী কুমার দত্তর ওপর নকশালপন্থী কর্মীরা চড়াও হয়। তিনি পালাতে সক্ষম হন।

৫.১১.৭০ — চাকদহ শহরে চব্বিশ পরগণা জেলার রাজারহাট পুলিশ স্টেশনের

কর্মী নৃপেন মুখার্জীর ওপর আক্রমণ হয়। তিনি প্রাণে বেঁচে যান।

১২.১১.৭০ — কৃষ্ণনগরে হাই স্ট্রীটে ডিউটীরত ট্রাফিক কনস্টেবল শিবনাথ পাল (C/433)-এর ওপর বোমা ছোঁড়া হয়। কেউ আহত হয়নি।

১৪.১১.৭০ — কৃষ্ণনগরে ডব্লিউ-সি প্যারীমোহন দে-র পাত্র-লেনস্থিত বাসস্থানে বোমা ছোঁড়া হয়। কেউ হতাহত হয়নি।

৬.১২.৭০ — কৃষ্ণনগরে ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স-এর কর্মী (নং ৭৯২৬৪) গোপাল দাসকে ছুরি মারা হয় ও পরদিন তিনি মারা যান।

মূল লেখাতে উল্লিখিত পুলিশকর্মী হত্যার ঘটনাগুলি এখানে দেওয়া হল না। সবগুলিই পুলিশের রেকর্ড (Monthly Review) থেকে প্রাপ্ত।

১৪ *'আমরণ জাগরণ'—রুবি)/শহীদ স্মরণে*, সৈন্য, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা—২০;
এ প্রসঙ্গে জানানো যায় যে নদীয়াতে খতম নীতি কার্যকরী করার জন্য অসীম চ্যাটার্জী সত্তরের দুর্গাপূজোর সময় (প্রথম পার্টি কংগ্রেস-এর পর) চাকদহ জেলার গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের সঙ্গে একটা মিটিং করেন, যেখানে উপস্থিত ছিলেন চাকদহের নিতাই সরকার, কল্যাণীর অমর আদিত্য চৌধুরী, কৃষ্ণনগরের নাদু চ্যাটার্জী, কল্যাণীর অজয় চৌধুরী প্রমুখ। এই মিটিং-এ অসীম ডেবরা-গোপীবল্লভপুরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। শান্তিপুরের কোন প্রতিনিধির অনুপস্থিতি এখানে লক্ষ্যণীয়। 'কোন এক জায়গার অবস্থা' বলতে লেখিকা ডেবরার কথাই সম্ভবতঃ বোঝাতে চেয়েছেন।

১৫ *তদেব, পৃষ্ঠা*—২০;

১৬ বর্তমানে *রাণাঘাট (পশ্চিমের) কংগ্রেসী বিধায়ক;*

১৭ চাকদহের *অরুণ ভট্টাচার্যের* বিবৃতি;

১৮ *The Statesman*, pp. 5.
উপরোক্ত হত্যা ও পাল্টা হত্যার বিবরণ মেলে ১৯৭০ সালের গোয়েন্দা পুলিশের Monthly Report-এ;

১৯ পুলিশের *'Monthly Report'* পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশেষত সত্তর ও তার পরবর্তী বছরগুলিতে সি.পি.আই (এম-এল) যুবকরা যতগুলি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে তার বিরুদ্ধে *302 PC* দায়ের করা হয়েছে, কিন্তু সি.পি.আই (এম)-এর দ্বারা নথিভুক্ত হত্যাকাণ্ডের সাপেক্ষে কোন পুলিশ কেস দায়ের করার চিহ্ন নেই। ধরে নিতে হবে কি যে 'নকশাল নিধনে' পুলিশের প্রচ্ছন্ন মদত ছিল?

২০ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে নদীয়ায় কো-অর্ডিনেশন এবং সি.পি.আই (এম-এল) পর্বে সবচেয়ে বেশী অর্থসংগ্রহ হত কৃষ্ণনগর থেকে;

২১ *গোয়েন্দা পুলিশ ফাইল* থেকে উদ্ধৃত;

২২ *তদেব;*

২৩ *তদেব;*

২৪ *তদেব;*

২৫ *তদেব;*

২৬ *নবদ্বীপ বার্তা*, ৫ জুলাই, ১৯৭০, পৃষ্ঠা—৩; ঘটনাটি সত্তর সালের জুন মাসে ঘটেছে বলে উল্লিখিত হয়েছে;

২৭ ব্যক্তিগত সাক্ষাতে নাদু চ্যাটার্জী এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, তিনি প্রতি মুহূর্তে এই কামনা করছিলেন যে জোতদারটি যেন নির্দিষ্ট জায়গা দিয়ে না যায়। অবশ্যই এক্ষেত্রে তাঁর প্রতিক্রিয়া 'খতম' নীতির যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দেহজাত ছিল না। কিন্তু একজন জেলাস্তরের নেতৃত্বের তরফে মূল একটি নীতি রূপায়ণে এই 'ভীতি' বা পেটিবুর্জোয়া সুলভ পিছুটান, 'খতমকার্যের' সঙ্গে যুক্তির বাঁধনকে আলগা করে দেয়। এর জন্যই বাস্তবে 'খতমকার্য' হয়ে পড়ে লাগামছাড়া, হিসাব বহির্ভূত ও কার্যতঃ কেবল 'লুম্পেন'দের হাতের অস্ত্র।

২৮ 'Naxalbari and After' : Frontier Anthology : Vol. 1–'Another Report on Birbhum' by A.B., July 10, 1971, pp. 124;

২৯ *পুলিশ রেকর্ড* থেকে সংগৃহীত;

৩০ *'আমি থামবো না'*ঃ সমবায় মুদ্রণী লিমিটেড, কৃষ্ণনগর নদীয়া থেকে *তাপস চক্রবর্ত্তী* কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৯৭৭—অক্টোবর;

৩১ *পুলিশ রেকর্ড* থেকে প্রাপ্ত;

৩২ উপরোক্ত 'এ্যাকশনে' *দাদুপুরের চবণ ঘোষ* সামিল হয়। পুলিশের কাছে ধরা পড়ার পর দাদুপুরের পেশায় রাখাল চরণ ঘোষ এই বিবৃতি দেয় যে রবি সাঁতরার বিধবা প্রণয়িনীর দাদা ছিল চিন্তামণি ঘোষ। সম্পর্কে প্রতিবন্ধক মনে করায় রবি সাঁতরাই চিন্তামণিকে খতমের উদ্যোগ নেয়।

৩৩ *জনৈক আই.পি.এস অফিসার (এস.এস.পি., আই.বি)*-এর ১৯.১১.৭১ তারিখে পাঠানো একটি সরেজমিন তদন্ত রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত;

৩৪ এক্ষেত্রে চারু মজুমদারের আশঙ্কা যেন অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িক হতে দেখা গেছে। এই লেখায় *'এ্যাকশন স্কোয়াডের' দায়িত্ব* নিয়ে তিনি লিখেছিলেন—

"গেরিলা ইউনিটগুলো খতম অভিযান চালাচ্ছে—এখন পার্টি ইউনিটগুলোর দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই খতম অভিযান চালানোর সাথে সাথে ব্যাপক কৃষক জনতাকে রাজনীতি সচেতন করে তুলতে হবে। খতম অভিযানের একটাই উদ্দেশ্য তাহল গ্রামাঞ্চলে জমিদার, মহাজন, প্রভৃতি সামন্তশ্রেণীগুলির প্রভুত্ব ও ক্ষমতাকে শেষ করে দিয়ে শ্রমিক-কৃষকের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা।"

কিন্তু বাস্তবে নদীয়াতে অন্ততঃ যেভাবে 'এ্যাকশনগুলি' ঘটেছে দেখা যায় তা হল সত্তরের মাঝামাঝি থেকে 'খতম' নীতি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালে শ্লোগান

লেখা ছাড়া কোনরকম রাজনৈতিক প্রচার চলেনি। নদীয়ার গ্রামাঞ্চলেও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে পার্টির প্রচারক স্কোয়াড হিসাবে কোনও স্কোয়াডকে আলাদাভাবে তৈরী করা যায়নি। চারু মজুমদারের উপরোক্ত লিফলেটটিতে বলা হয়েছে যে "স্কোয়াডগুলোকে স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর কখনই ছেড়ে দেবেন না। ওদের রাজনৈতিক চেতনার স্তরের ওপর সংগ্রামের বিস্তৃতি ও নতুন নতুন ক্যাডার পাওয়া নির্ভর করছে। স্কোয়াডগুলির রাজনৈতিক চেতনার মান বাড়ানোর গুরুত্ব আরও বেশী কারণ স্কোয়াডে Lumpen element আসবে এবং তারা স্কোয়াডকে Banditry-র পথে নিয়ে যাবে ...স্কোয়াড লীডারকে রাজনৈতিক ক্যাডারে পরিণত করতে হবে, তবেই স্কোয়াডটির ওপর পার্টির নেতৃত্ব দৃঢ় হবে।"

কিন্তু আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণিত করে নদীয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের এ্যাকশন স্কোয়াডগুলো বাস্তবিকই bandit group-এ পরিণত হয়েছিল। ব্যাপক কৃষক জনতাকে বিপ্লবের কারণে উদ্দীপিত করার জন্য দীর্ঘায়িত সংগ্রাম গড়ে তোলার বদলে 'কেবল খতম' কার্যের মাধ্যমে সন্ত্রাস কায়েম করার নীতিকেই আঁকড়ে ধরা হয়েছিল। ফলে 'নেতা'র অনুপস্থিতিতে পালিয়ে যাওয়ার ঝোঁক তৈরী করে দেয়।

('After action task' শীর্ষক একটি Leaflet থেকে
উদ্ধৃত যেটি C.M.-এর নামে প্রচারিত হয়েছিল)

৩৫ চতুর্থ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আড়ংঘাটার অজ্ঞাতনামা পত্রলেখকের চিঠি থেকে জানা গেছে;

৩৬ *পুলিশ রেকর্ড থেকে উদ্ধৃত;*

৩৭ অজ্ঞাতনামা লেখকের চিঠি থেকে উদ্ধৃত;

৩৮ *পুলিশের কাছে দেওয়া হরিণঘাটা এলাকার এ্যাকশন-স্কোয়াডের কর্মী সাধন দত্ত রায়ের* (বড়দা) বিবৃতি অনুসারে লিখিত;

৩৯ *শুভ্রাংশু ঘোষের* বিবৃতি নেওয়া হয় ১৬.৭.৭১ এবং ১৮.৭.৭১ তারিখে;

৪০ *পুলিশ বিবৃতি অনুসারে লিখিত;*

৪১ যেমন ২২.৪.৭১ তারিখে কৃষ্ণনগর হাইস্কুলের কিছু ছাত্ররা সি.পি.আই (এম-এল) পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে ও মিটিং-এ মৃত নকশালকর্মী অরুণ মুখার্জী ও দুখীরাম রায়-এর স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করে।

৪২ *নবদ্বীপ বার্তা*, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭০, পৃষ্ঠা—৩;

৪৩ শান্তিপুরে এ্যান্টি-নকশাল স্কোয়াড-এর নেতৃত্ব ছিল বাগ-আঁচড়া গ্রামের কংগ্রেস (আর) সমর্থক হরপ্রসাদ ত্রিবেদী-র হাতে, ২০.৫.৭২-র পুলিশ রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত

৪৪ ধৃত এই যুবকদের মধ্যে একজনের নাম ছিল কাজল ও আর একজন নিত্যগোপাল। ধৃত গবেষকদের পরিচয় ছিল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়েব গণিতের মিহির কুমার চক্রবর্তী ও পদার্থবিদ্যা বিভাগের অশোক বসু। মিহির কুমার চক্রবর্তীর পুলিশের কাছে

দেওয়া বিবৃতি—যা আগেই উল্লিখিত হয়েছে এবং Frontier Anthology-এর (Vol. I) –The Hounds of West Bengal, pp. 203—থেকে নামগুলি সংগৃহীত

৪৫ *পুলিশ ফাইল* থেকে উদ্ধৃত;

৪৬ *নকশালকর্মীদের আত্মবিশ্লেষণের এই দলিলগুলি অমিয়কুমার সামন্তর* সৌজন্যে প্রাপ্ত, পরিশিষ্টে কিছু দ্রষ্টব্য;

৪৭ *তদেব;*

৪৮ *তদেব;*

৪৯ *চারু মজুমদার ঃ 'ফসল কাটার আন্দোলন সম্পর্কে',* দেশব্রতী, ২০ নভেম্বর, ১৯৭১, চারু মজুমদার রচনাসংগ্রহ পৃষ্ঠা—১৪১;

৫০ *১৪.৪.৭২ তারিখে স্ত্রী লীলাকে লেখা চারু মজুমদারের শেষ চিঠি,* আজকাল, ২৪ মে, ১৯৯২, পৃষ্ঠা—১১;

৫১ *চিঠি ৪ এপ্রিল, ১৯৭১, আন্দোলনের সাথী,* ১৯ মে, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা—১৫।

শেষকথনে নদীয়ায় নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান

ষাটের দশকে গোটা দেশের সঙ্গে নদীয়া জেলাতেও রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে উঠেছিল। পিছনে ছিল মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থাজনিত ক্রোধ এবং অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী-উদারনৈতিক আদর্শের মূল্যবোধে এসেছিল ভাঁটার টান। বামপন্থী সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলির নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দ্বিধা এবং সুবিধাবাদী সাংগঠনিক নীতি একদিকে ব্যাপক কমিউনিস্ট কর্মীদের কাছে আত্মপ্রতারণার সামিল হয় এবং অন্যদিকে সাধারণ মানুষকে অসহিষ্ণু করে তোলে। উত্তর-চৌষট্টির বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির চরিত্র ছিল মিশ্র। 'মধ্য' ও 'বাম' উভয় শিবিরই ছিল গা-ঘেঁষাঘেষি করে। অচিরেই এই আপাত-ঐক্যের অন্তরালে মতাদর্শগত দুর্যোগ অনিবার্যভাবেই এগিয়ে আসে। কিভাবে পরিস্থিতি ক্রমে জঙ্গী পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ রয়েছে প্রদীপ বসুর 'নকশালবাড়ির পূর্বক্ষণ ঃ কিছু পোস্ট-মডার্ণ ভাবনা'[১] বইতে। তাঁর মতে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন থেকে (২রা মার্চ, ১৯৬৭) থেকে নকশালবাড়ি বিদ্রোহ (মে ১৯৬৭) পর্যন্ত সময়কাল ছিল সবচেয়ে অগ্নিগর্ভা এবং বিপ্লবের জন্য প্রতিশ্রুতিময়। 'কারণ এই সময়ে আন্তঃপার্টি-সংগ্রাম তার সবচেয়ে পরিণত রূপ গ্রহণ করেছিল।' তাঁর মতে সংশোধনবাদ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্যে ক্রমেই দুটি প্রবণতার আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠছিল—প্রথমটি বিতর্কমূলক বা তাত্ত্বিক ধারা, অন্যটি প্রয়োগপন্থীধারা। এই প্রেক্ষিতটিই, বলা যায়, ব্যাপকভাবে পার্টিকর্মীদের মধ্যে জঙ্গী মনোভাবাপন্ন অংশকে চারু মজুমদারের দলিল ও নকশালবাড়ির ঘটনা সম্পর্কে উৎসাহী করে তোলে।

তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার ঐতিহ্য যে নদীয়া জেলায় ছিল না তা নয়, কিন্তু তত্ত্বগতভাবে অগ্রণী অংশ সাতষট্টির শেষাশেষি বিপ্লবী কাজকর্ম থেকে হয় সরে দাঁড়ান অথবা পার্টির সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন। ফলে নদীয়াতে সাতষট্টি-পরবর্তী কালের ঘটনাপ্রবাহের রাশ চলে যায় রাজনীতির খেলায় অপরিপক্ক এক আবেগপ্রবণ প্রজন্মের হাতে। তত্ত্ব ঘটনাকে অনুসরণ করতে শুরু করে। সব রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই তাৎক্ষণিক চিন্তাপ্রসূত হয়ে দাঁড়ায়। চারু মজুমদারের দলিলের নির্দেশ অনুযায়ী নদীয়ায় নকশালবাদ কৃষকের গোপন সশস্ত্র স্কোয়াড গঠন, বন্দুক দখল, এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখল, গ্রামে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা এসবের ওপরেই নজর দিল, কারণ, 'অ্যাকশনে'র মধ্যে দিয়েই সবচেয়ে ভাল সংশোধনবাদকে পরাস্ত করা যায়।

সি পি.আই (এম)-কে প্রায় 'অথর্ব' প্রমাণ করে শুরুর দিকে এই যুবছাত্রদলের উত্তুঙ্গ আত্মবিশ্বাস 'বিপ্লব' সম্পর্কে এক অতিকথনের দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করেছিল, যা মূলত সত্তর দশক অব্দি এই জেলায় অভ্যুত্থানকে টিকিয়ে রাখে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্ববাদী ঝোঁক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রভুত্ব বিপ্লবকামী পার্টিকর্মীদের মনে চূড়ান্ত বিরক্তি, অসহিষ্ণুতা ও এক প্রত্যাখ্যানের মনোভাব তৈরি করে। ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনে জনতার মেজাজের পারা কতখানি চড়েছিল পার্টি নেতৃত্ব তা মাপতে অস্বীকার করাটাই নকশালবাড়ির সপক্ষে, বলা চলে, প্রধান অনুঘটক। সে সময় পার্টির নেতারা পরিস্থিতির চরিত্র অনুযায়ী না চলে পরিস্থিতিকেই পার্টির উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, অতএব এই 'Piecemeal nature of theoretical solution'[২] ষাটের দশকে বিদ্রোহী ছাত্র-যুব মানসকে প্ররোচিত করে পার্টির বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে।

অনিবার্যভাবেই বাহাত্তর-এর পর থেকে শুরু হয় নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের বিপর্যয়। তত্ত্বের বদলে শুরু থেকেই যেখানে স্বতঃস্ফূর্ততাকে অনুসরণ করা হতে থাকে সেখানে বিপ্লবের নামে সবই গ্রাহ্য হয়। 'War of quick decision'-এ মাও সে তুং বিপ্লবের বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বল সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ (Protracted nature of war) এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধৈর্যই পারে এই শক্তিকে পরাস্ত করতে (...Here impatience is harmful and advocacy of 'quick decision' incorrect...')[৩]। অতএব প্রাতঃরাশের পূর্বেই শত্রুকে সাবাড় করতে হবে এই মনোভাব ক্ষতিকর। সি.পি.আই. (এম-এল)-এর গণসংগঠন বর্জনের ফলে সংকট আরও ঘনীভূত হল। অসংগঠিত জনতার ওপর বিপ্লবী পার্টি নির্ভর করতে পারে না—এ সূত্র কাজে অবহেলিত হল। নদীয়ায় ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও অনিবার্য ব্যর্থতা মাওবাদীদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেয়, কারণ রাজনৈতিকভাবে বিপ্লবের স্তর সেই অব্দি পৌঁছায়নি। উত্তর ও মধ্যভাগ ছাড়া বাহাত্তর পরবর্তী নদীয়ায় 'খতম' ছাড়া কোনো রাজনীতিই ছিল না।

কারণ হিসাবে বলা যায়, নদীয়া জেলার দক্ষিণের এলাকাগুলিতে কৃষক-ফ্রন্টে সি.পি.আই (এম) প্রায় ধারাবাহিকভাবে জমি ও ফসল দখলের আন্দোলন চালিয়ে সি.পি.আই (এম-এল) -এর পালের হাওয়া কেড়ে নিচ্ছিল। কল্যাণীর শিল্পাঞ্চলে (এম-এল)-এর নিষ্ক্রিয়তা, গয়েশপুরে উদ্বাস্তু রাজনীতিকে কেন্দ্র করে সি.পি.আই (এম)-এর ব্যাপক প্রভাববিস্তার এবং খাদ্য-আন্দোলন উত্তর পর্বে উত্তরের চেয়ে জেলার দক্ষিণের এলাকাগুলির তুলনামূলক নিস্পৃহতা, এই সবই দক্ষিণ নদীয়ায় সি.পি.আই (এম)-কে কিছুটা সুবিধাজনক জায়গায় দাঁড় করিয়েছিল।

সত্তর থেকে নকশালবাড়ি বিদ্রোহের এই ত্বরিত অবতরণের প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত যে, বিপ্লবী প্রতিরোধ ভেঙে পড়ার মূল কারণ ব্যাপক সংখ্যায় জনতাকে 'শাসকশ্রেণী ও সংশোধনবাদী'-দের প্রভাবে সংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়। 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', বা 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'—দেওয়ালের এই শ্লোগানগুলি এ বাংলার মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক মানসিকতাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। ছাত্র-যুব সমাজের সেই অত্যুগ্র মেজাজ, বাঁধভাঙা ধৈর্যহীনতা ও চিরাচরিত-কে প্রশ্ন করার ও নাকচ করার স্পর্ধা বাঙালী মধ্যবিত্তের এতদিনের লালিত মূল্যবোধে প্রায় নাকে রুমাল চাপা দেওয়ার মত প্রতিক্রিয়া ঘটায়। সবচেয়ে তীব্র আঘাত লেগেছিল আপামর ভদ্রলোক 'গেরস্ত' বাঙালীর বংশপরম্পরায় গৃহীত, রাষ্ট্র ও সমাজ পোষিত ও সযত্নলালিত 'বাংলার নবজাগৃতি'-র ধারণাটিতে কোপ বসানোয়। যে মূর্তিগুলি বাঙালীর বুদ্ধি ও কৃষ্টির পুরোধা হিসাবে স্বীকৃত ও পূজিত হত, সেই মহিমায় কালিমা লেপন বা শিরচ্ছেদন, বৃহত্তর এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে এই আধিক্যতাকে উদারমনা বাঙালী ভদ্রলোক পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়েছিল। সুযোগ নিয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী। শোধনকারী শক্তিরূপে হিংসার যথেচ্ছ ব্যবহার ও ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করা, নব্য মাওবাদী বাঙালী যুবকের এই দুটি আয়ুধ অপরিমিত ব্যবহারে প্রতিহিংসা ডেকে আনল। নেমে এল শ্বেতসন্ত্রাস। নিস্পৃহ থাকল বাঙালী মানস। বুদ্ধিজীবী শ্রেণী অতএব নকশালবাড়ির হঠকারিতা ও বিভ্রান্তির শিকার হওয়াতে কোনো আপত্তি করেনি। আর যারা সাধারণ বাঙালী অভিভাবক, তাদের কাছে অর্থনীতিবাদকে বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক দাবিদাওয়া, যা কিনা অতিরাষ্ট্রিকতার নামান্তর ছিল (অর্থাৎ চীনকে সেলাম

জানিয়ে), কোনো অর্থই রাখেনি। কোনো পাইয়ে দেবার রাজনীতি নয়, নিখাদ রাজনৈতিক প্রেরণা একটা প্রজন্মকে যখন সর্বস্ব ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে, তখন সেই বিপ্লবীয়ানা পুরোপুরি নৈতিক। রণবীর সমাদ্দারের ভাষায়—'absolutely moral'।[৪]

বুদ্ধিজীবী বা সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া সরিয়ে যদি বিপ্লবের মূল উপাদান কৃষকদের দিকে তাকানো যায় তবে বিপ্লবের অগ্রণী অংশ হিসাবে তাদের ভূমিকাও হতাশ করে। কৃষক আন্দোলন ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর নেতৃত্ব নিয়ে মারিয়াস দামাস ও রণবীর সমাদ্দার তাঁদের বইতে (যথাক্রমে 'Approaching Naxalbari' এবং 'A Biography of the Indian Nation 1947-1997).[৫] পর্যালোচনা করেছেন।

মারিয়াস দামাস মনে করেন যে, ভারতের প্রেক্ষিতে কোন কৃষক আন্দোলন সংগঠনে প্রয়োজন হল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লব-চেতনার সঙ্গে গ্রামীণ কৃষকের সংগ্রামী সচেতনতাকে মিলানো। "...the relatively 'backward' social contexts in which these movements originate are not conducive to instilling in the participants the degree of political sophistication required for the task they have set themselves. Thus in order to defeat the modern state one must have acquired a modern, secular i.e. scientific understanding of the state."[৬]

গ্রামীণ জীবনে শোষণের প্রকৃত চেহারা সম্বন্ধে অবহিত না হলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈপ্লবিক নেতৃত্বে ফাঁক থেকে যায়। মারিয়াস দামাসের মতে এদেশের কি বাম, কি দক্ষিণ, সব শিবিরেই সমাজবিপ্লব সম্পর্কে কিছু বাঁধাগতের ধারণা আছে। বস্তুতপক্ষে দীর্ঘদিনের ব্রিটিশ শাসনের ঐতিহ্য, পরম্পরা ও শিক্ষা এদেশের শিক্ষিত বুর্জোয়া মনস্তত্বকে এভাবেই আষ্টেপৃষ্ঠে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে কোনদিনই গ্রাম ও শহরের রাজনৈতিক বোধের একীকরণ সম্ভব নয়। ফলত, এতাবৎকাল ধরে শহর থেকে গ্রামে বৈপ্লবিক তত্ত্বের রপ্তানী হয়েছে।

রণবীর সমাদ্দারের লেখায় এই মূল জায়গাটিতেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। কেন, সেই ঔপনিবেশিক কাল থেকেই কৃষক আন্দোলন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল? এই সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাল থেকেই জমিজায়গা থেকে সরে এসে শহরবাসী বেতনভুক শ্রেণীতে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে; যারা ঔপনিবেশিক শাসনের আয়নায় নিজেদের চিনেছে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় স্বাজাত্যবোধেও দীর্ণ হয়েছে; যাদের সামন্ত-সংস্কৃতিতে হাঁটু অবধি ডোবা অথচ পাশ্চাত্য বুর্জোয়া উদারনীতিতে দীক্ষা হয়েছে এবং এরা সেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যারা স্বদেশের ইতিহাসে কৃষকের ভূমিকাকে কোনো গুরুত্বই দেয়নি অথচ তাদের অবহেলা, বঞ্চনার খতিয়ান রেখেছে। নীল বিদ্রোহ বা পাবনা বিদ্রোহের মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় এই শহুরে মধ্যবিত্ত উদ্বিগ্ন হয়েছে, চঞ্চল হয়েছে,কলম ধরেছে বা বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু এই সবই উদ্বিগ্ন অভিভাবকের ভঙ্গীতে। এই যে শহর থেকে গ্রামের জন্য উদ্বেগ, তাদের ভালমন্দ তদারকি করার অভ্যাস—তা বাঙালী বুদ্ধিজীবী আয়ত্ত করেছে ঔপনিবেশিক কাল থেকেই। রণবীর সমাদ্দার তাঁর চিত্রণে অসাধারণ অনুপুঙ্খে বিশ্লেষণ করেছেন বিদ্যাসাগর থেকে ফজলুল হক, বঙ্কিম মুখার্জী (বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কিষাণ সভার অন্যতম সদস্য) থেকে চারু মজুমদার পর্যন্ত সেই একই ঐতিহ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস। শহর থেকে গ্রামের কৃষক বিপ্লবে তত্ত্ব ও নেতৃত্ব যোগানের ইতিহাস। প্রশ্ন উঠতেই পারে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যদি গ্রামের রাজনীতির

দিশা নির্ধারক হয়, কৃষকশ্রেণী তা মেনে নিল কেন? আসলে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা ভূমিগত সম্পর্কের পরতে পরতে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে, কৃষক সম্প্রদায় কখনোই একটি সুসংহত একক অস্তিত্বে পরিণত হতে পারেনি। ফলে জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমগ্র কৃষকশ্রেণী এককাট্টা হয়েছে, ইতিহাসে এ দৃশ্য বিরল। কৃষকশ্রেণীর নিজস্ব শ্রেণীগত অবস্থান, কাঠামো ও স্বার্থবোধ সবসময়ই তাদের একটি সীমায়িত বৃত্তে আবদ্ধ রেখেছে। ফলে নিম্ন-কৃষক, মধ্য বা ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে যখন, তখন শ্রেণীগত ভিন্নতা বোধই তার বিদ্রোহী চেতনার নিয়ামক থাকে। এই খণ্ডিত, স্বার্থবাহী বিদ্রোহী চেতনা আবার প্রায়শই সম্প্রদায়গত-বোধেও দুষ্ট হয়, যা তার শ্রেণীচেতনার উন্নয়নে বাধাস্বরূপ। শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাকচাতুর্য এইসব ধর্মবোধপীড়িত কৃষকশ্রেণীকে নিজেদের নির্দেশিকা দ্বারা আবদ্ধ রেখে তাদের স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে পরিণত হতে দেয়নি।

এই "surrogate enlightenment" বা ওপর থেকে আলো দিয়ে পথ চিনিয়ে দেওয়ার প্রয়াস, তা বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষক সমাজকে এক অদ্ভুত শ্রেণীসম্পর্কে দাঁড় করেছে। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে গ্রামের রায়তদের অবস্থা বা 'কৃষকের কথা' ছিল একটি 'ইস্যু' যা, রাষ্ট্র, জাতি বা বৃহত্তর সমাজ-অর্থনীতি ইত্যাদির প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় চর্চার বস্তু। কিন্তু যদি কৃষকদের তরফে কখনো কোন স্বাধীন উত্থানের সম্ভাবনা দেখা দিত, যা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গড়ে তোলা দীর্ঘদিনের সামাজিক মূল্যবোধে ও রাষ্ট্রীয় ধারণায় বিন্দুমাত্র ধাক্কা দিত, অমনি এই অভিভাবকরা বিদ্রোহী কৃষকদের সামনে লক্ষ্মণরেখা এঁকে দিতে ব্যস্ত হত।

সমাদ্দার দেখিয়েছেন যে, তিতুমীর-এর বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় ইয়ং-বেঙ্গল-এর মত একটি র‍্যাডিকাল বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী যে সন্ত্রস্ততা দেখিয়েছিল তা স্পষ্ট হয়েছিল 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় এই কৃষক অভ্যুত্থানকে 'Mahometan Fanatics' বলে আখ্যাত করায়। অর্থাৎ মূল প্রচেষ্টা ছিল জাতীয়তাবাদের একটা নির্দিষ্ট চেহারা তৈরি করে দেওয়া ও তারই প্রেক্ষাপটে শোষক-শোষিতের সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব কদ্দুর যাওয়া উচিত, তা বুঝে নেওয়া। সমাদ্দারের কথায় —'A national cultural edifice was to be constructed, which could be the reference point for all segments of Indian society." (pp. 48) কালক্রমে বিংশ শতকে বাঙালী জাতি বলতে এক শহুরে গোষ্ঠী তার বিশেষ অঙ্গচিহ্ন নিয়ে নিজেকে নির্মিত করেছে; শিক্ষায়, ভাষায়, মূল্যবোধে সে নিজেকে একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে চিহ্নিত করেছে যা মহানগর থেকে সদর হয়ে মফঃস্বলেও গৃহীত ও স্থাপিত হয়েছে। এই যে নিজেকে একটি 'জাতি' হিসাবে নির্মাণ করল বাঙালী, সেই ইমেজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই মূলত খাপ খেয়ে এঁটে গেল। এই ইমেজ নাগরিক ও শালীন, আলোকিত ও নেতৃত্ব দিতে পারগ। তখনও শ্রমিক শ্রেণী বলতে স্বতন্ত্র ও সংহত কোনো শ্রেণী গড়ে ওঠেনি, যা বাঙালীর এই ইমেজকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। অতএব কৃষক শ্রেণী বাঙালীর বেঁধে দেওয়া এই খর্বকায় 'জাতীয়তার' ইমেজকে তার গুরু বলে স্বীকার করে নিল; কোন স্বতন্ত্র কৃষক জাতীয়তাবাদী সত্তা গড়ে উঠতেই দেওয়া হল না। রণবীর সমাদ্দার তাঁর বইতে বিশদে দেখিয়েছেন কিভাবে এই শহুরে মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব ১৯৩০-এর দশক থেকে ক্রমে গড়ে ওঠা সংগঠিত শ্রমিক অসন্তোষ বা এদেশের মুৎসুদ্দি সাংবিধানিক শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা কৃষক বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে। নিজেকে বাঁচানোর জন্য গ্রামের ধনী কৃষক ও জোতদারদের সঙ্গে নিয়ে মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব জমিদারি প্রথা তুলে দিয়ে

মুখরক্ষার মত সাংবিধানিক সংস্কার আনার চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষকের হাতে সরাসরি জমি তুলে দেওয়ার মত বৈপ্লবিক দাবীতে তারা বিমুখ ছিল। অতএব জমিদারি ব্যবস্থা তুলে দেওয়াও গেল ও একইসঙ্গে কৃষকবর্গের সামন্তবিরোধী অভ্যুত্থানটিরও নটেগাছটি মুড়িয়ে দেওয়া হল।

নকশালবাড়ি যুগে শহুরে মধ্যবিত্তের একটি দিক যারা বামপন্থী সংসদীয় রাজনীতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপট নিয়ে মগ্ন ছিলেন, তাঁরা খুব দক্ষতার সঙ্গে কৃষকদের অর্থনীতিবাদী দাবিদাওয়া নিয়ে এগিয়ে যান। সংসদীয় নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি অগাধ আস্থা সেই ব্যাপক প্রতিরোধের সময়েও শহুরে মধ্যবিত্তকে নির্বাচন কেন্দ্রের অভিমুখী করে রেখেছিল [সারণী দ্রষ্টব্য]। সংসদীয় নিয়মতান্ত্রিকতাই যে শেষমেষ কার্যকরী হয় তা প্রমাণ করতেই সাতাত্তরে ক্ষমতায় ফিরে আসা বামফ্রন্ট সরকার ভূমিসংস্কারে হাত দেয়। ১৯৮০ সালের মার্চ মাস অব্দি পরিসংখ্যানের বিচারে মোট ১১৭৬ লক্ষ একর জমি উদ্ধার করা হয়, যার ৬.৩১ লক্ষ একর অংশ ১০.৪৪ লক্ষ ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বিলিবন্টন করা হয়। নদীয়া জেলায় এই ভূমিবন্টনের পরিসংখ্যান হল এইরকম—খাস জমি ২৪, ৪৩৮ একর, বন্টনীকৃত জমি ১৩,৬৫৮ একর, প্রাপক রায়তের সংখ্যা ৫০, ০১৬ জন। ১৯৭৮ সাল থেকে 'অপারেশান বর্গা' প্রকল্পের অধীন ভাগচাষিদের তালিকাভুক্তি করার যে কাজ শুরু হয়, তাতে নদীয়া জেলায় ১২,৯৬,১৩৫ জনের মধ্যে ৫১,৫০২ জন নথীভুক্ত হয়। এছাড়াও গ্রামীণ ক্ষেতমজুর, কারিগর ও মৎস্যজীবিদের মধ্যে বাস্তুজমিসংক্রান্ত ১৯৭৫ সালের আইন অনুযায়ী পাট্টাপ্রাপকদের সংখ্যা ৮২৭২ জন।[৭]

প্রচলিত ব্যবস্থাকে হয়ত একটু তাড়াতাড়িই প্রশ্ন করা ও পাল্টানোর কথা ভেবেছিল নকশালবাড়ি। তাই শুরুর সেই ইতিহাস স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত হয় মধ্যসত্তরেই। বিশুদ্ধ আবেগের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে ফিনিক্স পাখির মত নকশালবাড়ি আবার উঠেছে— 'অভ্যুত্থানের' পথে নয়, 'আন্দোলনের' পথে।

সূত্র নির্দেশ

১ নকশালবাড়ির পূর্বক্ষণ ঃ কিছু পোস্টমডার্ন ভাবনা-—প্রদীপ বসু, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯৮; পৃ. ১৪০.

২ A biography of India Nation 1947-1997, ch.–'Promises of Revolution'; –Ranabir Samaddar; sage publications; New Delhi, First Published in 2001; pp. 53.

৩ 'War of quick decision' -- 'Strategy in China's Revolutionary War'-- Mao Tse Tung, selected writings, NBA (Pvt.) Ltd., Calcutta, December 1967, pp, 231.

৪ Ranabir Samaddar. ibid; pp. 59;

৫ 'Approaching Naxalbari' –Marius Damas, Radical Impression, Calcutta, First edition 1991;

৬ ibid; pp. 219.

৭ ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের প্রচার পুস্তিকা 'Left Front of West Bengal and Land Reforms : 1984.'

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Select Bibliography)

প্রাথমিক উপাদান (Primary Sources)

চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ ঃ নয়া ইস্তাহার প্রকাশনী, সিগালস ইণ্ডিয়া রেড টাইডিংস এর পক্ষে, উত্তর চব্বিশ পরগণা, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৯৭, ('দেশব্রতী' পত্রিকায় প্রকাশিত ও পরবর্ত্তীতে এক খণ্ডে সংকলিত);

'দেশব্রতী' পত্রিকার প্রকাশিত বিবিধ প্রবন্ধ ঃ

— 'লিন পিয়াও তত্ত্বের প্রয়োগে ভারতে জনযুদ্ধের বিকাশ, কমরেড চারু মজুমদারের ভূমিকা ঃ পিকিং-এর পর্যালোচনা'—২৯ জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার, ১৯৭০;

— 'শ্রী কাকুলামের হত্যাকাণ্ডের বদলা নেবে পশ্চিমবাংলা'—১৫ জানুয়ারী, '৭০;

— 'পত্রিকার দুনিয়ায়', শশাঙ্ক—২৪ আগষ্ট, ১৯৬৭;

— 'পত্রিকার দুনিয়ায়', শশাঙ্ক—৮ জানুয়ারী, ১৯৭০;

— 'ক্ষুধিত নবদ্বীপের লড়াই'—তদেব, এছাড়াও, '৩১ আগষ্ট, ১৯৬৭, ৭ সেপ্টেম্বর, '৬৭; ১৮ জুলাই '৬৮, ২৫ জুলাই '৬৮—দ্রষ্টব্য।

'সমুদ্র' পত্রিকা—প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংকলন, নভেম্বর, '৬৭;

'ছাত্র দরদী'— অনিল বিশ্বাস ও দীপক বিশ্বাস-এর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ৩ জুন, ১৯৬৪, ৩ আগষ্ট. ১৯৬৪, ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪, ৩ জানুয়ারী, ১৯৬৫, ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫, ৮ এপ্রিল, ১৯৬৫;

'ছাত্র হিতৈষী'—নদীয়া জেলা ছাত্র ফেডারেশন-এর মুখপত্র, বুলেটিন নং ৪, ৭ এপ্রিল, ১৯৬৪. সম্পাদক অনিল বিশ্বাস,

কৃষ্ণনগর কলেজ পত্রিকা. ১৯৬৩, ১৯৬৪;

'দেশহিতৈষী'— ৬ নভেম্বর, ১৯৬৪, ১০ ফেব্রুয়ারী, '৬৭, ২ জুন, '৬৭, ৯ জুন, '৬৭, ৭ জুলাই '৬৭, ২১ জুলাই '৬৭—সংখ্যাগুলি দ্রষ্টব্য;

স্পেশাল ব্রাঞ্চ রিপোর্টস ঃ বিস্তারিত বিবরণ প্রতিটি পরিচ্ছেদের শেষে সূত্র নির্দেশে দেওয়া হয়েছে;

নদীয়া জেলায় মাওবাদী চিন্তা ও পথের সঙ্গে জড়িত বহু ব্যক্তির সাক্ষাৎকারই এই গবেষণাগ্রন্থের কাঠামো তৈরী করে দিয়েছে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত নকশালবাড়ি কর্মীদের অপ্রকাশিত গোপন দলিল ও ইস্তাহার।

বই ঃ

অনিল আচার্য (সম্পাদিত)— সত্তর দশক ঃ সামাজিক-অর্থনীতিক-সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন, অনুষ্টুপ, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, বইমেলা, ১৯৯৪;

অমিত রায় ঃ *অন্তরঙ্গ চারু মজুমদার,* র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৯৭;

অমলেন্দু সেনগুপ্ত ঃ *জোয়ার ভাঁটায় ষাট-সত্তর,* পাল পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারী, ১৯৯৮;

আজিজুল হক ঃ *কারাগারে ১৮ বছর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯০; '

নকশালবাড়ি ঃ *বিক্ষোভ-বিদ্রোহ-বিপ্লব এবং রাশিয়া',* ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দেওয়ালী, ১৯৯১;

কাফি খাঁ ঃ *তেলেঙ্গানা বিপ্লব,* র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৯৬;

গোবিন কাঁরাড় ঃ *কমিউনিস্ট ভাঙ্গন ও বিরোধ ঃ শেষ কোথায়?* র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব, নভেম্বর, ১৯৯৩;

তরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *নকশালবাদী রাজনীতির বিভিন্ন ধারা,* প্রত্যয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জুলাই, ১৯৭৮;

দীপেশ চক্রবর্তী ঃ ওঁরা আর এঁরা—অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৬;

ধনঞ্জয় রায় (সম্পাদিত) ঃ *রংপুরের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন,* রত্না প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২১ নভেম্বর, ১৯৮৬;

নিত্যানন্দ ঘোষ ঃ *মানবাধিকার ও বিহারে কৃষক আন্দোলন;* চেতনা প্রকাশন, বারাসত, উত্তর চব্বিশ পরগণা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৯৯৬;

প্রমোদ সেনগুপ্ত ঃ *বিপ্লব কোন পথে? (মার্কসবাদ না সন্ত্রাসবাদ?),* নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি, প্রথম সংস্করণ, ১ মে, ১৯৭০;

বদরুদ্দীন উমর ঃ *বাঙলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা;* ধ্রুপদী, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৮০;

মঞ্জুবাণী সেন সরকার ঃ *বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ সরকার,* প্রকাশক অসীম সেন, কৃষ্ণনগর, কালীপুজা, ১৩৯৯;

হরিনারায়ণ অধিকারী ঃ *ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও কিছু ঘটনাবলী,* দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ, অক্টোবর, ১৯৮৮;

সৌরেন বসু ঃ *চারু মজুমদারের কথা,* পিপ্‌লস বুক সোসাইটি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৮৯;

পুস্তিকা ও সাময়িকী ঃ (Booklet and Periodicals)

দীপঙ্কর চক্রবর্তী ও রতন খাসনবিশ (সম্পাদিত)—*অনীক, নকশালবাড়ির পঁচিশ বছর*-বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৩-৪, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯২;

স্বপন দাসাধিকারী (সম্পাদিত)—*জলার্ক* ঃ সত্তরের শহীদ লেখক-শিল্পী সংখ্যা, গণসংগীত অনুপূরক ক্রোড়পত্রসহ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬—জুলাই, ১৯৯৬;
অধুনা জলার্ক ঃ জানুয়ারী, ১৯৯৭—মার্চ ১৯৯৭;
এবং জলার্ক ঃ সুশীতল রায়চৌধুরী সংখ্যা, প্রথম বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা জুলাই—সেপ্টেম্বর, '৯৭;
এবং জলার্ক ঃ সত্তরের শহীদ-লেখক-শিল্পী সংখ্যা (৩য়), প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী—মার্চ, ১৯৯৭;

নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন ঃ যে গল্পের শেষ নেই; প্রকাশক ঃ অমর ভট্টাচার্য ঃ নয়া ইস্তাহার প্রকাশনী, আগরপাড়া, বইমেলা, ১৯৯৮;

সন্দীপন মিত্র (সম্পাদিত) ঃ *চারু মজুমদারের মৃত্যু অথবা হত্যা* (সংবাদপত্র ও সাময়িকীর দর্পণে) নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭;

প্রণবেন্দু রায় (সম্পাদিত)—*আন্দোলনের সাথী* (নকশালবাড়ি দিবসে বিশেষ সংখ্যা), বর্ষ ৬ (১৮), সংখ্যা ১৮, ১৯ মে, '৯৭;

চন্দন রায় (সম্পাদিত) ঃ *ক্রান্তিকাল,* ১ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৯৭;

শংকর মিত্র ঃ *'সি.পি.আই (এম-এল)-এর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে'; মার্কসীয় দিশা,* দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা. ২৫ জানু, '৮৫, দ্বিতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যা, ১৮ মার্চ, '৮৫; তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৬ জুলাই, '৮৫; তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪ আগস্ট, '৮৫;

দেবদাস আচার্য ঃ *আত্মচরিত* (সকালের আলোছায়া), *গল্পসরণী,* হেমন্ত-শীত-বসন্ত, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪০৩;

সৈন্য পত্রিকা ঃ ১৯৮৭, নকশালবাড়ি সংখ্যা;

'ভাষা' ঃ বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯২;

'আমি থামবো না'—প্রকাশক তাপস চক্রবর্তী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ১৯৭৭, অক্টোবর;

অমর ভট্টাচার্য (সম্পাদনা) ঃ *নকশালবাড়ির প্রভাবে শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্র;* মে '৯২;

এখনি ঃ ২৫ মে, ১৯৭৯;

প্রতিবাদী চেতনা, ৭ নভেম্বর ১৯৮০, ৭ নভেম্বর, ১৯৮৩, শান্তিপুর, নদীয়া;

লোকায়ন, মে, ১৯৬৮;

সরোজ দত্ত ঃ ছাত্র সংগ্রাম কমিটি, প্রকাশক, কাকলি দে, বর্ধমান;

তরঙ্গ প্রবাহ ঃ মার্চ, ১৯৯৩;

শেকলভাঙার যুদ্ধ—নকশালবাড়ি থেকে বিহার, অন্ধ্র, দণ্ডকারণ্য, ঃ র‍্যাডিকাল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন রাজ্য কমিটি;

শহীদ স্মরণে— *নকশালবাড়ি সংগ্রামের বীর শহীদের জীবনী,* প্রথম ও দ্বিতীয় সংকলন, শহীদ সরোজ দত্ত স্মৃতি রক্ষা কমিটি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ৩০ জানুয়ারী, ১৯৯৬, ও ২৩ মে, ১৯৯৭;

সংবাদপত্র

(১) দেশব্রতী, ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত
(২) দেশহিতৈষী, ১৯৬৪
(৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৬৫ থেকে ১৯৭২
(৪) যুগান্তর, ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২
(৫) বসুমতী, ১৯৬৬
(৬) আজকাল, ১৯৯২
(৭) নবদ্বীপ বার্ত্তা, ১৯৬২ থেকে ১৯৭২,
(৮) গণশক্তি, আগস্ট ১৯৯৭
(৯) কালান্তর—১৯৭০
(১০) দি স্টেটসম্যান, ১৯৬৫-৭২
(১১) অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৯৬৬-৬৭,

স্মরণিকা ঃ *ভারতের ছাত্র ফেডারেশন,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ২৮তম সম্মেলন, ১৫-১৮ই জানুয়ারী, ১৯৯৭, প্রকাশক, কমঃ ননী মালাকর, কল্যাণী, নদীয়া।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ *নদীয়া জেলা সংখ্যা,* ১৪০৪ বর্ষ ৩১, সংখ্যা ১৭-২১, ২৬ সেপ্টেম্বর ৩, ২৪, ৩১ অক্টোবর এবং ৭ নভেম্বর ১৯৯৭, প্রকাশক-তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

Books :

Banerjee, Sumantu : In the Wake of Naxalbari; Subarnarekha, Calcutta, 1980;

Damas, Marius : Approaching Naxalbari, Radical Impression, Calcutta, Book Fair, January, 1991;

Das Gupta, Biplab : The Naxalite Movement; Allied Publishers Pvt. Ltd. Calcutta, 1974;

Ghosh, Sankar : The Naxalite Movement : A Maoist Experiments; Firma K.L.M. Pvt, Ltd., Calcutta, 1975;

Ghosh, Suniti Kumar (ed.) : *The Historic Turning Point--A Liberation Anthology,* Vols. I & II, First ed. May, 1992 and February, 1993;

Lenin, V.I. : Collected Works : London, Lawrence and Wishart; Moscow, Foreign Languages Publishing House; 1968.

Mohanty, Monoranjan : Revolutionary Violence : A Study of the Maoist Movement in India; Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1977;

Robinson, Joan : The Cultural Revolution in China; published in Pelican Books, 1969;

Ram, Mohan : Maoism in India; Barnes and Noble Inc. New York, 1971;

Roy, Ashish Kumar : *The Spring Thunder and After : A Survey of the Maoist and Ultra-Leftist Movements in India, 1962-75*, Minerva Associates (Pub.) Pvt. Ltd., Calcutta, December, 1975;

Ray, Rabindra : *The Naxalite and Their Ideology* : Delhi, OUP, 1988;

Samaddar, Ranabir : A Biography of the Indian Nation–1947-1997, Sage Publications India Pvt. Ltd., New Delhi, First Edition, 2001;

Samanta, Amiya Kumar : *Left Extremist Movement in West Bengal* : An experiment in armed agrarian struggle; Firma KLM Pvt. Ltd. Calcutta, 1984;

Sen, Asit : *An Approach to Naxalbari*; Institute of Scientific Thoughts, Calcutta, First Edition, October, 1980;

Sen, Samar, Panda Debabrata, Lahiri Asish (ed.) : *Naxalbari And After : A frontier anthology;* Kathasilpa, June, 1978, Vols. I & II; December, 1978;

Tung, Mao Tse : *On Practice : Selected Writings;* NBA (Pvt.) Ltd. Calcutta, December, 1967;

Weiner, Myron : *Political Change in South Asia*, Firma KLM Calcutta, 1963.

Journals :

1. *Partha N. Mukherji, and Prafulla Chakraborti, Manabendu Chattopadhyay, Anjan Ghosh : Left Extremism And Electoral Politics : Naxalite Participation in Elections;* A JNU New Delhi & ISI, Calcutta Collaboration, ICSSR, New Delhi, July, 1979, Draft Manuscript, (for restricted circulation);
2. *Bandimukti–O–Ganadabi Prastuti Committee*, West Bengal, in collaboration with APDR, West Bengal, June, 1977 : *A Preliminary Report on Police attacks on Political Workers in West Bengal*, 1970-76;
3. *Partha Chatterjee* : *'Naxalbari Legacy'* : An article Published in *'A Symposium on the New Political Climate*, Organised by CSSSC, No. 216, 'The Janata Phase.'
4. *District Statistical Handbook*–Nadia (1971, 1972 combined), Bureau of Applied Economics and Statistics, Government of West Bengal;
5. *Census of India*, 1971, Series 22, West Bengal, part–II–A.

পরিশিষ্ট—১

চীন-ভারত বিরোধ প্রসঙ্গে

স্বপন দত্ত/অনিল বিশ্বাস

এ কথা সর্বজনবিদিত
বৌদ্ধ সংস্কৃতির আত্মিক-বন্ধনে ভারত-চীন মৈত্রী
পুষ্ট হয়েছে

১৯৬২ সালের ২১শে অক্টোবর জাতির প্রতি আহ্বান জানিয়ে বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেছেন ঃ 'একটি দেশ, অর্থাৎ ভারত উপযাচক হয়ে চীন সরকার ও চীনের জনগণের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করার জন্য বিশ্বপরিষদে তাদের পক্ষ গ্রহণ করে যে চেষ্টা করেছে, সেরকম দৃষ্টান্ত ইতিহাসে সম্ভবত বেশী নেই, কিন্তু তার পরিবর্তে চীন সরকার ভারতের অমঙ্গল চিন্তা করেছে, এমন কি আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি আক্রমণ করেছে। কোন আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন দেশ বিশেষ করে স্বাধীনতাপ্রিয় ভারত এই আক্রমণের কাছে নতি স্বীকার করতে পারে না—তার ফলাফল যাই হোক না কেন।' চীন প্রজাতন্ত্রে এই নির্মম শত্রুতা সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মধ্যে নিঃসন্দেহে যেমন সকরুণ, তেমনি বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে। ২২ শে অক্টোবরের বেতার ভাষণে চীনকে শ্রীনেহরু চিহ্নিত করেছেন 'নীতিজ্ঞানহীন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ'রূপে, কিন্তু, কিছুদিন পরে, অর্থাৎ ৮ই নভেম্বর লোকসভায় প্রদত্ত ভাষণে চীনের মধ্যে তিনি 'নয়া সাম্রাজ্যবাদী' শক্তির আবির্ভাব লক্ষ করেছেন। নয়া চীনের গতিপ্রকৃতি সম্যক অনুধাবন করতে হলে শ্রীনেহরুর এই দুটি বক্তৃতা নিঃসন্দেহে দিগদর্শী।

একথা সর্বজনবিদিত বৌদ্ধসংস্কৃতির আত্মিক-বন্ধনে ভারত-চীন মৈত্রী পুষ্ট হয়েছে। ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের সাধনায় এ দুটি দেশের সম্পর্ক নিবিড়তর হয়েছে। সুদূর প্রাচীনকালের স্মৃতিরোমন্থন হয়ত খুব বেশী প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু এইত সেদিন ১৯২৭ সালে ব্রাসেল্‌সে অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি সম্মেলনে তরুণ জওহরলাল চীনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যপ্রেরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ১৯৩১ সালে চীনের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানাবার জন্য ভারতবাসী জাপানী দ্রব্য বয়কট করেছিল। ১৯৩৭ সালে জাতীয় কংগ্রেস এদেশের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত একটি শুভেচ্ছা দল চীনে পাঠিয়েছিল। ১৯৩৯ সালে শ্রীজওহরলাল চীনে গিয়ে চীন-ভারত মৈত্রীর সম্পর্কে আকুল আবেদন জানিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন, আবাব ১৯৫২ সালে চিয়াং-কাইশেক ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করতে এসে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়েছিলেন। এই জাতীয় প্রচুর উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, প্রাক-স্বাধীনতা যুগেও এই দুটি দেশের পাবস্পরিক সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর করবার জন্য যথেষ্ট উদ্যম, প্রেরণা ও প্রচেষ্টা ছিল।

১৯৪৯ সালে চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিনা দ্বিধায় যে কয়েকটি দেশ এই নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি জানায়, ভারতবর্ষ তাদের মধ্যে অন্যতম। ভারতবর্ষই সর্বপ্রথম এই স্বীকৃতি জানাবার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু বার্মার অনুরোধে, এই সম্মানের সুযোগ ভারতবর্ষ বার্মাকে ছেড়ে দিয়েছিল। এর অল্পকাল পরে কোবিয়ার যুদ্ধের সময় ভারতের পক্ষ থেকে মার্কিন সৈন্যকে ৩৮' অক্ষরেখা অতিক্রম করতে নিষেধ করা হয়েছিল। জাতিসংঘের সৈন্যবাহিনী ইয়ালু পর্যন্ত এগিয়ে গেলে ভারতবর্ষ তীব্র ভাষায় তার নিন্দা করে। ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রসংঘে চীনকে আক্রমণকারী বলে চিহ্নিত করবার জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, অকম্যুনিস্ট দেশগুলির মধ্যে একমাত্র ভারত ও ব্রহ্মদেশ সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। কোরিয়ার যুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তির জন্য যে ঘটনা সমাবেশ অনুকূল হিসাবে বিবেচনা করা হয়, অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের ধারনা, স্ট্যালিনের কাছে লিখিত প্রধানমন্ত্রী নেহরুর আবেদনপত্রটি সেগুলির মধ্যে অন্যতম। কোরিয়া যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত অন্যান্য সমস্যার সমাধানে Neutral Nation's Repatriation Commission-এর সভাপতি হিসাবে ভারতবর্ষের নিষ্ঠা ও কর্মপ্রণালী উত্তর কোরিয়া ও চীনাযুদ্ধবন্দীদের অশেষ সহায়তা করেছে। ১৯৫১ সালে সানফ্রান্সিসকোতে জাপানের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের সম্মেলনে ভারতবর্ষ যোগ দেয়নি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ভারতবর্ষ একথা নিশ্চয়ই চিন্তা করেছে যে, প্রাচ্যের যে কোনো সমস্যার সমাধানে এ অঞ্চলের অন্যতম প্রধানশক্তি হিসাবে চীন প্রজাতন্ত্রের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রসংঘের মত বিশ্ব প্রতিষ্ঠানে এশিয়া ও পৃথিবীর এতবড় একটা দেশের অংশগ্রহণ সমীচীন মনে করেই ভারতবর্ষ চীনের সদস্য পদপ্রাপ্তির জন্য অব্যাহতভাবে চেষ্টা করেছে। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে তিব্বত ও ভারতের মধ্যে যে বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, সে চুক্তিতে ভারতবর্ষ তিব্বতকে চীনের অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করে। এই চুক্তির প্রস্তাবনায় পঞ্চশীলের পাঁচটি নীতি সর্বপ্রথম বিঘোষিত হয়। এই পাঁচটি নীতি হল ঃ পরস্পরের রাষ্ট্রীয় অভিন্ন সত্তা, পরস্পর নিরাপত্তা, পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিরপেক্ষতা, সমভাব এবং পারস্পরিক সম্মান ও শান্তিপূর্ণ সহবাস। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই ভারতভ্রমণে আসেন। শ্রীনেহরুর সহিত এক যুক্ত বিবৃতিতে এই পঞ্চনীতির প্রতি তিনি চীন প্রজাতন্ত্রের প্রগাঢ় আস্থার কথা প্রকাশ করেন। বান্দুং সম্মেলনে (১৯৫৫) এশিয়ার সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রবক্তারূপে চীনকে অগ্রবর্তী স্থান দেওয়া হয়। ভারত-চীন মৈত্রীর এই স্তরকে মধুচন্দ্রপর্ব বলা চলে।

ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র দপ্তরের মতে ১৯৫৪ সালের তিব্বত-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হবার আগে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন সীমান্তবিরোধ ছিল না, অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের পরেই চীন-ভারত সম্পর্কের মধ্যে দ্রুত অবনতি ঘটেছে। কিন্তু একথা মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে যে, ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে তিব্বত প্রসঙ্গে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, পঞ্চশীলের বহুবিঘোষিত আদর্শ বা বান্দুং সম্মেলনের নব্যএশীয় সংহতির স্বপ্ন দিয়ে তা দূর করা সম্ভব হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫০ সালের ২৬, ২৯ ও ৩০শে অক্টোবর

তারিখে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে যে সকল পত্র বিনিময় হয়েছিল, সেগুলি উল্লেখ করতে পারি। ১৯৫৫ সালের জুন মাস থেকে ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত চীন ভারতবর্ষের হিমালয় সীমান্তের পশ্চিম অঞ্চল, মধ্য অঞ্চল ও পূর্ব অঞ্চলে ৫০,০০০ বর্গমাইল জায়গা দাবী করেছে এবং ২৬,০০০ বর্গমাইল জায়গা অধিকার করেছে।

১৯৬২ সালের ২৪শে অক্টোবর চীন সরকার শান্তির জন্য এক তিনদফাওয়ারী প্রস্তাব পেশ করে, এবং ২১শে নভেম্বর এক বিবৃতিতে প্রচার করে যে চীন তার ২৪শে অক্টোবরের তিনদফা প্রস্তাব কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করবে, যদিও ভারতবর্ষ সে প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। চীনের এই প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে মিঃ চৌ এন লাই-এর নিকট লিখিত শ্রীনেহরুর ১৯৬০ সালের ১লা ডিসেম্বরের পত্রে। সেই পত্রে বলা হয়েছে ঃ 'চীন চেষ্টা করছে, প্রাথমিকভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার আড়াল দিয়ে চীন যে জায়গাগুলির উপর অধিকার দাবী করেছে, সেই জায়গাগুলোর উপর তার প্রকৃত ও বাস্তব অধিকার অব্যাহত রাখতে এবং ঐ জায়গাগুলো অধিকার করে নেওয়ার জন্যই ১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবর থেকে আপনার সশস্ত্র সেনাবাহিনী ব্যাপকভাবে ভারতভূমির উপর আক্রমণ শুরু করে। আমরা এই ব্যবস্থা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না, ...১৯৬২-র ২৪শে অক্টোবরের তিন দফা প্রস্তাব এবং ১৯৬২-র ২১শে নভেম্বরের যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য অপসারণ করে নেওয়ার প্রস্তাব, যে দুই প্রস্তাবে সেইসকল সীমান্ত এলাকার উপর চীনের অবিচ্ছিন্ন অধিকার কায়েম রাখার কথা হয়েছে, সে সমস্ত এলাকা কখনও চীনের প্রশাসনিক কর্তৃত্বাধীনে ছিল না, ১৯৫৯ সালের ৭ ই নভেম্বরও নয় অথবা ১৯৬২-র ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে কোন সময়েই নয়। চীনের একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা ও সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে ভারত সরকারকে যদি কোনরকম উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হয় তবে ভারত সরকারকে স্পষ্টত জানতে হবে ১৯৫৯-এর ৭ই নভেম্বরের এই "বাস্তবভাবে নিয়ন্ত্রণকারী লাইন" বলতে কি বোঝায় এবং তার তাৎপর্য কি, ঐ লাইনের সংজ্ঞা কি চীন সরকার দিতে পারে না তাদের নিজস্ব দাবীকৃত এলাকাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে অথবা পরে আরো আক্রমণ চালিয়ে তারা যতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে বা যতটা অধিকার করে নিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে।'

ইতিমধ্যে গত ২১শে জানুয়ারী কলম্বো শান্তিপ্রস্তাব লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল। গত ২৫শে জানুয়ারী লোকসভা কলম্বোশক্তি প্রদত্ত বিশ্লেষণ ব্যাখ্যাসহ শান্তি প্রস্তাবটির প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করে, যদিও এ সম্পর্কে কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ পার্লামেন্টের উদ্বোধনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ এই শান্তি প্রস্তাবের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, ভারত ও চীনের মধ্যে মৌলিক বিবাদ নিয়ে কলম্বো প্রস্তাব আলোচনা করেনি, শুধুমাত্র পারস্পরিক আলাপ আলোচনার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে, প্রস্তাবে এমন পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে।

গত নভেম্বর মাস (১৯৬২) থেকে শ্রীনেহরু যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছেন বা আলাপ আলোচনায় মন্তব্য করেছেন, কয়েকটি মতের পুনরাবৃত্তি প্রায় চোখে পড়ে। চীনকে তিনি

চিহ্নিত করেছেন সম্প্রসারণশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে। তিনি মনে করেন যে চীনের সঙ্গে ভারতের বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর যে পাঁচ দিন ব্যাপী বিতর্ক হয়, তার উত্তর দেবার সময়, এবং ১৩ই মার্চ ভূপালের একটি সভায়, শ্রীনেহরু অতি স্পষ্টভাষায় পুনরায় চীন আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সুতরাং চীন-ভারত বিরোধের পরবর্তী অধ্যায়টিও খুব আশাপ্রদ নয়। এ বিরোধে ভারতবর্ষের জয় অনিবার্য। শ্রীনেহরুর ভাষায়, 'ভারতবর্ষের মতন একটা মহাজাতি যেখানে স্বাধীনতার যুদ্ধে অবতীর্ণ, সমগ্র ভারত যেখানে ঐক্যবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, সেখানে বিজয় অবশ্যম্ভাবী।'

এই প্রবন্ধ রচনায় নিম্নে উল্লিখিত বইগুলি থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।
ইণ্ডিয়াজ্ ফরেন পলিসি ঃ ডাঃ কে গুপ্ত।
অমৃতবাজার পত্রিকা, রিপাবলিক ডে'জ স্পেশাল, ২৬ জানুয়ারী '৬৩।
ভারত সরকারের তথ্য ও প্রচার দপ্তর থেকে প্রকাশিত ঃ ভারতের স্বাধীনতায় সংকট।
চীনের শান্তি প্রস্তাবের ভাঁওতা।
ভারত-চীন সম্পর্ক, জওহরলাল নেহরুর ১৯৫৯ সালের লোকসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

মন্তব্য ঃ এই প্রবন্ধে তৎকালীন কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র-ফেডারেশন কর্মী বর্তমানে সি.পি.আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সি.পি.আই (এম) রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের 'জাতীয়তাবাদী' দৃষ্টিভঙ্গীই ধরা পড়ে। '৬৩ সালের কৃষ্ণনগর কলেজ পত্রিকায় এই লেখাটি সেদিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ।

পরিশিষ্ট—২

Extract of the "Longhand notes of the speches delivered by Shri Utpal Dutta, I.P.T.A., Calcutta on the meeting on 10.9.67 held by "Nakshal Bari Krishak Sangram Sahayak Committee" at Sahid Bag, Cooch Behar. The notes was submitted by an A.S.I to Special Branch, Calcutta.

শ্রী উৎপল দত্ত তাঁহার ভাষণে বলেন, দূর থেকে নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের কথা জানবার পর তিনি ও তাঁহার কয়েকজন সহকর্মী এসেছিলেন সেখানকার সত্যকার পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখতে। "সেখানকার সংগ্রামী কৃষকরা যে আন্দোলন চালাচ্ছে তার প্রতি আমি সমর্থন জানাচ্ছি কলকাতা ও ২৪ পরগণা জেলার সাধারণ মানুষের তরফ থেকে। আজ নকশাল বাড়ির কৃষকরা সত্যকারের বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছে এবং জোতদার ও পুঁজিপতির অত্যাচারে জর্জরিত ২৪ পরগণা ও নদীয়ার কৃষকরাও এই উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ। আজ নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলা বারুদের স্তুপ হয়ে উঠেছে আর এই আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত বলে ছোট করে দেখা হচ্ছে। ওদের বলা হচ্ছে হঠকারী। এই আন্দোলনকে যারা হঠকারী বলছে তারা নয়া শোধনবাদের সমর্থক এবং কংগ্রেসী কায়েমী স্বার্থের রক্ষক। তিনি বলেন দীর্ঘ ২০০ বছর ধরে কৃষক জমির জন্য আবেদন করে যখন ব্যর্থ হয়েছে তখন কমিউনিস্ট পার্টির নীতি অনুসারে লেনিন, স্টালিন ও মাও সে তুঙ যে নীতি যে পথ দেখিয়ে গেছেন নকশালবাড়ির কৃষকরা সেই পথ যথা সময়েই বেছে নিয়েছে। কারণ এখনই প্রকৃত বিপ্লবের সময়। বিপ্লবের অবস্থা স্টালিন নির্দ্ধারণ করেছে তখনই যখন তিনটি অবস্থা দেশের মধ্যে দেখা দেয়।

(১) যখন দেশের শাসকগোষ্ঠী আর স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করতে সক্ষম হয় না,

(২) দেশের মধ্যে চরম খাদ্যের অভাব দেখা দেয়,

(৩) জনতা তথা মেহনতী মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন শুরু করে দেয়। কাজেই মিলিয়ে দেখুন আজ দেশের কি পরিস্থিতি। গত নির্বাচনে প্রমাণ করেছেন শাসক কংগ্রেস গোষ্ঠী আজ সংখ্যালঘু দলে পরিণত হয়েছে। তাই খোদ দিল্লিতেও কংগ্রেসী কেন্দ্রিয় সরকার অপর কোন দল নিয়ে কোয়ালিশন সরকার তৈরী করা যায় কিনা আজ ভাবতে শুরু করেছে। কাজেই দেশের অবস্থা স্বাভাবিক শাসন ব্যবস্থার বাইরে বর্ত্তমানে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আজ সকলকেই ভাবতে হচ্ছে চালের বাজার কত। তৃতীয়তঃ কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন প্রমাণ করে দিচ্ছে যে জনতা আন্দোলন করতে ভয় পায় না, আজ তারা শুধু শান্তিপূর্ণ আন্দোলনই করছে না, সেই সঙ্গে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। কাজেই আজ কমিউনিস্ট (মাঃ) যদি বলে নকশালবাড়ির আন্দোলন হঠকারিতা, তবে আমি বলব কমিউনিস্ট পার্টি

আজ কমিউনিস্ট নীতির বহির্ভূত তত্ত্ব আওড়াচ্ছেন এবং ঠিক কংগ্রেসীদের মতো সাম্রাজ্যবাদী ও ধনীদের স্বার্থরক্ষা করার পথ অনুসরণ করে চলছে। সবচাইতে পরিতাপের বিষয় মাদুরাইতে গত কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনে এমন সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছে যে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়াই কেবলমাত্র ভোটের মাধ্যমেই তাদের উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব হবে—অবশ্য তারা এটাও সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যদি তাদের আক্রমণ করে তবে সেটা প্রতিহত করা হবে। কাজেই আজ মার্কবাদী কমিউনিস্ট দল পিছন থেকে এই আন্দোলনকে ছুরি মারতে চায়। তাই তারা নকশালবাড়ি আন্দোলনকে হঠকারী বলে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয় মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিশ্বনাথ মুখার্জী নকশালবাড়ির জোতদারদের বলছে "আপনারা শুধু কেন মার খাচ্ছেন—মার দিতে পারেন না।" তাদের এই কথাতেই নকশালবাড়ির বন্দুকের লাইসেন্সধারী জোতদারগণ বন্দুক নিয়ে বেপরোয়াভাবে কৃষকদের আক্রমণ করেছে।" শ্রী দত্ত বলেন, "এইবার শুনুন নকশালবাড়ির কি অবস্থা হয়েছিল। সেখানে কৃষকরা সভা করে জোতদারদের ডেকে বলেছিল আমরা আপনাদের জমি নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দিচ্ছি। যদি আপনিও চাষীর মর্যাদা পেতে চান তবে আসুন লাঙল ধরুন। জমিও নেবই, সেইসঙ্গে আপনার গোলার উদ্বৃত্ত ধান ও বন্দুকটিও দিতে হবে। ...শ্রী দত্ত বলেন, স্টালিন লেনিন বলে গেছেন যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে, তখন সেই আন্দোলনকে ঘুম পাড়িয়ে দিও না, আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। ...কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালে জনতা যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন শুরু করল, ট্রাম, বাস, রেলগাড়ি, থানা পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগল, ঠিক সেই সময়েই আন্দোলনকে থামিয়ে দিয়ে আমাদের হাতে একটা ভোটপত্র গুঁজে দেওয়া হল। ...ভোট হয়ে গেল, কংগ্রেস হটিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন হল। কিন্তু তারা বলল চাল আছে জোতদারদের কাছে, জোর করে জোতদরেদের কাছ হতে চাল বের করতে গেলে দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। ওদের মনের পরিবর্তন আসবার সুযোগ দাও। কিন্তু তাদেব মনের পরিবর্তন আসে নাই। ...(নকশালবাড়িতে) এই নারী ও শিশু হত্যা বোধহয় কংগ্রেসী কুশাসনেও সংগঠিত হয়নি। ইহার পর মন্ত্রীসভার মার্কসবাদী মন্ত্রী ও অন্য কয়জন মন্ত্রী...এই নারী হত্যার ঘটনার জন্য কোন দুঃখপ্রকাশ করেন না, উপরন্তু কৃষকদের দোষী সাব্যস্ত করলেন।"

তিনি (উৎপল দত্ত) বিশেষ করে কমিউনিস্টদের আহ্বান জানিয়ে বলেন যে "আপনারা আর দোদুল্যমান অবস্থায় না থেকে নকশালবাড়ির পথ অনুসরণ করতে এগিয়ে আসুন। প্রথমে গ্রামে গ্রামে মুক্ত এলাকা গঠন করুন। তারপর এই মুক্ত এলাকার পরিসর বৃদ্ধি করে জমি দখল করে কৃষকদের বন্টন করে বিপ্লবের পরিসর বৃদ্ধি করুন। এইভাবে গ্রামে গ্রামে মুক্ত অঞ্চল ঘোষণা করে শহর একটি একটি করে দখল করুন। তিনি বলেন যে চীন এবং ভিয়েতনামে এইভাবেই কৃষক বিদ্রোহ সফল হয় এবং এটা হল একটি আন্তর্জাতিক

আন্দোলনের সঠিক পথ। ...এই লড়াইয়ের পক্ষে আছে দেশের ৮০ শতাংশ লোক। সুতরাং যদি বাকী ২০ শতাংশ লোক প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে লড়াই করে বিপ্লবীদের একজনকে নিহত করে—সেই বিপ্লবী মরবার পূর্বে শত্রুর দুইজনকে হত্যা করবে। এইভাবে চলতে থাকলে প্রতিক্রিয়াশীল শত্রুদের নিশ্চয়ই বিনাশ হবে। কেননা বিপ্লবীরা সংখ্যায় অনেক বেশী। তিনি বলেন যে উষার সূর্য্যোদয়ের মত নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন বিপ্লবের প্রথম আলোকপাত এবং সত্যকার কমিউনিস্টরা এই পথ গ্রহণ করবে। ...তিনি বলেন যে মাতৃজঠরের শিশুর স্পন্দন কেবল মায়েরাই অনুভব করতে পারেন, অপরে নয়—তেমনি নকশালবাড়ির কৃষক বিপ্লবও বিপ্লবীরাই।"

মন্তব্য ঃ পুলিশ ফাইল থেকে সংগৃহীত ১০.৯.৬৭ তারিখে কোচবিহারের শহীদবাগে প্রদত্ত উৎপল দত্তের এই অপ্রকাশিত বক্তব্যটি এখানে তুলে দেওয়া হল। মাওবাদী আন্দোলনের প্রতি তাঁর বিজ্ঞাপিত সমর্থনের অন্যতম নিদর্শন হিসাবে এই বক্তব্যকে গণ্য করা যায়।

পরিশিষ্ট—৩

সমুদ্র

'সমুদ্র' পত্রিকা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা 'নতুন রুচি ও মেজাজ, একটা নতুন পৃথিবী, যে পৃথিবীতে সর্বহারাদের হাতেই থাকবে স্বাধীনতার পতাকা'—তারই সংস্কৃতিগত সোপান গড়ে তোলায় প্রতিশ্রুত ছিল। মূলতঃ কৃষ্ণনগর কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররাই এই পত্রিকা শুরু করেন সাতষট্টি থেকে। লেখকদের মধ্যে শুভ্রাংশু ঘোষ, শুভ্র সান্যাল, দেবদাস আচার্য প্রমুখ ছিলেন। দীপক বিশ্বাসের সম্পাদনায়, মধ্য-ষাটের ক্রান্তিকালকে স্বাগত জানিয়ে 'সমুদ্র' বেরোত 'সত্তর' অব্দি, অবশ্যই অনিয়মিত ভাবে। অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এই পত্রিকার দু-তিনটি বুলেটিন সংগ্রহ করা গেছে দীপক বিশ্বাসের সৌজন্যে, বাকিগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল; কারণ সহজবোধ্য। —লেখক

সম্পাদকীয়

ধারাবহিকতায় অনিবার্য ও অনিশ্চিত ছেদ টেনে দীর্ঘ অনিয়মতার গ্লানি মেখে মাসিক 'সমুদ্র' প্রকাশিত হচ্ছে। মার্কসবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ সংগ্রামী সাথীদের ঐকান্তিক প্রেরণা ও চাহিদাই এই উদ্দীপনার মূলধন। সহযাত্রীদের সর্বাঙ্গীন শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতাই এর স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণের চাবিকাঠি। আশা করি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে আমরা আরো সোচ্চার ও সচেষ্ট থাকতে চেষ্টা করব আগামীদিনে। বিপ্লবী তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয়-সাধনের বাস্তব অভাবকে দূর করতে তৎপর হতে পারব প্রতিটি সংগ্রামে।

সর্বহারা সংস্কৃতির মহান বিজয়পতাকাকে উড্ডীন রাখতে কেন্দ্রীভূত হোক আমাদের প্রয়াস।

আমরা কৃষকেরা ঃ আমাদের গান

তুষার চট্টোপাধ্যায়

আমরা কৃষক—একটা মাত্র ছাড়পত্র আমাদের।
ভোলগা থেকে গংগা, ডন থেকে মিসিসিপি
সর্বত্রই আমরা, আমাদের শ্রমে
উজ্জীবিত করি তোমাদের।
আমরা কৃষক হাল ধরি। লাঙ্গল চষি—পণ্য তুলে দিই
তোমাদের সুপুষ্ট গোলায়।
আমরাই ক্রীতদাস, সার্ফ ভূদাস জমিহীন চাষী
অথচ এখনও জমি জমি ফসল তুলি

তোমাদের গোলায়। এদিকে আমাদের ঘরে
জমে থাকে অসহায় বুভুক্ষা নির্মম নিষ্পেষণ
হাহাকার আর সর্বক্ষণের অনিশ্চয়তা।
আমাদের ইতিহাস নিষ্পেষণের, শোষণের।
ফসল তোলার দায়িত্ব আমাদের
অধিকার আধপেটা অন্নের।
আমরা কৃষক। ভোলগা থেকে গংগা
ডন থেকে মিসিসিপি
সর্বত্রই আমাদের লাঙ্গল জমিকে উর্বরা করে।
আমরা কৃষক। জমি আমাদের ন্যায্য পাওনা
লাঙ্গলে কাস্তে আমাদের জন্মগত অধিকার।
তাই আজ আমরা জ্বলে উঠেছি সমস্ত বিশ্বে।
আমাদের মুক্তি আমাদের অধিকার,
আমাদের পাওনা আমাদের জমি,
আমাদের কাস্তেতে লাঙ্গলের ফালে
জোট বেঁধে ফসল তোলার দিন
ছিঁড়ে ফেলার দিন আজ নিই
আমরা জোটবদ্ধ কষক
ভোলগা থেকে গংগা
ডন থেকে মিসিসিপি সমস্ত জমি আমাদের
আর আমরা কৃষকেরা
আমাদেরই বাঁচার হাতিয়ার।

সম্পাদকীয়

সমুদ্র নবকলেবরে পুনরায় প্রকাশিত হচ্ছে। কাব্য বুলেটিন হিসাবে এর বহুল চাহিদাই আমাদের পুনঃ প্রকাশনের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। সমুদ্রের প্রকাশিত রচনাগুলিই এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত করবে। পত্রিকাটির সম্বন্ধে পাঠকগণের সহ-মর্মিতাই এর পরমায়ু নির্ধারণ করবে। পত্রিকাটি পাঠকগণের চিন্তা, চেতনা ও আত্মবিশ্বাসের সহায়ক হতে পারলেই আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে বলে আশা রাখি।

ছড়া

দীপক বিশ্বাস

তত্ত্ব নিয়ে মত্ত থাকা বাবুয়ানার বিপ্লবী
সময় এল গর্তে ঢোকার তোমার এবার মৌলবী।
আগুন জ্বালা ছেলেখেলা নরহত্যা মহাপাপ,
হাততালিটা পাবেই এবার মাও সে তুঙের তুললে বাপ।
নন্দঘোষের চীন রয়েছে ব্যাপারটা তো মন্দ না—
সব ঘটনার মূল এখানে আর কোথায়ও দ্বন্দ্ব না।
সংসদে সব বদ লোকেদের রাখছ কোরে কোণঠাসা
ক্যাবিনেটের ফেট বাজিয়ে এই তো আছ বেশ খাসা।
সমাজতন্ত্রের তন্ত্রকথা জনগণের অন্তরে
যন্ত্র টিপে মন্ত্র পড়ে আনবে তাকে সত্বরে।
মিটিং-মিছিল মন্ত্রিসভা সংগ্রামের এই তো জিস্ট—
সময় থাকতে কেটে পড় তত্ত্ববিদ্ কমিউনিস্ট।

সেলাম জানাই

বিপ্লব সেন

[২৯.৮.৬৭ তারিখে রমাপ্রসন্ন বিশ্বাসের নৃশংস হত্যাকে উপলক্ষ্য করে।]

প্রকাশ্য দিবালোকে রক্ত গেছে ঝরে
গানের পাখীরা স্তব্ধ বিষণ্ন বিস্ময়ে
থাকে চেয়ে; জীবনের মানে যেন তাই
প্রহেলিকা সাগরের নোনা জলে
ছোট্ট ঢেউয়ের মতন উচ্ছ্বসিত হয়ে
চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়

নবরূপী পিশাচের তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে।
রক্ত ঝরে গেছে পিচ ঢালা পথে,
এ রক্ত স্পন্দন তোলে দেশে দেশে
অন্ধকার হৃদয়ের প্রান্তরে। কুয়াশায় ঢাকা
কাণ্ডারী চোখ মেলে চায়—
খোঁজে ধ্রুবতারার নির্দেশ!
বিবেকের মাঝে ফিসফিস কথা ওঠে—
শহীদ আনন্দ আর বাদলের দল মাথা কুটে মরে,
ইতিহাস পথ ছেড়ে দেয়।
তোমার আমার শোষিত মেহনতী মানুষের
অনেক, অনেক তাজা রক্ত ঝরিয়ে দিয়ে
জীবনে আমরা শান্তি চেয়েছিলাম—
ওরা তা কেড়ে নিয়েছে।
তবু বেদনার মাঝে আশা জাগে—
এ রক্ত ভাষা আনে মানুষের প্রাণে
এ রক্তের দিকে তাই—
লাল চোখে চেয়ে থেকে সেলাম জানাই।

শক্তিনগরে নকশালবাড়ি রাজনীতির অন্যতম কর্মী ও শক্তিনগর গণকমিটির সহ সভাপতি রমাপ্রসন্ন বিশ্বাসকে ২৯.৮.৬৭ তারিখে হত্যা করা হয়। 'দেশব্রতী' (৭ সেপ্টেম্বর '৬৭, পৃষ্ঠা-৬) পত্রিকা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কংগ্রেসকে সোজাসুজি দায়ী করে। 'সমুদ্র' পত্রিকার এই সংখ্যায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদী একটা চেহারা ধরা পড়ে। —লেখক

* 'বর্তমান রাজনৈতিক সংকট ও ছাত্রদের কর্ত্তব্য'

শুভ্রাংশু শেখর ঘোষ

আমরা জানি ছাত্ররা বিশেষ কোন শ্রেণীতে অবস্থান করে না। অর্থাৎ একটা অসমসত্ত্ব (heterogeneous) বা মিশ্রিত শ্রেণী। তবুও ছাত্র সমাজকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে বিমূর্ত চিন্তাধারা দিয়ে বিচার করলে ভুল হবে, বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে ফেলে এবং বাস্তব অবস্থা সামনে তুলে ধরে ছাত্রদের মূল রাজনীতির দিকে নিয়ে আসার প্রয়োজন। এমনকি আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে শুধু ছাত্র-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক শ্লোগান, বক্তব্য রেখেও ছাত্রদের সঠিক রাজনীতিতে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। যদি না এই আন্দোলন শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে যায়।

বিগত বছরগুলির ছাত্র আন্দোলন পর্যালোচনা করলে একটা দিক আমাদের চোখে পড়ে যে ছাত্ররা যে কোন সমস্যা বা দাবীদাওয়া নিয়ে এই মালিক শ্রেণীর সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। কিছু সংখ্যক নেতা নিয়ে আন্দোলনকে আপোষের পথে চালিত করেছে এবং পুরান আন্দোলনগুলি থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে পুরান পদ্ধতির মূল কথা ছিল অর্থনীতিবাদ। এবং যার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটত জংগী অর্থনীতিবাদী আন্দোলনের মধ্যে। অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনিবার্যভাবেই শুধু বিশেষ কাজে গুরুত্ব আরোপ করে সাধারণ নীতি ও কৌশলের সাথে বিশেষ কাজকে যুক্ত করে দেখার প্রয়োজন অনুভব করে না। আজকের সংকটের সাথে বিপ্লবী ছাত্ররা যদি পুরানো পদ্ধতির শিকার হন তাহলে রক্তাক্ত আন্দোলন হয়ত গড়ে উঠবে কিন্তু তার ব্যর্থতার পরেই কর্মীদের মধ্যে আনবে হতাশা ও নৈরাশ্য। সুতরাং ছাত্র সমাজকে নিজেদের সচেতন রেখে কাজের সাথে সাথে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রত্যেকের দায়িত্ব মার্কসবাদী লেনিনবাদী পদ্ধতি অনুযায়ী সাধারণ পক্ষের সাথে বিশেষ কাজকে যুক্ত করে তাঁর দ্বন্দ্বগুলিকে উপলব্ধি করে তাকে সমাধান করার দিকে এগোনো।

শ্রমিক কৃষকের মূল বিপ্লবী শক্তিকে বাদ দিয়ে তরুণ বুদ্ধিজীবী ছাত্রদের উপর নির্ভর করে সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদের বিরুদ্ধে নূতন সমাজ ব্যবস্থা গঠনের সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায় না। সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত সামগ্রিক মুক্তি যেমন সম্ভব নয় তেমনি একথাও সত্যি যে সামগ্রিক মুক্তি অর্জন না হওয়া পর্যন্ত দেশের জনগণের সাথে ছাত্ররাও তাদের খাদ্য, শিক্ষা, চাকরি প্রভৃতি সমস্যার দাবীতে আন্দোলন সংগঠিত করবে। এবং এ রাষ্ট্রের অভ্যন্তর থেকে আন্দোলনের মাধ্যমে যতটুকু সুযোগ সুবিধা আদায় করা যায় তার জন্যও লড়াই চালিয়ে যাবে, কিন্তু তারই সাথে সাথে একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে উপরোক্ত দাবীগুলির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার অর্থ এই নয় যে, বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামোর অভ্যন্তর থেকে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এই সমস্ত আন্দোলন

* মূল রচনার বানান হুবহু তুলে দেওয়া হল। —লেখক।

গড়ে তোলার সময়ে আন্দোলনের সাথে সাথে মূল রাজনৈতিক প্রশ্নটিও দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরতে হবে এবং তারই ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

সমস্যার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুখোশ খুলে দিয়ে ছাত্রদের সচেতন করতে হবে যে শ্রমিকের নেতৃত্বে কৃষক বিপ্লবের দ্বারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত না হলে কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। কৃষি বিপ্লবের মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তুলতে পারলেই ছাত্র সমাজকে বিপ্লবী রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভবপর এবং সেটা হবে মূল লড়াই এর পথে পদক্ষেপ।

আশু লক্ষ্য অর্জনের জন্য সাময়িক সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠার জন্য নিশ্চয়ই সংগ্রাম করতে হবে, কিন্তু তাকে সংস্কারবাদী অন্ধ কাণাগলির মধ্যে না নিয়ে গিয়ে বর্তমানের সংগ্রামের মাধ্যমে সংগ্রামের ভবিষ্যতকেও তুলে ধরতে হবে এবং সে বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। ছাত্রদের সব সময়ে মনে রাখতে হবে কৃষি বিপ্লবই পথ, কৃষি বিপ্লবই লক্ষ্য এবং কৃষি বিপ্লব সফল না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের কিছু কিছু বন্ধুদের মধ্যে কিছু ভুল রাজনৈতিক চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা সরাসরি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলে থাকেন।

আমরা কি ধরনের বিপ্লব করতে চলেছি তা আগে স্থির করে নিতে হবে। এ সম্পর্কে দ্বিমত থাকলে কর্মপদ্ধতির ও কৌশলের ক্ষেত্রে অনৈক্য দেখা দেবে। এবং তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হবে। আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা উপনেবিশক রাষ্ট্রে ক্ষমতায় রয়েছে মূলতঃ তিনটি শ্রেণী ঃ

১) সাম্রাজ্যবাদ—যাঁর নেতৃত্বে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সহযোগী সোভিয়েট সংশোধনবাদ।
২) সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও ক্রীতদাস বৃহৎ পুঁজি
৩) দেশীয় সামন্তবাদ, এ ছাড়াও রয়েছে আমলাতান্ত্রিক পুঁজি সাম্রাজ্যবাদ ও বৃহৎ পুঁজির সম্পর্কে যেমন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তেমনি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বন্ধনও অদৃশ্য নয়। একটিকে আঘাত করলে তাই আরেকটি আহত হতে বাধ্য। অতএব একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ শত্রু হিসেবে দালাল পুঁজি ও সামন্তশ্রেণীর উপর আঘাত হানলে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ বিপন্ন হয়। অনুরূপভাবে সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত হানলে অন্যান্য শত্রুগুলিও আঘাতের সম্মুখীন হয়।

এখন দেখা যাক জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল পার্থক্য কোথায়?

প্রতিটি বিপ্লবের পিছনে থাকে কতকগুলি ঐতিহাসিক শর্ত। কোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করতে হলে সে দেশের পুঁজির বিকাশকে একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছুতে হবে, অর্থাৎ সেই দেশে সরাসরি ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা কায়েম থাকতে হবে। এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মেহনতী জনগণের বৃহত্তর অংশও হবে শিল্প নির্ভর সর্বহারা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

শিল্প বিপ্লব ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী অবশ্যই এই সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। এর কোনোটি ভারতের ক্ষেত্রে ঘটে নি। এই ভারত রাষ্ট্রের দালাল শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের অনুচর হিসেবে শোষণের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা অত্যন্ত কম সুতরাং একটি গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করে এই অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে, তারপর আরম্ভ হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সংক্ষেপে বলতে গেলে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য হলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। বিকাশের ধারায় এ দুটি বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

পরিশেষে বিগত বছরগুলির ছাত্র আন্দোলন সংগ্রামী ছাত্রদের সামনে এই ঐতিহাসিক শিক্ষাই উপস্থিত করে যে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় দেশীয় দালাল পুঁজি ও সামন্তবাদের একচেটিয়া শোষণের ফলে গভীরতম অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয় এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতি রাজনৈতিক সংকটের আবর্তের মধ্যে পড়ায় বর্তমানে জনগণকে অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক কনসেশন দেশের ক্ষমতা ও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে বসেছে! এ অবস্থায় গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামও দীর্ঘস্থায়ী এবং ব্যাপক জন সমর্থনের ভিত্তিতে সংগঠিত ব্যতীত ও সাফল্যের দিকে অগ্রসর করানো যায় না। আগামী দিনে ছাত্রদের তথা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দাবী দাওয়ার আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার প্রশ্নে সাংগঠনিক প্রস্তুতি, রাজনৈতিক প্রস্তুতি এবং কর্মীদের মানসিক প্রস্তুতি ও সেই পর্যায়ে তৈরী করা দরকার।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সংগ্রামের এই মহান আদর্শ ও লক্ষ্য ছাত্রসমাজ নিজেদের প্রচেষ্টার উপর কাজ করে নিশ্চয়ই সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে সক্ষম হবে ও ইতিহাস নির্দেশিত পথে কর্তব্য সুসম্পন্ন করবে। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সাময়িক ভাবে যতই শক্তিশালী হোক না কেন ইতিহাসের বিচারে সকলেই 'কাগুজে বাঘ'।

লেখকের মন্তব্য ঃ প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারী '৬৯-এর 'সমুদ্র' পত্রিকা থেকে শুভ্রাংশু শেখর ঘোষ-এর লেখাটি তুলে দেওয়া হল। রাজনৈতিকভাবে অগ্রণী মতাদর্শের অধিকারী হয়েও কেবল 'এ্যাকশনের' সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে শুভ্রাংশু তাঁর প্রতিশ্রুতির অকালমৃত্যু ঘটান।

পরিশিষ্ট—৪

District–Nadia

Police Station	Year	Jotedar	Busi nessmen	Police-men	informer	Other categories	Attack on Police	Police injured	Gun Snatched Police	Gun Snatched Public	Attack on edn insists.	Attack on Govt Offices	Statues broken	Other violence	Naxalites Killed By Police	Naxalites Killed By Public	Naxalites Killed By other reasons	Attem pt to murder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Nabadwip	1970			1							5	5	3					3
	1971										1							3
	1972																	
Santipur	1970		1				1	1			4							2
	1971	5	6	3		1	1	3	3	1	7					1	1	4
	1972	2					2	2							4	2		2
Ranaghat	1970	2		1								3						
	1971	6	4	2					2	5	5	2		2	2			5
	1972																	
Chakda	1970										6	4	1					2
	1971					2				1						6		1
	1972																	
Kalyani	1970										6		2					
	1971										1							
	1972																	
Haringhata	1970	1	1								1							2
	1971																	1
	1972																	
Hanskhali	1970																	
	1971	2								1	1	1						
	1972																	
Krisnagar	1970	2		7		1	6	11	1		17	13	4	7				1
(Kotwali)	1971	1		1	3	1	4	8	2	8	11	10	1	5	3	5		14
	1972																(1 bomb explosion)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Chapra	1970																	
	1971																	
	1972																	
	1973																	
Karimpur	1970	1									1							
	1971																	1
	1972																	
	1973																	
Tehatta	1970																	
	1971																	
	1972																	
Krishnaganj	1970																	
	1971																	
	1972																	
Kaliganj	1970										1	1	1					
	1971					3	1	2	1	2	2							1
	1972																	
Nakshipara	1970	1																
	1971	4	1							6	1			1		2		2
	1972				1			1			1					2		1
		27	13	15	4	9	15	27	3	24	31	39	11	15	9	18	2	45

এই তালিকাটিতে নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আলাদাভাবে নকশালপন্থী কর্মীদের কাজকর্ম পরিসংখ্যানগতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে, এটি ডঃ অমিয় কুমার সামন্তর সৌজন্যে প্রাপ্ত; এখানে উল্লেখ্য যে, ডঃ সামন্ত নদীয়ার পুলিশ সুপার ছিলেন এবং রাজ্য গোয়েন্দা প্রধান হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

পরিশিষ্ট—৫

Month 1971	Serial	Total No. of Incidents	Total No. of Person Killed	No. of attacks on Police	No. of Police Personnel injured	No. of Police Personnel Killed	No. of attacks on Educational Institutions	No. of attacks Govt. Offices	Arson	No. of Arms Snatched away
June	1	8	2	–	–	–	1	–	2	7
July	2	19	7	3	4	–	7	–	5	4
August	3	5	3	2	–	–	–	–	–	–
September	4	14	8	2	2	–	–	–	–	8
October	5	8	8	1	–	–	–	–	1	2
November	6	12	7	2	–	2	2	–	3	4
Total		66	35	10	6	2	10	–	11	25

১৯৭১-এর জুন মাস থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে গোটা নদীয়া জেলায় নকশালপন্থীদের আক্রমণাত্মক কাজকর্মের একটা হিসাব পুলিশ ফাইল থেকে মিলেছে। নদীয়া জেলায় অঞ্চলভেদে এবং আরও ব্যাপক সময়সীমায় ঐ একই হিসাবে বিশদ একটি তালিকাও পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট—৬

* বলাই ঘোষ খতম!

সি.পি.আই (এম-এল)

"জনগণ কেবলমাত্র জনগণই হচ্ছেন বিশ্ব ইতিহাস সৃষ্টির চালক শক্তি।" —মাও

বন্ধুগণ,

শ্রমিক কৃষকের রক্ত দিয়ে গড়া ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী) ভারতবর্ষের গরীব মানুষের রাজ কায়েম করার লড়াই শুরু করেছেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী)-র নেতৃত্বে শান্তিপুরের মেহনতী মানুষ দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছেন। গ্রামে ও শহরে শ্রেণীশত্রু খতম এগিয়ে চলেছে।

কমরেডগণ এবং বন্দুগণ এখন এই লড়াইয়ে কে আমাদের শত্রু? বীরভূমের কমরেডরা সঠিকভাবেই তাঁদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন, জমি বা সম্পত্তি শত্রু চয়ণের নিরীখ নয়। যে জনগণের শত্রু সেই বিপ্লবের শত্রু। জনগণের বিচার জনগণের ঘৃণাই শত্রু নির্দ্ধারণের মাপকাঠি বিশ্ববিপ্লবের নেতা মাও সে তুঙ বলেছেন—-নিজেকে "জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত কবতে গেলে, জনসাধারণের প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতেই হবে। জনসাধারণের জন্য যেসব কাজ করা হয়, সে সবেরই শুরু হওয়া উচিত জনসাধারণের প্রয়োজন থেকে, কোন ব্যক্তিবিশেষের শুভেচ্ছা থেকে নয়। অনেক সময় বাস্তব ক্ষেত্রে যদিও জনসাধারণের কিছু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, কিন্তু নিজের দিক থেকে তাঁরা এখনও সেই প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন নন এবং সেই পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য এখনও দৃঢ়-সংকল্প বা ইচ্ছুক নন, এই অবস্থায় আমাদের ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে, যখন আমাদের কাজের ভেতর দিয়ে অধিকাংশ জনসাধারণ এই প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবেন এবং পরিবর্ত্তন সাধনের দৃঢ়-সংকল্প ও ইচ্ছুক হয়ে উঠবেন, কেবলমাত্র তখনই আমরা এই ধরনের পরিবর্ত্তন সাধন করবো, অন্যথায়, আমরা জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। জনসাধারণ সচেতন ও ইচ্ছুক না হলে, যে কোনো কাজ যাতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন, তা নিছক আনুষ্ঠানিক মাত্র হয়ে উঠবে এবং ব্যর্থ হবে।" কোন শ্রেণী শত্রু খতম করতে হবে? এ সম্পর্কে কমরেড চারু মজুমদার বলেছেন "...তাদের (স্থানীয় কৃষক জনসাধারণের) মতামত জানার উদ্দেশ্যে একটি ছোটখাট খোঁজখবরের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ মোদ্দা কথা হলো লক্ষ্য স্থির করার সময় আমাদের কোন মনগড়া ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। বরং জনগণের অধিকাংশের ইচ্ছার দ্বারা চালিত হতে হবে।"

বন্ধুগণ, ঐ নিরিখে বিচার করে আমরা পরশ্রমজীবি সুদখোর মহাজন বলাই ঘোষকে খতম করেছি। কুত্তাটা এত হিংস্র ধরনের নোংরা ছিল যে তার ওখানে যে সব জনেরা কাজ

* মূল রচনার বানান হুবহু তুলে দেওয়া হল। —লেখক।

করতেন তাদের জলখাবার হিসাবে জানোয়ারটা দিত পচাছোলা। এমন কি প্রচলিত সর্বনিম্ন মজুরীর থেকেও এই রক্ত শোষক বাদুড়টা কম মজুরী দিত। এই কুত্তা এক চাষী পরিবারের ১৪ বিঘা জমি আত্মসাৎ করে নিয়েছিল। এ ছাড়াও শয়তানটা ১০০ টাকার জন্য আর এক কৃষকের ১০ বিঘা জমি কেড়ে নিয়েছিলেন। অমানুষিক উপায় সে কৃষকদের সর্বনাশ করত। একটি ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম মাত্র ৩০০ টাকার জন্য সুদখোরটা এক কৃষকের আড়াই বিঘা জমি ছিনিয়ে নিয়েছে। সদম্ভে এই ধরনের অত্যাচার এবং শোষণ এই জঘন্য লোকটা চালিয়ে যাচ্ছিল, বিন্দুমাত্র নিজেকে সংশোধনের ইচ্ছা এই স্বেচ্ছাচারীটার ছিল না। তখনই অনুসন্ধানের পর জনসাধারণের রায় অনুযায়ী আমরা বলাই ঘোষকে খতম করেছি। আমরা এই সঙ্গে ঘোষণা করছি বিপ্লবের মধ্য দিয়েই নতুন মানুষ জন্মায়। নতুন মানুষ তৈরী হচ্ছে নতুন যুগ দেখা দিয়েছে। —এই প্রবল সত্যকে স্বীকার করে নিতেই হবে। গরীবের ওপর শোষণ অত্যাচার বন্ধ করতেই হবে। যদি এই সত্য এখনও কেউ মেনে না নিয়ে থাকে তাদের আমরা দেওয়ালের লিখনকে মেনে নিয়ে অবিলম্বে ভুল শুধরে নিতে আদেশ নতুবা পরিণাম বলাই ঘোষ, এ কথা যেন মনে থাকে। স্মরণ করা দরকার বিপ্লব ক্ষমাশীল ধৈর্য্যবান কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে। সেই সীমার শেষে অপেক্ষা করে বলাই ঘোষের মত বীভৎস মৃত্যু।

কমরেডগণ এবং বন্ধুগণ, ভারতবর্ষে কমরেড চারু মজুমদারই প্রথমদ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করলেন যে, "চীনের পথই আমাদের পথ। তিনিই প্রথম বলেন যে, মাও সেতুং চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে এবং দ্বিধাহীনভাবে মানতে হবে এবং রাজনীতি এবং কর্মপদ্ধতি দুয়ের ক্ষেত্রেই চেয়ারম্যান মাওয়ের শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে —তবেই ভারতীয় বিপ্লবের জয় অবশ্যম্ভাবী হবে। তিনি "একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে পারে" চেয়ারম্যানের এই তত্ত্বকে ভারতের মাটিতে প্রয়োগ করলেন এবং নকশাল বাড়ির মত একটি ছোট অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের স্ফুলিংগ জ্বলে উঠলো। সেই স্ফুলিংগ থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং পশ্চিম বাংলার সমস্ত জেলায়। আমাদের পার্টি বিশ্বাস করে যে, ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণ আজ অগ্নিগর্ভ প্রতি গ্রামে আজ নকশাল বাড়ির স্ফুলিংগ জ্বলে উঠতে পারে যদি সেখানে কমরেড মজুমদারের নেতৃত্বে পার্টি কর্মীরা চেয়ারম্যান মাওয়ের চিন্তাধারা বহন করে নিয়ে যান। কমরেড চারু মজুমদার শুধু বিপ্লবী রাজনীতিই ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করলেন না, বিপ্লবী কর্মপদ্ধতিরও প্রবর্তন করলেন। তিনি বল্লেন, মাও সেতুং চিন্তাধারার ভিত্তিতে এবং গোপনে গরীব ও ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে পার্টি ইউনিট গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে পার্টির নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার জন্য সম্পূর্ণ চক্রান্তমূলকভাবে গরীব ও ভূমিহীন কৃষকের গেরিলা দল গঠন করতে হবে। তিনি বলেছেন যে, শ্রেণী শত্রুকে আঘাত করার আগে জনগণের মধ্যে, বিশেষ করে গরীব কৃষকদের মধ্যে, সশস্ত্র ক্ষমতা দখলের কথা বেশ কিছু পরিমান প্রচার করে নিতেই হবে। ...ক্ষমতা দখলের কথা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে রাখতে হবে এবং তাদের নিজেদের গ্রামগুলোকে

মুক্ত করার ওপর জোর দিতে হবে। তাদের নিজের নিজের এলাকায় স্থানীয়ভাবে ক্ষমতা দখল করতে হবে যাতে সামন্ত শোষক নয়, কৃষক জনতাই তাদের স্থানীয় সব ব্যাপারগুলো মিটমাট করার একমাত্র অধিকারী হতে পারে। এই জন্যই আমাদের স্থানীয় শ্রেণী শত্রুদের নির্মূল করার কাজ দিয়ে শুরু করতে হবে ("গেরিলা এ্যাকশন সম্পর্কে কয়েকটি কথা")। তিনি বলেছেন শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গরীব ও ভূমিহীন কৃষকের শ্রেণী ঘৃণা জাগবে। পুলিশ বা মিলিটারী যখন অত্যাচারী শ্রেণী শত্রুর রক্ষক হিসাবে আসবে তখন পুলিশ বা মিলিটারির চরিত্র স্পষ্ট হবে এবং তার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্ন গেরিলা দলগুলি (যা পার্টির সশস্ত্র বাহিনী) নিয়ে গণমুক্তি ফৌজ গঠিত হবে এবং গরীব ও ভূমিহীন কৃষকের বিপ্লবী কমিটির মাধ্যমে এলাকাগতভাবে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে।অবশ্যই এই কাজে দুটি অপরিহার্য্য বিষয়ে বিশেষ নজর রাখতে হবে। সে দুটি হচ্ছে —রাজনীতি সচেতন দৃঢ় গণভিত্তি এবং দৃঢ়বদ্ধ পার্টি সংগঠন। মহান চীনের নেতারা বলেছেন —রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দাও। মহান চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরও বিরাটতম ও ব্যাপকতম রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজন হল —যার নাম মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং এ প্রয়োজন ভবিষ্যতেও থাকবে। কমরেড চারু মজুমদার বলেছেন, Politics কে Command-এ আনুন রাজনীতিকে প্রাধান্য দিন। কমরেডগণ, বিশ্ববিপ্লবের কর্ণধার চেয়ারম্যান মাও আমাদের আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব, চেয়ারম্যান মাওয়ের চিন্তাধারা আমাদের পর্থপ্রদর্শক, মহান চীনের কমিউইনিষ্ট পার্টির বিরাট সমর্থন আমাদের মহান সম্পদ। চেয়ারম্যান মাওয়ের চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান শিক্ষা হচ্ছে "স্ব নির্ভর হও"। এই শিক্ষাকে পার্টি ও প্রত্যেক পার্টি কর্মী যদি গ্রহণ করতে পারেন তবে বিপ্লবের জয় অতি দ্রুত সম্ভব হবে।

বন্ধুগণ, বিপ্লব শুরু হয়েছে। এই বাস্তব সত্যকে যদি আজ বুঝতে না চান বা না পারেন তবে শত্রুর হাতিয়ারে পরিণত হবেন।আপনি যদি সতর্ক না হন তো আপনারই শত্রু, আপনারই শোষক আপনাকেই ব্যবহার করবে আপনারই বিরুদ্ধে, আপনার শ্রেণীর বিরুদ্ধে, আপনার জন্য যাঁরা লড়ছেন তাঁদের বিরুদ্ধে। তাই বুঝতে হবে আজ যুদ্ধ হয়েছে শুরু গরীবের সংগে তাঁর দুষমণের। সেই যুদ্ধেই শোষকদের একটা সেনাপতি যে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে (সম্পতি) গরীবের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুষে খেত, যে গরীবের বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়া ঘাম কেড়ে নিয়ে তৈরি করেছে তার বিরাট সম্পতি তার জমি, গ্রামের মাঝে সদম্ভে মাথা উঁচু করে দাড়ানো তার চক্‌চকে বাড়ীখানা সেই বলাই ঘোষকে আপনারাই মুক্তিদাতারা আপনারই রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য, আপনারই শোষণের দ্বার চিরতরে বন্ধ করে দেবার জন্য খতম করেছেন। তাই বলছিলাম, এ সত্য যদি বুঝতে না পারেন তবে আপনারই শত্রু আপনাকে ভুল বুঝিয়ে তার ফৌজে আপনাকে ভর্ত্তি করে আপনারই বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। তাই সত্যকে চোখ খুলে দেখুন, আত্মহত্যার পথ নেবেন না।

বন্ধুগণ, সর্বশেষে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদ—

লেনিনবাদী)-র নেতৃত্বে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলুন। নিজেদের রাজ কায়েম করুন। জয়আমাদের হবেই —চীন যে পথে মুক্ত হয়েছে, ভিয়েতনাম যে পথে মুক্ত হতে চলেছে, সেই পথ আমাদের পথ। বিশ্ববিপ্লবের নেতা চেয়ারম্যান মাওয়ের আহ্বান আমাদের মন্ত্র হোক। "দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও, কোন স্বার্থ ত্যাগে ভীত হয়ো না, বিজয় অর্জনের জন্য প্রতিটি বাধা জয় কর।"

৩রা ফেব্রুয়ারী '৭২ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী)-র শান্তিপুর ইউনিট।

"You have your way of fighting and we have ours. When you want to fight us, we don't let you and you can not even find us. But when we want to fight you, we make sure that you can't get away and we hit you squarely on the chin and wipe you out." (Comrade Lin Piao)

"Revolutionary Policy becomes a material force when the revolutionary classes grasp it"

"Our class enemies must be made to pay with interest the blood debt they owe to our martyrs."

"The proletarians have nothing to lose but their Chains, They have a world to win."

(খতম নীতির সপক্ষে শান্তিপুরে বিলি হওয়া লিফলেট—লেখক)।

পরিশিষ্ট—৭

আক্রমণই আত্মরক্ষার একমাত্র পথ—
রাণাঘাটের জনগণের প্রতি —সি.পি.আই.(এম-এল)

কমরেড ও বন্ধুগণ,

বিশ্ব রাজনীতির এক সংকটময় মুহূর্তে সাধারণ মানুষ যখন দিশাহারা, বাঁচার তাগিদে মুক্তির লড়াই যখন অবশ্যম্ভাবী, তখনই ভারতের বুকে জন্ম নিল সি.পি.আই.(এম-এল) পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী)। বর্তমান যুগ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের যুগ। সাম্রাজ্যবাদের মরণ কামড়ের মুখে দাঁড়িয়ে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টায় সাধারণ মানুষ যখন বদ্ধপরিকর তখন শত্রুর যে কোন অত্যাচারই তারা প্রতিহত করতে প্রস্তুত। সাম্রাজ্যবাদের সখের পুতুল ইন্দিরা সরকার সস্তায় বাজীমাৎ করার চেষ্টায় পাকিস্তানের লড়াইকে মুক্তির লড়াই আখ্যা দিয়ে মহাসমারোহে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু আজ আর অত সহজে তাতে ভুলবে না। যে কোন অন্যায় অত্যাচারই তারা আজ মুখ বুজে সইবে না। চরম প্রতিকার তারা করবেনই তা যে কোন মূল্যেই হোক না কেন। বন্ধুগণ, এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে দেখিয়ে দিলেন রাণাঘাটের শ্রদ্ধেয় কমরেড গোপাল, প্রবীর, মহা, সুবীর, আদম। শত্রুর অপপ্রচার যাই থাকুক না কেন, সাধারণ মানুষ নিশ্চয় জানেন সি.পি.আই.(এম-এল) পার্টির প্রতি কর্মী সৎ ও নির্ভীক, অন্যায় আর অত্যাচার যেখানে, প্রতিকার তাঁরা করবেনই। এরা প্রমাণ রাখলেন কমরেড গোপাল ও তাঁর সঙ্গীরা। কাজের শেষে জনৈকা বিধবা শ্রমিক মহিলা সন্ধ্যাবেলা যখন ফিরছিলেন পুলিশ ক্যাম্পের ধার দিয়ে, রক্তলোলুপ পিশাচের দল মত্ত অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর অত্যাচার করে। এই খবর যথারীতি সি.পি.আই.(এম-এল) পার্টির কর্মীদের কাছে পৌঁছায়, এবং বিপ্লবী কমিটির বিচারের রায়ে ঐ পুলিশ পিশাচদের খতমের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কমরেড গোপাল ও তার সঙ্গীরা এই মহান দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেন। কিন্তু আত্মসচেতন ঐসব অপরাধীর দল আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল তাই কমরেড গোপাল ও অন্যান্যরা তাঁদের মহান দায়িত্ব কার্যকরী করবার আগেই শয়তানের দল তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিমর্মভাবে হত্যা করে। কমরেডস আজ আর আমরা প্রিয়জনের দুঃখে কাঁদবো না। মহান নেতা কমরেড চারু মজুমদার আমাদের শিখিয়েছেন শোককে ঘৃণায় আর অশ্রুকে পরিণত করে শত্রুর বুকে নির্মম আঘাত হানতে। তাই ঐ সব শহীদ কমরেডদের নির্মম হত্যা আমাদের আরও বেশী করে শত্রুর বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার জন্য উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। আজ মা বোনের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে তাদের ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব পালনে সর্বোপরি নিপীড়িত মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে আসুন আমরা দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলি, জয় আমাদের হবেই।

"রক্তে ঝরা পথই তো মুক্তির পথ,
মানুষের মুক্তির জন্য মূল্য দেবোনা।
এতো হতে পারে না।"
চারু মজুমদার

বিপ্লব বিরোধী, জনগণ বিরোধী, চীন বিরোধী ভারত-সোভিয়েত সামরিক চুক্তি ধ্বংস হোক, শত শহীদদের রক্তে রাঙানো ভারতের মহান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) জিন্দাবাদ। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুক চেয়ারম্যান মাও। মহান নেতা চারু মজুমদার লাল সেলাম।

রাণাঘাট জনগণের পক্ষ থেকে সি.পি.আই.(এম-এল) পার্টি।

(এই লিফলেটটি একাত্তরের জানুয়ারী মাসে রাণাঘাটে রূপশ্রী ক্যাম্পে প্রবীর, মহা, আদম প্রমুখ নকশালপন্থী কর্মীদের মৃত্যুর পর বিলি করা হয়। এই কর্মীদের পরিচয় পঞ্চম পরিচ্ছেদে (পৃ. ৯০) বিবৃত হয়েছে।)

পরিশিষ্ট —৮

"জনসাধারণের উপর অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে, পার্টির উপর অবশ্যই আমাদের বিশ্বাসরাখতে হবে, এ হচ্ছে দুটি মৌলিক নীতি। যদি আমরা এ দুটি নীতিতে সন্দেহ করি, তাহলে কোন কাজই সম্পন্ন করতে পারব না।"

সংগঠিত হোন, বিদ্রোহ করুন, খতম করুন শ্রেণীশত্রু পুলিশ মিলিটারী ও তার দালালদের। বাজেয়াপ্ত করুন শ্রেণীশত্রুদের সম্পত্তি, বিলিয়ে দিন গরীব শ্রমিক কৃষকের মধ্যে, কেড়ে নিন রাইফেল, গঠন করুন গণমুক্তিফৌজ, ভেঙে ফেলুন এই রাষ্ট্র যন্ত্র, কায়েম করুন গরীব রাজ।

কমরেডগণ ও বন্ধুগণ,

১৯৬৭ সালে নকশালবাড়িতে যে কৃষকরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু করেছিলেন, সে লড়াই আজ সারা ভারতে দাবানলের মত জ্বলে উঠেছে। আমাদের অঞ্চলে সাময়িক দুর্বলতা থাকলেও সে অবস্থা কাটিয়ে আমরাও আজ আর পিছিয়ে নেই। শোষিত মানুষ ক্রমেই সি.পি.আই. (এম-এল) এর নেতৃত্বে আস্থাশীল হয়ে সংগঠিত হয়ে খতম অভিযানের মধ্য দিয়ে শ্রমিক কৃষকের রক্তরঞ্জিত পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরেছেন। বন্ধুগণ, স্বভাবতঃই শোষকশ্রেণী পাগলা কুকুরের মত কামড়াতে আসছে এবং তাদের সহচরের ভূমিকায় তথাকথিত মার্কসবাদের ধ্বজাধারীরাও বিপ্লববিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ। আমরা জানি বিপ্লবের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, —তাই আমাদের সকল বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিক কৃষককে সংগঠিত হতে হবে এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সে সময় আমাদের সামনে উপস্থিত। অতএব, সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে গরীবের রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রবর্ত্তী বাহিনীতে সারিবদ্ধ হোন।

আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ লক্ষ্য করে আসছি শোষিত শ্রেণীর মুক্তির জন্য কেউ কাজ করছে না। তথাকথিত বুলি সর্বস্ব বামপন্থী দলগুলি শ্রমিক-কৃষককে মুক্তির নামে চোরাবালিতে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে। যখন শোষিত শ্রেণীর মুক্তির লড়াইয়ের সঠিক পথপ্রদর্শক বিশ্ববিপ্লবের মহান নেতা চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙ নির্দেশিত পথে ভারতে বিপ্লবী পার্টি সি.পি.আই.(এম-এল) তৈরী হল তখন সকল প্রতিক্রিয়াশীলরা তারস্বরে গেল গেল রবে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। এই সব শেয়ালের এক রা কেন বলতে পারেন? এর একমাত্র কারণ ওদের সুখের সংসারে আগুন ধরেছে। এ আগুন জ্বলেছে জ্বলবে। পুড়িয়ে ছাই করে দিতে হবে শোষকশ্রেণীর শেষ চিহ্নটুকুকেও। আমরা উচ্ছেদ করতে চাই শোষণ ব্যবস্থাকে। শোষণকে উচ্ছেদ করতে হলে শোষণ শ্রেণীকে খতম করতেই হবে। কারণ পৃথিবীর শোষিতশ্রেণীর লড়াইয়ের ইতিহাসের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই শোষকশ্রেণী ভাল কথায় তাদের শোষণ বন্ধ করেনি, তাদের খতম করেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করতে হয়েছে। মার্কসবাদ

আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে এবং অত্যন্ত ঠিক ভাবেই ভারতীয় বিপ্লবের নেতা কমরেড চারু মজুমদারও শ্রেণীশত্রু খতমের রাজনীতি যথাসময়ে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের দালাল ভারতীয় মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি এই কংগ্রেস সরকার ও এদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার অন্যান্য প্রতিক্রিয়া পন্থীরাও একযোগে আমাদের হিংসাশ্রয়ী, খুনী, ডাকাত, সমাজবিরোধী প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করছে। আমরা বলি তাদের কায়েমী স্বার্থরক্ষার খাতিরে তারাতো এরকম বলবেই। সেটাই তাদের চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক। এর দ্বারাই কি প্রমাণ হচ্ছে না যে আমরা ঠিক সময়ে ঠিক স্থানেই ঘা দিতে সমর্থ হয়েছি? আমরা ব্যক্তি হত্যায় বা হিংসায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমরা এটা জানি হিংসার জবাব হিংসা দিয়েই দিতে হবে। আমরা জানি যে শোষকরা স্বেচ্ছায় বা অনুরোধে শোষণ বন্ধ করে না তাদের খতম করেই তা শোষিত শ্রেণীকে করতে হবে। আমরা এও জানি এই কুত্তারা তাদের হাতে যেহেতু ক্ষমতা আছে সেহেতু তারা তো শোষিতশ্রেণীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে একটুও দ্বিধাকরবে না —মরণ কামড় তারা দেবেই। তাই আমরা গণমুক্তি ফৌজ গঠন করেছি এবং এই গণমুক্তি ফৌজের হাতে অস্ত্র নিতেও হবেই। কারণ রাইফেলের জবাব রাইফেলই দেবে। আমরা শ্রেণীশত্রু খতম কবি —শরিকী সংঘর্ষে কৃষক দ্বারা কৃষক হত্যা বা শ্রমিকের দ্বারা শ্রমিক হত্যার কথা বলি না বা করিনা।

আমাদের অঞ্চলেও গণমুক্তি ফৌজ গঠিত হয়েছে। আমাদের কৃষক গেরিলারা ও ছাত্র গেরিলারা ইতিমধ্যেই কয়েকটি খতমে অংশ গ্রহণ করেছেন। অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে এই খতম সম্পর্কে তাই তার বিবরণগুলো আমরা দিলাম।

১) গত ৩০শে জুলাই, শুক্রবার রাত ৮ টায় ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্বে ৯ জনের একটি গেরিলা স্কোয়াড তাড়িখানার মালিক শয়তান, নারী ব্যবসায়ী গোপীনাথ পার্শিকে খতম করেন। এই শয়তানটি দীর্ঘদিন ধরে এই তাড়ির ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। কিছুদিন পূর্বে ৮ জনের একটি বিপ্লবী যুব ছাত্র গেরিলা স্কোয়াড তাড়িখানায় প্রবেশ করে তাড়িখানার সমস্ত জিনিষ ভেঙ্গে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গোপীনাথকে তাড়ি বিক্রী করতে নিষেধ করে। কারণ এই তাড়ি এবং পচুই মদ খেয়ে কয়েক বৎসর পূর্বে ৩ জন আদিবাসী কৃষকের মৃত্যু হয়। এই গোপী তাড়িতে অতিরিক্ত ভেজাল মিশিয়েছিল বলেই তাড়ি বিষে পরিণত হয় এবং তার ফল স্বরূপ ৩ জন কৃষকের মৃত্যু। কিন্তু খুনীর শাস্তি কিছু হয়নি। এই তাড়ি খেয়ে মিঠাপুরের আদিবাসীরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ২ জন খুন হন। তাদের পরিবারগুলি প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত। এই তাড়ি খাইয়ে মেঠোপাড়ার অনেক আদিবাসী কৃষকের জমি ছিনিয়ে নিয়েছে জোতদার পঞ্চানন ঘোষ। শোষক ও শাসকরা এই তাড়ি আর পচুই খাইয়ে কৃষক ও শ্রমিককে ইজ্জতের লড়াই থেকে দূরে রাখতে চায়। কৃষকরা যে মানুষ তাদেরও যে বাঁচার অধিকার আছে এবং তারা যে যুগ যুগ ধরে জমিদার, জোতদার, দালাল বদবাবুদের হাতে মার খেয়ে আসছে —এই বোধশক্তি যাতে তাদের মধ্যে জাগ্রত হতে না পারে তারই ব্যবস্থাপত্র এই তাড়ি ও পচুই মদ। ঐ দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকরা যাতে মাথা উঁচু করে জমিদার,

জোতদার আর বদবাবুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে না পারে —যাতে কৃষকরা পাল্টা মার দিতে না পারে। শ্রমিক কৃষকরা যাতে গরীবের রাজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা করতে না পারে — তার জন্য বদমাইসরা সস্তা পচুই মদ ও তাড়ি এনে সামনে ধরে। যেমন সোভিয়েত রাশিয়ার ছিল ভদকা, চীনে আফিন। তাই ভেঙ্গে দিয়েছিল যুব ছাত্ররা তাড়িখানা, অনুরোধ করেছিল গোপীকে তাড়িখানা বন্ধ করতে। কিন্তু সে শয়তান আমাদের কথা কানে তোলেনি বরং পুর্ণোদ্যমে আবার শুরু করে এবং পাশেই দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মেয়েদের দিয়ে দেহ ব্যবসাও সে শুরু করে দেয়। এই পয়সার শকুনটি অনেক জমিজমাও করেছে আশেপাশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এই শয়তানটির ব্যবহারে এই শকুনটি গোপনে ষড়যন্ত্র করেছিল বিপ্লবীদের ধরিয়ে দেওয়ার এমন কি সে বলত আমি ঐ সব নকশাল ছোকরাদের কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব। এই অবস্থায় যুব-ছাত্ররা এই শয়তানটির বিচারের ভার কৃষক গেরিলাদের হাতে অর্পণ করেন। কৃষক গেরিলারা শকুনটির বিচার করেন ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

২) গাংনাপুর থেকে ২ মাইল দূরে রামেশ্বরপুর গ্রামের কুখ্যাত শ্রেণীশত্রু জোতদার, চরিত্রহীন লম্পট, জনগণের দুষমণ আজেহার আলী খাঁ (হাজারী খাঁ) কে কৃষক গেরিলারা গত ৩১শে জুলাই, সন্ধ্যা ৭টায় খতম করে কমরেড বিপ্লব ভট্টাচার্য্য সহ সমস্ত শহীদের হত্যার বদলা নিয়েছে। এই শকুনটি খতম হওয়ায় রামেশ্বরপুর, মিঠাপুর, উজীরপুকুর এবং অন্যান্য স্থানের কৃষকদের মধ্যে গভীর উৎসাহ দেখা যায়। শকুনটি ব্যাভিচারী। বদমাইশটি একটি বিবাহিতা নারীকে ভীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক সম্ভোগ করে এবং তাঁর স্বামী এর প্রতিবাদ করায় তাকে মারধোর করে এবং হত্যার হুমকি দেয়। যার ফলে মহিলাটির স্বামী দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় মুসলমান ভাইবা তার এই কুকীর্ত্তির প্রতিবাদে তাকে বর্জন করে। সমাজচ্যুত এই ঘৃন্য জীবটির কয়েকজন সহচর অবশ্য ছিল। ১৯৬৭ সালে যখন ৩ টাকা কেজি চাল, তখন প্রচুর চাল মজুত করে রেখেছিল এই শয়তানটি এবং এক কনা চালও স্থানীয় গরীব মানুষদের দেয়নি। রাতের অন্ধকারে সমস্ত ধান ও চাল অন্যত্র পাচারকরে দেয়। মাস দুই আগেও—শয়তানটি পূর্ব পাকিস্থান থেকে হাজারে হাজারে মানুষ আসতে দেখে তাড়াতাড়ি তিনকড়ি কুণ্ডুর কাছে ৫০-৬০ মণ ধান জমা রাখে। এই শকুনটি তার নিজের বোনের ২৫ বিঘা জমি আত্মসাৎ করে। বোনটিকে স্বামীর ঘর পর্য্যন্ত করতে দেয়নি, তাঁর উপর দৈহিক নির্য্যাতন পর্য্যন্ত করে। শকুনটির ১০০ বিঘা জমি আছে। তার নিজস্ব চাষাবাদে ৬০ বিঘা, বর্গায় ৩০ বিঘা ও বেদখল জমি ১০ বিঘা। তার নগদ টাকার পরিমান ৮০ হাজার। তার মধ্যে গাংনাপুর বাজারের ব্যবসায়ী তিনকড়ি কুণ্ডুর কাছে জমা আছে ৫০ হাজার টাকা। সমস্ত তদন্ত করেই কৃষক গেরিলারা শকুনটিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

৩) গত ৫.৮.'৭১ তারিখে সন্ধ্যা৭-৩০ টার সময় পুলিশের দালাল, জনগণের শত্রু কুখ্যাত সি.পি.এম-এর পোষা গুণ্ডা পঙ্কজ মুখার্জী কে চারজনের এক গেরিলা স্কোয়াড খতম করেন। এই কুকুরটা জনগণের উপর বহু অত্যাচার করেছে। টাকা ছিনতাই, নারীলোলুপতা ছাড়াও

এলাকার কুখ্যাত সুদখোর বদমায়েসদের সে ছিল দারোয়ান। এই কুকুরটা সম্পর্কে দীর্ঘকাল যাবৎ বহু অভিযোগ জমা হয়েছিল। তাই গণ আদালতে ওকে খতম করার সিদ্ধান্ত হয়।

এই কুত্তাটা একজন গরীব ছেলের রেশন তোলার টাকা পর্য্যন্ত কেড়ে নেয়। এই শয়তান আমাদের পার্টির বহু কমরেডের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে। বিনা প্ররোচনায় মারধোর করেছে। সে জুয়ার বোর্ড চালানো থেকে মদ খাওয়া মেয়েছেলে নিয়ে স্ফূর্তি করা সবই চালাতো। এই কুত্তাটা খতম হওয়ায় সাধারণ মানুষ উল্লাসে নৃত্য করে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, এমনকি সি.পি.এম-এর বন্ধের বিরোধিতাও করে। বন্ধুগণ, এখানে আমরা একথা জানিয়ে দিতে চাই আমরা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মীকে খতম করিনি খতম করেছি একজন পুলিশ ও শোষকদের দালাল, ছিনতাইকারী গুণ্ডাকে। রাজনীতিরসংগে আমরা রাজনীতি দিয়েই মোকাবিলা করি —যে যে রাজনীতিই করুন না কেন শোষিতমানুষের মুক্তির বিরোধিতা করলে সে রেহাই পাবে না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের পার্টি সকলকে সর্তক করে দিচ্ছে যে আমাদের পার্টির নাম নিয়ে কিছু বদমায়েস বিভিন্ন অঞ্চলে টাকা ছিনতাই করছে। পার্টির নামে চিঠি ব্যবহার করে টাকা দাবী করছে ও হত্যার ভয় দেখাচ্ছে। এই সব কাজের সংগে পার্টির কোন সম্পর্ক নাই। জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, প্রতিরোধ করুন। আমরাও আপনাদের পাশে আছি। পার্টিই আরও সর্তক করতে চায় সেসব বদমায়েসদের, যারা এখনো জনগণের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, পুলিশের দালালী করছে, চুরি, ডাকাতি, গুণ্ডামী, করছে। আমরা মনে করি এইসব কাজ বিপ্লবের পরিপন্থী। অতএব আমরা তাদের ক্ষমা করব না।

ছাত্রবন্ধুদের প্রতি —

লালগোপাল স্কুলে বর্ত্তমানে বহুবিধ বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছে। শিক্ষক মহাশয়দের অবমাননা চলছে স্কুলের দেয়ালে অশ্লীল লেখায় ভর্ত্তি, এমনকি সি.পি.আই.(এম,এল) এর শ্লোগানের পাশেই অশ্লীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শ্লোগান দেখতে পাওয়া যায় আমরা এই ধরণের কাজকে বিপ্লব বিরোধী বলে মনে করি। সুতরাং এর বিরুদ্ধে বিপ্লবী ছাত্রবন্ধুদের এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে উচ্ছৃঙ্খলতা বিপ্লব নয়। কমরেডগণ ও বন্ধুগণ এগিয়ে আসুন, আপনার অবদান রাখুন বিপ্লবে। শোষণমুক্তির লড়াই আজ উন্নত স্তরে পৌচেছে। *আমরা গঠন করেছি গণমুক্তি ফৌজ*। সশস্ত্র সংগ্রামই হচ্ছে মুক্তির একমাত্র পথ। অতএব ভোটের রাজনীতি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বিপ্লবের পথ গ্রহণ করুন। আমবা জানি আত্মরক্ষা নয় আত্মত্যাগই বিপ্লবীর প্রকৃত গুণ।

বিপ্লবী অভিনন্দনসহ—
রাণাঘাট আঞ্চলিক কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেলিনবাদী)

পরিশিষ্ট—৯

নকশাল কুত্তাদের বিপ্লবের রূপ

বন্ধুগণ

গত দুবছর যাবত শান্তিপুরের বুকে মেকী বিপ্লবী বীর পুঙ্গবদেরদ্বারা যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলেছিল তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি জঘন্যতম কলঙ্কিত অধ্যায় বলে চিহ্নিত থাকবে। একটু চিন্তা করে দেখুন, সুপরিকল্পিতভাবে সুস্থ মাথায় একটার পর একটা হত্যা করে এই কুত্তারা বিপ্লবের নামে কি ভাবে জল্লাদের ব্যবসা শুরু করেছিল। যাদের হত্যা করা হয়েছে তারা সকলেই প্রায় সাধারণ ঘরের ছাপোষা মানুষ, কি অপরাধ তাদের ছিল? আর যত অপরাধই থাক, তাদের হত্যা করার অধিকার এই অসভ্য জানোয়ার গুলোকে কে দিল? এরা সত্যিকারের সুদখোর বা এদের কথায় শ্রেণী শত্রুদের বাঁচিয়ে রেখে মাসিক মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করছিল, এবং মাঝে মাঝে সাধারণ লোকেদের মধ্যে এই অন্যায়ের প্রচণ্ড বিরোধী বলিষ্ঠ মনোভঙ্গীসম্পন্ন কতিপয়কে বাছাই করে হত্যা করছিল, কারণ তা না হলে গোপন পথে মাসিক আয়টা বজায় রেখে স্ফূর্তির ফোয়াড়া ছোটানো সম্ভব হতো না।

এদের অসংখ্য হত্যার মধ্যে দুটি ঘটনার কথা আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। (১) শান্তিগড় ২ নং কলোনীর একজন বদ্ধ পাগলকে এরা বিভৎস ভাবে হত্যা করে। ভোর বেলা সে ঘুম থেকে উঠে জঙ্গলে যখন পায়খানা করতে যায়, তখন তাকে এক কোপে গলা কেটে ফেলে দেওয়া হয়। সেই লাস গলিত অবস্থায় হত্যার দশদিন পরে উদ্ধার করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত ব্যক্তিরা মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে (মৃতের শ্বশুর দিয়েছিল) এই কাজ করেছিল, এবং এরা সকলেই নকশালী কুত্তা বীরেন দাসের উপস্থিতিতে হাত পাকাবার জন্য হত্যা করেছিল। আরও ব্যাপার এই যে, এই হত্যা সম্বন্ধে এই কুত্তারা কোন ইস্তাহার দেয়নি এই ভয়ে যে জনসাধারণ এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদে চমকে উঠতে পারে। এই আবিস্কার আমাদের..."যা পুলিশও পারেনি"।

২য় ঘটনাঃ— করমচাপুরের মাঠ পাড়ায় গোবিন্দ মণ্ডলের স্ত্রী কে বীরেন দাস স্বয়ং চারজন লোক নিয়ে হত্যা করতে চেষ্টাকরেছিল, কিন্তু পাইপগানের শব্দ পেয়ে জনতা রুখে দাঁড়ালে ও তাড়া করলে ভদ্রমহিলা রক্ষা পেয়ে যান, এখন কৃষ্ণনগর হাসপাতালে আরোগ্য লাভের পথে। তাছাড়া গ্রামে গ্রামে যে বিভৎস জঘন্য নারকীয় অত্যাচার এই জল্লাদরা চালিয়েছে, যদি কোন দিন তার তদন্ত হয়—তাহলে আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি জনসাধারণ চমকে উঠবে। এখন আপনারা বলুন, এই কি বিপ্লব? না বিপ্লবের নামে ব্যবসা? পৃথিবীর ইতিহাসে রাজনীতির নামে এই নিছক ব্যক্তি হত্যা কোথাও হয়েছে কি? এবং এই হচ্ছে তথাকথিত মাও-সে-তুঙ-এর বিপ্লবের নগ্ন চেহারা। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই ধাপ্পাবাজীতে বেশ কিছু নাবালক ছেলে বিভ্রান্ত হয়ে তাদের দলে ভিড় করেছিল। এই ছেলেদের প্রতি আমাদের আবেদন —আর নয়, অনেক অন্যায় ও পাপ তোমরা করেছ, হয়তো এখন সময় আছে তোমরা ভদ্রজীবনে ও সভ্যসমাজে ফিরে আসতে পার, আমরা সে সুযোগ তোমাদের

দিচ্ছি ও দেব। অভিভাবকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনাদের ছেলেদের সৎপথে ফিরে আসতে বাধ্য করান ও আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। এই কচি ছেলেদের ভবিষৎ হয়তো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, এবং আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনার কাছে আপনার স্নেহের পুত্রকে ফিরিয়ে দেব, তাদের কোন ক্ষতি হতে দেবনা। আমরা চাই শান্তি শৃঙ্খলা, সুস্থ ও ভদ্র সমাজ, কোন অন্যায় আমরা বরদাস্ত করবো না।

আমাদের প্রতিজ্ঞা এই অত্যাচার, অনাচার থেকে দেশকে রক্ষা করবোই। কোন কূলবধুকে যাতে আর অকালে সিঁথির সিঁন্দুর ঘোচাতে নাহয়, কোন শিশুকে তার প্রাণাধিক পিতাকে হারাতে না হয়, কোন মা তাঁর যুবক সন্তানকে হারিয়ে বুক চাপড়ে না কাঁদেন, সেই ব্যবস্থাই আমরা করবো তার জন্য যত মূল্যই দিতে হোক —আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সকল ও কৃতকার্য্য আমরা হবোই কারণ আপনার মত হাজার-হাজার মানুষের আশীর্বাদই আমাদের সহায়।

ঃ নির্দ্দেশ মেনে আমাদের সাহায্য করুন ঃ

১। গ্রামে ও শহরে গলিতে গলিতে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তলুন।

২। বীরেন দাস, কেষ্ট ঘোষ প্রমুখ নকশালী কুত্তাদের আশ্রয় স্থলের সংবাদ দিন।

৩। যেখানেই এদের পাবেন, ধরে পিটিয়ে পুলিশের হাতে দিন বা আমাদের সংবাদ দিন।

৪। নকশালী কুত্তাদের কোন রকম সাহায্য বা আশ্রয় দেবেন না।

৫। আশ্রয় দাতা ও সাহায্যকারী দালালদের ধরুন ও পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে দিন।

আপনাদের মঙ্গলাকাঙ্খী —
Anti Naxal Party (Santipur Unit)

(শান্তিপুরে এ্যান্টি-নকশাল স্কোয়াড এই লিফলেটটি বিলি করেছিল। —লেখক)

পরিশিষ্ট —১০

এই বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে আঘাতে আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করুন।

কমরেড ও বন্ধুগণ।

আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড চারু মজুমদার আহ্বান জানিয়েছেন '৭০এর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন। এই মহান আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে বিপ্লবী কৃষক শ্রমিক ও যুব ছাত্ররা এগিয়ে এসেছেন। আজ বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর একসঙ্গে এগিয়ে চলেছে ১৯৬৭ সালের প্রজ্জ্বলিত নকশালবাড়ির লাল আগুনের লেলিহান শিখা উর্দ্ধে তুলে ধরে। শুরু হয়েছে মুক্তি যুদ্ধের উৎসব। যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত ও ক্ষুধিত কৃষক শ্রমিক একের পর এক অত্যাচারী-জোতদার-জমিদার, সুদখোর-মহাজন, কালাবাজারী, পুলিশ, মিলিটারী, আই.বি. এবং প্রতি বিপ্লবী পাণ্ডাদের খতম করে এই উৎসবকে মাতিয়ে তুলেছেন। সাম্রাজ্যবাদের গোলাম তৈরী করার প্রতিষ্ঠান স্কুল কলেজ আর সাম্রাজ্যবাদের পোষা কুত্তা তথাকথিত "মনীষীদের" মুর্ত্তি ভেঙে চুরমার করে শহরের বিপ্লবী যুব ছাত্ররা মুক্তিযুদ্ধের এই লেলিহান শিখাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করে এই বুর্জোয়া রাষ্ট্রখণ্ডের ভিত কাঁপিয়ে তুলেছেন। ..আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড চারু মজুমদারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নবদ্বীপে বিপ্লবী শ্রমিক ও যুব ছাত্ররা একের পর এক সুদখোর মহাজন, জোতদার ও প্রতি বিপ্লবী দালালদের খতম এবং বুর্জোয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ও তথাকথিত মনীষীর মুর্তি ভেঙে চুরমার করে বিপ্লবী যুদ্ধের লাল আগুন নবদ্বীপেও ছড়িয়ে দিলেন। গত ৪ঠা জানুয়ারী —নবদ্বীপ সংলগ্ন মহিসূরা গ্রামের কংগ্রেসী পাণ্ডা সত্যচারী (?) জোতদার, সুদখোর ও নারী লোলুপ নর পিশাচ কাদের মণ্ডলকে প্রক.শ্য দিবালোকে হত্যা করে দরিদ্র কৃষক শ্রেণীকে ঐ অত্যাচারী জোতদারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করলেন। গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে সন্ধ্যায় একজন বিপ্লবী কর্মীকে "মার্কসবাদী" নেতা বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে আক্রমণ করলে সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী কর্মীরা কমরেডের উপর মার্কসবাদী গুণ্ডাদের ঐ আক্রমণের বদলা নেন ও বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্যেকে গুরুতর রূপে জখম করেন।

মনিপুর অঞ্চলের অন্যতম "মার্কসবাদী সন্তান" ঠেঙ্গাড়ে বাহিনীর কমাণ্ডার মার্কসবাদী গুণ্ডা, দেবী বসুর দেহরক্ষী গৌরসুন্দরকে গত ৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যাবেলায় "মার্কসবাদী ঘাঁটির" মধ্যেই ৫ জনের একটি গেরিলা দল প্রচলিত অস্ত্রের আঘাতে খতম করেন। এই শয়তানটি দিনের পর দিন সাধারণ শ্রমিকদের কাছ থেকে জুলুম করে ইউনিয়নের অর্থ আদায় করত আর যারা দিতে পারত না তাদের জোর করে ও ছোট তাঁত মালিকদের ভয় দেখিয়ে কাজ থেকে বঞ্চিত করত। এই শয়তানটি খতম হওয়ায় মণিপুরের সাধারণ শ্রমিক ও ছোট ছোট তাঁত ব্যবসায়ীদের মধ্যে উল্লাসের বন্যা বয়ে যায়। নকশালপন্থীদের ঠাঙানোর জন্য জোতদারদের দালাল দেবী বসু ঐ শয়তানটিকে পুরষ্কৃত করেছিল।

গত ১২ই জানুয়ারী সকাল ৯টায় জনাকীর্ণ তেঘড়িপাড়ার বাজারের মধ্যেই জনগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় ছিনতাইবাজ, মস্তান ও মার্কসবাদী ঠেঙাড়ে বাহিনীর সদস্য রামা বর্মনকে চার জনের একটি গেরিলা দল প্রচলিত অস্ত্রের সাহায্যে মারাত্মক রূপে আঘাত করেন। এই শয়তানটিকে দেবী বসু অর্থ দিয়ে একজন বিপ্লবী কর্মীকে হত্যার কাজে লাগিয়েছিল। এলাকার মানুষ সর্বদাই এক শয়তানটির মৃত্যু কামনা করেছে। জনগণের এই কামনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য গেরিলা দলটি তাকে খতম করার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু সামান্য ত্রুটির জন্য শয়তানটি প্রাণে বেঁচে যায়। হত্যাকারীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ মৃত্যু। চেয়ারম্যানের এই অমূল্য শিক্ষাকে মনে রেখে গেরিলা দলটি তাদের ত্রুটির সমালোচনা করে জনগণের কামনাকে বাস্তবে রূপ দিতে শপথ নিয়েছেন।

গত জুন মাসে পুলিশের দালাল মেঘ লাল সাহাকে দিনের পর দিন বিপ্লবী কর্মীদের পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেবার কাজ করত তাকে ৪ জনের একটি গেরিলা দল খতম করেন। ফাঁসিতলা বাংলা কংগ্রেসের পাণ্ডা মেঘলাল বেগানীকে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে তিন জনের একটি গেরিলা দল মারাত্মক রূপে জখম করেন। এই শয়তানটিকে এলাকার বিপ্লবী কর্মীদের গতিবিধি ও নাম পুলিশের কাছে সব সরবরাহ করত ও বিপ্লবী কর্মীদের মারের হুমকি দিত। এই শয়তানগুলো এতই অত্যাচারী ছিল যে তারা খতম হওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেছে। জনগণের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা আজো গেরিলারা জনগণের মধ্যে রয়েছে।

(নবদ্বীপে খতমনীতির স্বপক্ষে বিলি হওয়া নকশালপন্থী লিফলেট। —লেখক)